মিত্র প্রকাশন প্রকাশনা

আলোকপাত

নভেম্বর ১৯৮৮, মূল্য ৬·০০

মাইক টাইসন কি আলির আসন টলাবেন!

শেফালী : 'স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা' !

শাবানা আজমী : চলচ্চিত্রের দুই পিঠের নায়িকা

কৃতি ছাত্র হত্যার তদন্তে গাফিলতি কেন ?

আগামী নির্বাচন লক্ষ্য করে কংগ্রেসের প্রস্তুতি

শান্তি দেবীর পূর্বজন্ম : একটি 'ঐতিহাসিক' ইতিবৃত্ত

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com
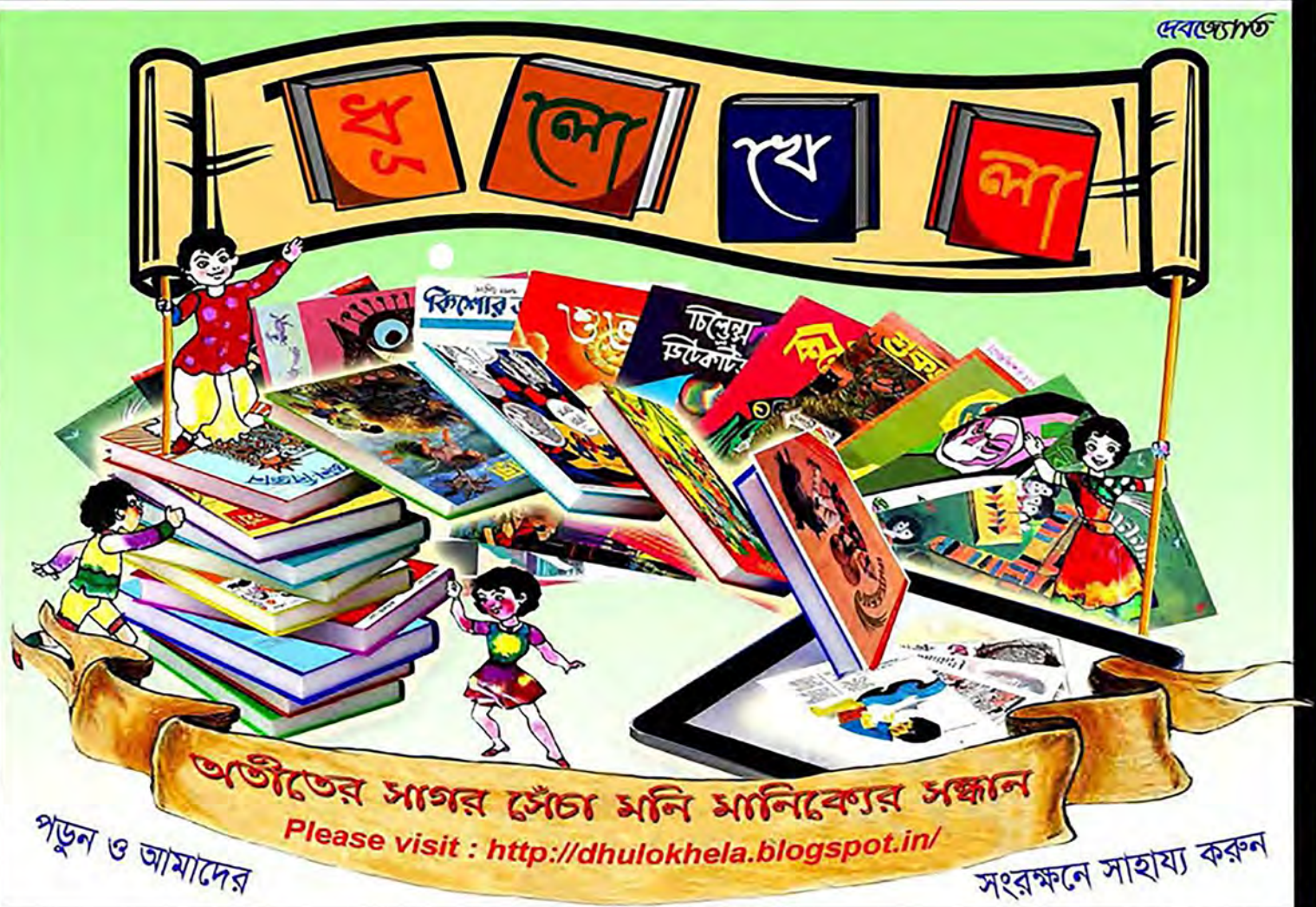
TVs
Radios
2-in-1s
Calculators
Projectors
Digital Watches
KELTRON
RELYTRONICS
No better guarantee
রিলায়ট্রনিক্স।
এর মানে ইলেক্ট্রনিক্স, যার সাথে যোগ হয়েছে বাড়তি একটি গুণ: আস্থাযোগ্যতা।
এই আস্থাযোগ্যতা কথাটি আমাদের কাছে একটা শব্দমাত্র নয়। এ আমাদের অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত কুশলতার প্রতীক, যা ঔদ্যোগিক ও ভোগ্যপণ্য ইলেক্ট্রনিক্স উৎপাদনের বিস্তৃত শ্রেণী নির্মাণে গত বিশবছর ধরে আমরা অর্জন করেছি।
আমাদের এইসমস্ত উৎপাদনের মধ্যে টিভি, রেডিও, টু-ইন-ওয়ান, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার সিস্টেম, কন্ট্রোল ও ইনস্ট্রুমেনটেশন সিস্টেমই শুধু নয়, তাছাড়াও দূরসঞ্চার, দেশের প্রতিরক্ষা ও অন্তরীক্ষে প্রয়োগের ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমও রয়েছে। বলাই বাহুল্য এইসব উৎপাদনে ব্যবহারের দরকারী সব যন্ত্রাংশ যেমন ক্যাপাসিটর, ডায়োড, রেজিস্টর, কোয়ার্টজ ক্রিস্ট্যাল, সেসবও আমরা নিজেরাই তৈরী করি।
তাইতো বহু নামী কোম্পানীও তাঁদের উৎপাদনের জন্যে আমাদের তৈরী এইসব যন্ত্রাংশই খরিদ করেন।
কেলট্রন রিলায়ট্রনিক্স। ইলেক্ট্রনিক্স আস্থাযোগ্যতার জন্য সবচেয়ে সঠিক শব্দ।
কেরালা স্টেট ইলেক্ট্রনিক্স ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ কর্পোরেট মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট, (কনজিউমার ইলেক্ট্রনিক্স), সাস্তমঙ্গলম, ত্রিবান্দ্রাম ৬৯৫ ০১০ ফোন: ৬৯১০৬। শাখা ও ক্ষেত্রীয় কার্যালয়: আহমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, ভূপাল, বম্বে, কলকাতা, ক্যালিকাট, কোচিন গুয়াহাটি, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, মাদুরাই, নিউ দিল্লী, পাটনা, ত্রিবান্দ্রাম এবং বিশাখাপত্তনম।
ASP-KEL-397/88 BEN

আপনার সন্তানকে
একদিন বুদ্ধিমান করে তুলুন
চিল্ড্রেন্স নলেজ ব্যাংক
(ছয় খণ্ড)
সাফল্য আর জনপ্রিয়তার নতুন ধারা সৃষ্টিকারী এক অপরিহার্য শিক্ষামূলক সিরিজ
এই বই শিশুর মস্তিষ্কে টনিকের মতো কাজ করে
যে-মুহূর্তে একটি শিশু চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করে, সেই মুহূর্ত থেকেই তার মনে জাগতে থাকে কৌতূহল। তার চারপাশের এই সুন্দর পৃথিবী সম্পর্কে জমা হতে থাকে নানান বিস্ময়। তার মনে 'কীভাবে' আর 'কেন' — এই প্রশ্ন উঁকি দিতে শুরু করে। সে এসব প্রশ্নের উত্তর চায়, কিন্তু সহজে পায় না। সঠিক সময়ে প্রশ্নগুলির উত্তর পেয়ে গেলে তার জ্ঞানের পরিধি বেড়ে যায়। তার মন হয়ে ওঠে আরও তীক্ষ্ণধী; উপলব্ধি করার ক্ষমতাও বেড়ে ওঠে, তাকে আরও বুদ্ধিমান করে তোলে। অন্যদিকে, প্রশ্নগুলির উত্তর না পেলে তার বুদ্ধি ভোঁতা হতে শুরু করে। তখন সে বিষয়টি না বুঝেই মুখস্থ করতে শুরু করে দেয়। এর ফলে তার স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।
এই সিরিজে যে-১০৫০টি 'কীভাবে' এবং 'কেন'-এর উত্তর দেওয়া হয়েছে তার কয়েকটি
■ জিভ কীভাবে স্বাদ জানান দেয়? ■ রামধনু তৈরি হয় কীভাবে? ■ কীভাবে আমরা ঘটনা মনে রাখি? ■ কী ক'রে আমরা চশমা পরে পরিষ্কার দেখতে পাই?
বৈশিষ্ট্য
■ ইতোমধ্যেই ৫০ লক্ষেরও বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছে গেছে।
■ স্কুলের অনুষ্ঠানে পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়।
■ প্রতিটি খণ্ডই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র।
■ অভিজাত গ্রন্থাগারগুলির পছন্দসই।
■ সংবাদপত্রগুলি কর্তৃক তাদের সমালোচনায় প্রশংসাপ্রাপ্ত।
৬ খণ্ডের একটি সেটে আছে
১৩০০ বড়ো সাইজের পৃষ্ঠা
১১০০ ছবি
৫,০০,০০০ শব্দ
১০৫০-এরও বেশি 'কীভাবে' এবং 'কেন' আর
সেটটি ভরা আছে একটি গিফট বক্সে
PRICE:
Paperback Student Edition: Rs. 24/- each
Postage: Rs. 4/- each
Full Set: Rs. 144/- Postage Free
Hard Bound Gift Edition: Rs. 30/- each
Postage: Rs. 5/- each
Full Set: Rs. 180/- Postage Free
Also available in English.
Six Vols. Price same
"র‍্যাপিডেক্স" ইংলিশ স্পীকিং কোর্স
3,00,00,000
তিন কোটিরও বেশি
পাঠকের পছন্দ
New Addition
LETTER WRITING
মূল্য 30/-
ডাক মাশুল
5/- অতিরিক্ত
It's really a good book to learn spoken English —Kapil Dev
কনভেন্ট স্তরের 'শুদ্ধ ও অনর্গল ইংরাজী' শেখাবার এমন বই — যা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যাকে সমাজের সর্বস্তরের এবং সব ভাষাভাষি লোক আপন করে নিয়েছে।
101 ম্যাজিক ট্রিক্স
101 সাইন্স গেমস
Price Rs. 15/- Postage Rs. 4/- each
101 সাইন্স গেমস
যখন শিশুরা বিজ্ঞানের সাধারণ ও সহজ সূত্রগুলি শিখছে অন্যদিকে তারা সঙ্গে সঙ্গে এও শিখছে রকমারী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরী করার বিধি যেমন ব্যারোমিটার, বৈদ্যুতিক চুম্বক, হেক্টোগ্রাফ, বাষ্প চালিত টারবাইন, ইলেকট্রোস্কোপ ইত্যাদি।
101 ম্যাজিক ট্রিক্স
একটা মজার ব্যাপার কোন পার্টিতে, জলসায়, ঘরোয়া জমায়েতে অথবা ভ্রমণকালে কেড়ে নেওয়ার জন্য নতুন মজাদার হাত সাফাই-এর খেলা দেখিয়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবকে আনন্দ দাও।
বাংলা হিন্দী লার্ণিং কোর্স
Price 30/- Postage Rs. 5/
AVAILABLE at leading bookshops, A.H. Wheeler's and Higginbothams Railway Book Stalls throughout India or if not available ask by V.P.P. from:
PUSTAK MAHAL
Khari Baoli, Delhi-110006
Show Room: 10-B, Netaji Subhash Marg, New Delhi-110002.
VAN/PM/17/87
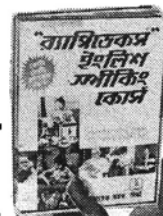
আলোকপাত — তৃতীয় বর্ষ * দশম সংখ্যা * নভেম্বর ১৯৮৮

বাস্তব জীবনের আয়না

প্রধান সম্পাদক: আলোক মিত্র
সহায়ক সম্পাদক: রমাপ্রসাদ ঘোষাল
সহ সম্পাদক: প্রদীপ বসু
উপসম্পাদক: হাবিব আহসান
গুরুপ্রসাদ মহান্তি
সংবাদদাতা
দিল্লি: পুষ্কর পুষ্প
হায়দরবাদ: পারভেজ খান
মাদ্রাজ: লক্ষ্মী মোহন
লণ্ডন: বলবন্ত কাপুর
ওয়াশিংটন: শেখর তেওয়ারি
লস এঞ্জেলেস: আফসান সফি
বম্বে ব্যুরো প্রধান: রবীন্দ্র শ্রীবাস্তব
আলোকচিত্রী: বিকাশ চক্রবর্তী
ভিসুয়ালাইজার: শান্তনু মুখার্জি

দিল্লি কার্যালয়:
সজয় লাল: ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক
৩০৫ রোহিত হাউস, ৩ তলস্তয় মার্গ
নয়াদিল্লি–১১০০০১
দূরভাষ: ৩৩১৪৫৩০
টেলেক্স: ০৩১ ৬৭১৫ নিউজ ইন
বম্বে কার্যালয়:
অনুপ জুৎসি: আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৮১০ এমব্যাসি সেন্টার
নরীম্যান পয়েন্ট
বম্বে–৪০০০২১
দূরভাষ: ২৪৩৫৭৭, ২৪৪৮৪৬
টেলেক্স: ০১১ ২৫৫৭ মায়া ইন
লখনউ কার্যালয়:
বি–১০৩, গোপালা অ্যাপার্টমেন্টস,
৫০, রামতীর্থ মার্গ, হজরতগঞ্জ, লখনউ–২২৬০০১
দূরভাষ: ৩৬২৬২/৩৪৪৭৭
ব্যুরো প্রধান: অজয় কুমার
কলকাতা সম্পাদকীয় ও ব্যবসায় কার্যালয়
স্টিফেনস কোর্ট
ফ্ল্যাট–৫ এ (পাঁচতলা)
১৮ এ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা–৭০০০১৬
দূরভাষ: ২৯০৩৫, ২৯৮৫৪০
টেলেক্স: ০২১ ৫১৭৩, নিউজ ইন
ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক: অমিত সেন
প্রধান কার্যালয়:
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ ২১১০০৩
দূরভাষ: ৫৩৬৮১, ৫১০৪২, ৫৫৮২৫, ৫৫৭৭৩
গ্রাম: মায়া এলাহাবাদ
টেলেক্স: ০৫৪ ০২৮০
প্রকাশক: দীপক মিত্র
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ–২১১০০৩ থেকে প্রকাশিত
এবং মায়া প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে অশোক মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।
ফোটোকম্পোজিং: মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, এলাহাবাদ–এর একটি ইউনিট–সুরুচি অফসেট।

AIR SURCHARGE 50 PAISE PER COPY
for Dibrugarh, Silcher, Tinsukia, Jorhat, Tejpur, Shillong, Kathmandu and Agartala

সূচীপত্র

শান্তিদেবীর ঘটনাটি একসময় আলোড়ন তুলেছিল সারা ভারতবর্ষে। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃবর্গ থেকে শুরু করে স্বয়ং গান্ধীজি পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন ঘটনাটির প্রতি। সুইডিশ এক পরামনোবিজ্ঞানীর পরে তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে আয়ান স্টিভেনসনেরও। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের খ্যাতিমান গবেষক এই ঘটনাটির সম্প্রতিকতা নিয়ে পেশ করেছেন একটি সন্ধানী প্রতিবেদন।

বাংলাদেশি এক মেয়ে, বি[...] বাবামায়ের দত্তক নেওয়ার [...] এখন এক স্বপ্নিল কিশোরী-[...] ইচ্ছে ছিল রাজকন্যা হবার [...] বিলিতি নয়, একেবারে ভার[...] রাজকন্যা! শেষ অব্দি তার [...] স্বপ্ন সফল হল। সম্প্রতি সে [...] গেল তার স্বপ্নের দেশ, ভার[...] একটি বর্ণিল প্রতিবেদন, [...] পাঠকদের ইচ্ছাপুরণের স্ব[...] আর বাস্তবায়নের মধ্যেকা[...] ব্যবধানটিকে কমিয়ে আন[...] অনেকটাই।

একদিকে আর্টফিল্ম, অপর[...] বাজারচলতি মশলা ফিল্ম[...] দুইয়েতেই সমান পারদর্শি[...] শাবানা আজমী মুখ খুলেছে[...] আমাদের প্রতিবেদকের কা[...] ভারতীয় ফিল্মের গণ্ডী ছাড়ি[...] যখন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে[...] প্রাঙ্গনে পা রাখতে চলেছেন তখন এক গুরুত্বপূর্ণ স্বাক্ষাৎক[...]

'আলোকপাত'-এর পাঠক পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। দীপাবলীর আলোকিত অস্তিত্বে পথচলা হোক আনন্দময় এই প্রার্থনায় সামিল আমরাও। আমাদের গত সংখ্যাটি ছিল শারদীয়া সংখ্যা। বাংলা সাহিত্যের এই শারদ জোয়ারে গা না ভাসিয়েও আমাদের এই সংখ্যাটি যে এক অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছে তা পাঠক পাঠিকাদের অকুণ্ঠ সমাদর আর সমমনস্কতার মধ্য দিয়েই প্রকাশ। 'আলোকপাত'-এর নভেম্বর সংখ্যাটিতেও তেমনই আমরা সন্নিবিষ্ট করেছি জীবন আর জীবনায়নের বৈচিত্র্যকে, আরও অভিনবতর সম্ভারে।

আমাদের মুখ্য প্রতিবেদনগুলিতে রয়েছে অনেক বছর আগে ঘটে যাওয়া এক আশ্চর্য ঘটনার নবমূল্যায়ন। তদানীন্তন কংগ্রেসী নেতৃত্ব এমনকি স্বয়ং গান্ধীজী পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে ঘটনাটির প্রতি। প্রতিবেদকের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ এই আকর্ষণীয় প্রতিবেদনটি আমরা উপস্থাপিত করছি পাঠকদের সামনে।

এই সংখ্যাতেই আছে এমন একটি বাঙালি মেয়ের কথা, যে রাজকন্যা হতে চেয়েছিল, বিদেশি নয় ভারতীয় রাজকন্যা। রাজতন্ত্রহীনতার এই হাইটেক অত্যাধুনিক যুগেও তার স্বপ্ন সফল হয়েছিল। কিছুদিন আগেই সে ঘুরে গেল ভারত থেকে, সেই পরবাসী বাঙালি মেয়ে অতঃপর পেলও রাজকীয় সম্বর্ধনা। একটি বর্ণময় আকর্ষণীয় কাহিনী, যা হয়ত সব পাঠক পাঠিকারই ইচ্ছাপূরণের রাস্তাটিকে কল্পনার আগল খুলে দিয়ে বাস্তবের দিকে নামিয়ে আনবে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রস্তুতির হালহকিকৎ পেশ করা হয়েছে এই সংখ্যার একটি প্রতিবেদনে। রয়েছে প্রতিভাবান তরুণ, বাংলা দূরদর্শন ধারাবাহিকের জনপ্রিয় সহপরিচালক ডেভিড ওরফে ব্রতীন্দ্র রায়চৌধুরীর মৃত্যু ও তৎপরবর্তী ঘটনাক্রম নিয়ে একটি অন্তর্তদন্তমূলক রচনা।

হিন্দি চলচ্চিত্রের এপিঠ ওপিঠ, আর্ট ফিল্ম আর মশলা ফিল্ম দুই মাধ্যমেই সমান পারদর্শিনী শাবানা আজমী সম্বন্ধেও পেশ করা হয়েছে একটি অন্তরঙ্গ প্রতিবেদন। অভিনেত্রী শাবানা, আর শাবানার সামাজিক অস্তিত্বের টানাপোড়েনের দিনদৈনিকতা।

পৃথিবীর একটি ভয়ংকর–সুন্দর ক্রীড়া পরম্পরা বকসিং-এর হালহকিকৎ নিয়ে রয়েছে একটি বিশ্লেষণী তথা বর্ণময় রচনা 'টাইসন কি আলির আসন টলাতে পারবেন!' এছাড়া লণ্ডনের মিনি ভারতবর্ষ সাউথ হল নিয়েও পেশ করা হয়েছে একটি সময়োপযোগী রচনা। বিলাতী বর্ণবিদ্বেষ যে এখনও অস্তমিত নয় তাদের সাম্রাজ্যসূর্য অস্ত যাওয়ার এতদিন পরেও তার সর্বাঙ্গীনতাকে স্বীকার করে নিয়েই সাগরপারের এইসব বাঙালিরা, ভারতীয়রা, এশিয়রা কিভাবে এগোচ্ছে উন্নতি ও সমৃদ্ধির রাস্তায় তারই একটি সচিত্র প্রতিবেদন।

হাওড়ার একটি আশ্চর্য পরিবারের কথা বিবৃত হয়েছে এই সংখ্যায়। রাণা প্রতাপের উত্তর প্রজন্মের এই দ্বিধাবিভক্ত বংশজদের মধ্যে একটি শাখা হিন্দু অপরটি মুসলিম, বসতি করছেন কলকাতার কাছেই। আজ কয়েকশ বছর হয়ে গেল হিন্দু-মুসলমান দুই পরিবারের মধ্যে সম্প্রতি আর ঘনিষ্ঠতার বন্ধন অটুট। সমস্যাসঙ্কুল মানসিকতায় বিধ্বস্ত ভারতবর্ষে এধরনের পরিবারগুলি অনুপ্রেরণায় আদর্শস্থানীয়।

শারদীয়ার সোনালী দিনগুলির অবকাশ–নিশ্চিন্ততা পেরিয়ে এসে আবার শুরু হয়েছে কর্মব্যস্ততা। আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তরও আবার সেই কর্মব্যস্ততার স্বাভাবিকতায় ফিরে এসে এই সংখ্যাটিকে আর আগামী সংখ্যাগুলিকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করার কাজে প্রযত্নবান। যে প্রচেষ্টা আমাদের নিরন্তরের।

আলোক মিত্র
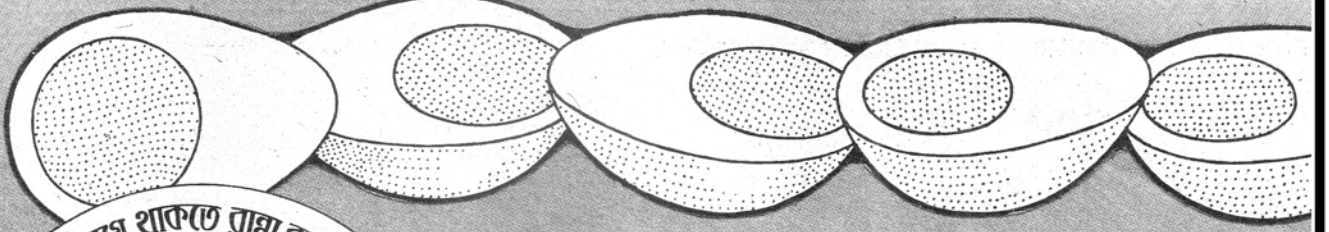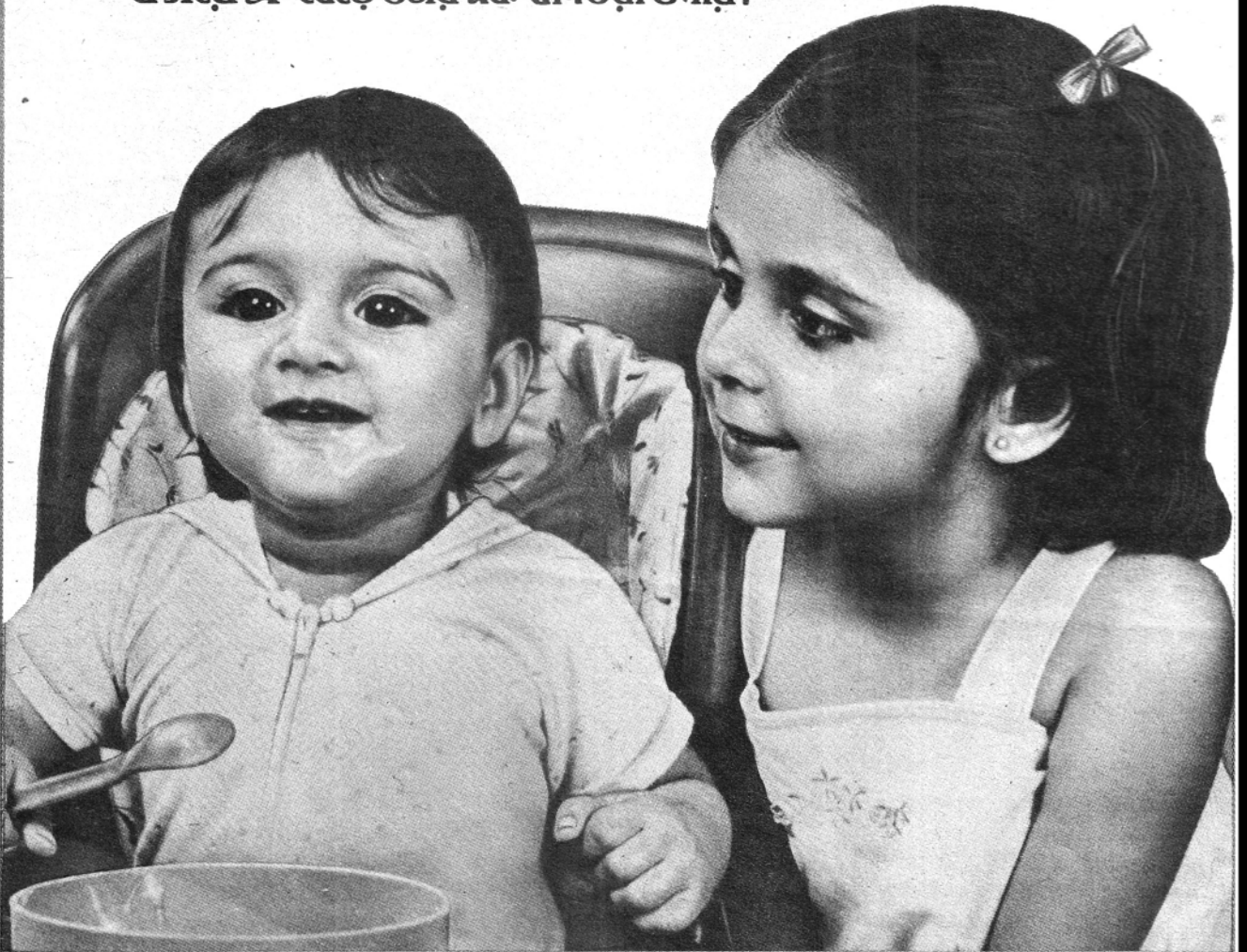
জন্মান্তরবাদ কি অতিপ্রাকৃত নয়!

জুলাই '৮৮ সংখ্যার আলোক-পাতে 'জাতিস্মর দোলন-চাঁপাকে দিয়ে জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত'–বিতর্কে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বনাম দশ জন বিজ্ঞানী শীর্ষক প্রচ্ছদ প্রতিবেদন পড়লাম।

ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশেই প্যারাসাইকোলজিস্ট নামক অপবিজ্ঞানীর দল অতিপ্রাকৃত জীব আছে, পরলোক আছে, জাতিস্মর আছে বলে বিভিন্ন সময়ে দাবি করেন বা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দাবি করলেই বা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেই কি তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়?

বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করতে হবে। তা হলে জড় বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত মানুষ যেভাবে গ্রহণ করবে, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের ফলও তেমনভাবে গ্রহণ করবে। কিন্তু এই বিষয়ে তেমন কোন প্রমাণ তো নেই। বরং যারা মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি যে কত শিথিল প্রবীর ঘোষের তথ্যভিত্তিক লেখাটিই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। জন্মান্তর এবং এর ফলে পূর্বজন্মের স্মৃতিকে ধারণ করার ঘটনাটি আদৌ ঘটে না।

জন্মান্তর ও জাতিস্মরের কথা প্রচার করা হলেও পৃথিবীর এত কোটি মানুষের মধ্যে, সকলের মধ্যে না হোক বেশির ভাগ লোকের ক্ষেত্রেই তা হয় না। ব্যাপারটি সত্যি ও বিজ্ঞানসম্মত হলে তা হওয়া উচিত। কখনো বা কেউ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এসব প্রচার করে, কখনো বা পরামনোবিজ্ঞানী নামধারী অপবিজ্ঞানীরা আত্মপ্রচার ও বাহাদুরী নেওয়ার জন্য বা জন্মান্তরবাদে নিজেদের অন্ধ বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মনগড়া ভাবে পুরো ব্যাপারটিকে সাজিয়ে হাজির করে। আয়ান স্টিভেনসন বা স্বামী লোকেশ্বরানন্দের ক্ষেত্রেও একই কথার পুনরাবৃত্তি করা চলে।

ডঃ আব্রাহম কোভুর, পল কুরুৎজ, জেমস র‍্যান্ডি, প্রবীর ঘোষ বা এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কারের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য যারা কাজ করছেন তারা তথাকথিত জাতিস্মর ও জন্মান্তরের বহুল প্রচারিত নানা ঘটনার ভেতরের চালাকি ও ভ্রান্তিকে পরিষ্কার ভাবে দেখিয়েছেন।

সুমিতা শীল
কলকাতা–৬

প্রতিবাদ পত্র: জাতিস্মর দোলনচাঁপা

আলোকপাত জুলাই '৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত 'জাতিস্মর দোলনচাঁপা' বিষয়ে যে লেখাটি ছাপা হয়েছে তাতে শ্রী প্রবীর ঘোষের প্রতিবেদনের সঙ্গে আমাদের মতের অনেক জায়গায় অমিল আছে। প্রতিবেদক বলেছেন দোলন বর্ধমানের বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছিল, বাড়ির রং বলেছিল 'টুকটুকে লাল,' অথচ সত্যি ঘটনা হল, দোলন বর্ধমানের বাড়ি দ্বিতীয়বার বর্ধমান গিয়ে চিনিয়েছে, এবং সে কখনোই বলে নি বাড়ির রং 'টুকটুকে লাল'। রং শুধু 'লাল' বলেছে। প্রতিবেদক উল্লেখ করেছেন 'অনাথ দে এবং নিশীথ দে জানান'...। সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার প্রতিবেদক নিশীথ দের উক্তি কোথায় পেলেন? নিশীথ দে তখন জীবিত ছিলেন কি? প্রতিবেদক লিখেছেন প্রথম বর্ধমান যাত্রায় দোলন গ্রুপ ছবিতে নিশীথের ও শিশিরের ছবি চিনিয়ে দিয়েছিল '৭৫ সালে তৃতীয় বার বর্ধমানে গিয়ে, বাস্তবে শিশিরকে চেনায় দ্বিতীয়বার বর্ধমানে গিয়ে। শিশির দে-কে সে সরাসরি কখনোই চিনিয়ে দেয় নি। যেমন দোলন লক্ষ্মী দে-কে কখনোই ছোট কাকীমা বলে নি। বলেছে কাকীমা। এটাই লক্ষ্য করার মত প্রবীরবাবু অনাথ দে এবং নিশীথ দে-র (যিনি বহু পূর্বেই মারা গেছেন) ধারণাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অথচ লক্ষ্মী দে যে সরাসরি বিবৃতি দিয়েছেন তার ওপর মনোযোগ দেন নি।

দোলন কখনোই বলেনি বর্ধমান-এর ধনী পরিবারের পদবী 'দে' ছিল। বর্ধমান যাবার আগেও সে ও বাড়ির কারো নাম বলেনি। আর মিত্র পরিবারের বন্ধু বা পরিচিত (বর্ধমানের) কেউ অনাথদের বাড়ির বিবরণও দেন নি। এখন দোলনের মাথার ব্যথা নেই সত্যি কিন্তু নিশীথের চিন্তা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা কমেছে–একথা গ্রহণযোগ্য নয়। এখনও পূর্ব-জন্মের নিশীথের কথা দোলন পরিষ্কার মনে করতে পারে।

প্রতিবেদক প্রবীর ঘোষ দোলন চাঁপা সম্পর্কে কিছু তথ্য নিজের কল্পনায় তৈরি করে এবং ভুল যুক্তি দিয়ে পরিবেশিত করে সকলের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

শ্রী প্রবীর ঘোষ পরিচিত দশ বিজ্ঞানীর মতামত নিয়ে এই কেসটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস চালিয়েছেন। মিত্র পরিবারের সঙ্গে যাঁরা বর্ধমান গেছিলেন তাঁদের কারোরই সাক্ষ্য প্রবীরবাবু অথবা উক্ত দশ বিজ্ঞানী জানতে চান নি বা নেন নি।

-ঔদার্যময় মিত্র, কণিকা মিত্র।
কলকাতা

প্রতিবাদঃ পাঁচ গাছিয়ার চালচিত্র

সেপ্টেম্বর '৮৮ সংখ্যার আলোকপাত-এ পাঠকের অধিকার পৃষ্ঠায় 'পাঁচ গাছিয়ার চালচিত্র' শীর্ষক গোবর্ধন বাউরির লেখা পত্রটি পড়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আমি প্রত্যেক সংখ্যা আলোকপাত পড়ি, 'মে' সংখ্যাও পড়েছি। সেই সংখ্যায় 'বাংলা, বিহার সীমান্তে কয়লা ক্ষেত্রের প্রশাসন কি কোন মাফিয়ারা কব্জা করবে?' প্রতিবেদনটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও একটি বলিষ্ট প্রতিবেদন।

পত্র লেখক জানিয়েছেন যে সংখ্যার উক্ত প্রতিবেদনটি পড়ে আশ্চর্য হয়েছেন এবং আপনাদের সাংবাদিক মহাশয় কিছু না জেনেশুনেই প্রতিবেদনটি লিখেছেন এবং আপনারা তা প্রকাশও করেছেন। পত্র লেখকের এইরূপ অযুক্তিপূর্ণ ও মিথ্যে বানানো গল্প পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। লেখক পাঁচ গাছিয়ার বাসিন্দা হলেও খোঁজ খবর কিছুই রাখেন না বলে আমার ধারণা। তা না হলে উনি কখনোই ওনাদের নেতা, কংগ্রেস নেতা মানিক উপাধ্যায়ের জয়গান গাইতে এই সব বানানো গল্প লিখতেন না। লেখকের পত্রে এক জায়গায় বলা হয়েছে, মানিক উপাধ্যায়ের এক ডাকে পাঁচ গাছিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজী। বলাবাহুল্য পাঁচ গাছিয়ার বিশেষ কয়েকটি গ্রাম ছাড়া মানিকবাবুকে কেউ চেনেনও না। গত বিধানসভার উপনির্বাচনের কয়েকদিনই ওনার অস্তিত্ব টের পাওয়া গেছে। গতবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে লেখকের দেওয়া উদাহরণকে স্রেফ একটা বানানো মিথ্যে গল্প ছাড়া আর কি বলবো?

পত্রশেষে লেখক লেনিন, গান্ধিজী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একজন সামান্য নেতা মানিক উপাধ্যায়ের সঙ্গে, তুলনা করেছেন কি ভেবে এবং তাদের মাফিয়া বলার স্পর্ধা পেলেন কোথা থেকে ভেবে অবাক হচ্ছি।

পার্থ দে,
৩৩, নিউ মার্কেট বর্ধমান

তর্কে-বিতর্কে স্বামী স্বরূপানন্দের অখণ্ড মণ্ডলী

আলোকপাত-এর জুন '৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্বামী স্বরূপানন্দের অখণ্ড মণ্ডলী লোভ লালসায় খণ্ড' শীর্ষক তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদনের জন্য শিলং অখণ্ড মণ্ডলীর পক্ষ হতে শ্রী বৈদ্যনাথ দলপতিকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। অন্তর্তদন্তের ফল প্রায় নিখুঁত ভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ওই প্রতিবেদনে শুধু ২টি বিষয়ে সঠিক তথ্য তুলে ধরা হয় নি। প্রথমতঃ স্বামী স্বরূপানন্দের (বাবামণির) আনুমানিক জন্ম–সন বলা হয়েছে বাংলা ১২৯৪ (?) সাল। বাস্তবে বাবামণির অনুজ ও মন্ত্রশিষ্য শ্রদ্ধেয় সুখময় গাঙ্গুলীর কাছে সযত্নে রক্ষিত তাঁদের পিতৃদেব পরম পূজ্যপাদ সতীশ চন্দ্র গাঙ্গুলীর ডায়েরী (দিনলিপি) অনুযায়ী বাবামণির জন্ম হয়েছিল পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের) চাঁদপুর সহরে বাংলা ১৩০৬ সালের ১২ পৌষ 'মঙ্গলবার রাত্রি ১০টা ১৬ মিনিটে।

'আলোকপাত'-এর গত আগস্ট সংখ্যায় 'পাঠকের অধিকার' স্তম্ভে (৪র্থ পৃষ্ঠায়) ওই প্রতিবেদন সম্পর্কে পর পর তিনখানা পত্র বেরিয়েছে। প্রথম পত্রে প্রতিবেদনের সমর্থনে পাওয়াই অখণ্ড মণ্ডলীর পক্ষে শ্রী সুশান্ত সাহা যে বক্তব্য রেখেছেন তার সত্যতা অনস্বীকার্য্য।

দ্বিতীয় পত্রখানায় করিমাঞ্জের শ্রী মনোজ কুমার দাস, সাধনা দেবী ও স্নেহময় ব্রহ্মচারীর অনেক সাফাই গাইতে গিয়ে অসীম ব্রহ্মচারী সম্পর্কে অশালীন শ্লেষোক্তি করেছেন। আশ্রমের কাজে অক্লান্ত শ্রম ও কৃচ্ছসাধনের জন্য একদিকে যেমন সাধনা দেবী বাবামণির ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন, অপরদিকে তেমনি ব্রহ্মচারী স্নেহময়, ব্রহ্মচারী নিত্য-সুন্দর ও ব্রহ্মচারী অসীম বাবামণির অনেক প্রশংসাপত্র পেয়েছিলেন।

আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক স্নেহময় ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধে অশিষ্টাচার, নিজনামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে পূর্বাপ্রমে নানা পন্থায় দফায় দফায় অর্থপাচারের যে সব গুরুতর অভিযোগ দীর্ঘকাল যাবৎ উঠেছে, তা এক কথায় উড়িয়ে দেবার নয়। তৃতীয় পত্রখানার লেখক শ্রী শংকর চন্দ্র ঘোষের নামের সঙ্গে রাজনৈতিক ছাপ থাকলেও কোন ঠিকানা দেওয়া হয় নি। পত্র পড়ে বোঝার উপায় নেই তিনি আসলে কি বলতে চান। আলোচ্য প্রতিবেদনের কোথাও ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়ে থাকলে সঠিক তথ্য দিয়ে সংশোধন করে নিতে বাধা কোথায়?

নবগোপাল পাল
শিলং অখণ্ড মণ্ডলী
মেঘালয়

হাওড়ায় দুই ধর্ম 'এক পরিবার'!

রাণা প্রতাপের আত্মগোপনকৃত বংশপ্রবাহ হাওড়ার হাল্যান গ্রামে হিন্দু-মুসলিম দ্বিধারায় বিভক্ত হয়েও সৌভ্রাতৃত্বের সহাবস্থানে বসবাস করছেন আজ প্রায় ৪০০ বছর।
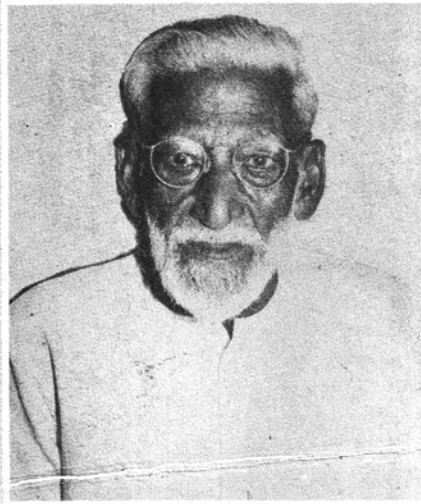
শেখ নাজিমুদ্দিন

গৌর খাঁড়া

মসজিদের চূড়ায় ভোরের আলো ঝলকে উঠেছে। ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে হাওয়ায় ভেসে আসছে ফজরের আজান।

মসজিদের দু'পাশে সবুজ শ্যামলিমার পটভূমি। মসজিদের প্রবেশ পথে রয়েছে স্মৃতির ফলক। তাতে ধূসর ছায়া। ফলকে খোদিত—বা হুক্‌মে হেক্‌মে হেদায়েৎ মোরত্বায়ে সখতরে মসজিদ এনায়েৎ। পরিষ্কার আরবীতে লেখা। যার অর্থ দাঁড়ায় এনায়েতুল্লা অতিকষ্টে এই মসজিদ নির্মাণ করলেন এবং এই মসজিদ জনসাধারণকে দেওয়া হল। স্মৃতিফলকে এখনও জ্বলজ্বল করছে এই আরবী অক্ষরগুলি। মসজিদের বয়স প্রায় তিনশ। দু'এক জায়গায় ফাটল ধরেছে। নেমে এসেছে বট-অশ্বত্থের ঝুরি। পলেস্তরা খসে পড়ছে। কয়েক মুহূর্ত তাকালে মন কেমন করে ওঠে।

হাওড়া থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে একেবারেই শান্ত ভীরু প্রকৃতির এই গ্রাম হাল্যান। একেবারেই সাদামাঠা। গ্রামের মাঝামাঝি এই প্রাচীন মসজিদটি আসলে অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। মসজিদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা মানুষজন আজও বয়ে চলেছেন ইতিহাসের স্মৃতি। ইদানিং সংস্কার হয়েছে মসজিদটির। ঠাটবাটও এসেছে চেহারায়। এর পেছনে যে ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে, তা অনুমান করা যায় না। সংস্কারের ফলে আজকাল আগের স্মৃতিমেদুরতা নেই। কিন্তু যারা এই স্মৃতির সাক্ষী তাদের কাছে এ এক প্রিয় সম্পদ। যা কেবলই রক্তের গোপনে বয়ে চলে।

এই মসজিদটি আসলে ইতিহাসের জীবন্ত চরিত্র রাণা প্রতাপের বংশধরের স্মৃতিস্মারক। আজ সেইসব ঐতিহাসিক চরিত্রেরা কেউই নেই। যা কিছু সবই ইতিহাসের পাতায়। সুদূর চিতোর থেকে চলে আসা আত্মীয় ঘুরণ সিং-এর এই সবুজ বাংলাকে ভাল লেগে গিয়েছিল। তাই গড়ে উঠেছিল তার সৌধ সাম্রাজ্য। পরিচয়হীন হাল্যান গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এমনি অনেক রাজপুত বীরের স্মৃতিমালা।

শেখ নাজিমুদ্দিনের বয়স পঁচাশি। রাণা প্রতাপের প্রবীণ এই উত্তরসূরী কাজ করতেন কলকাতার রিজার্ভ ব্যাংকে। নাজিমুদ্দিনের আরেক পরিচয় শিক্ষানুরাগী হিসেবে। অভিজ্ঞতায় ভরাট এই প্রবীণ মানুষটির বড় ভাই শেখ আমিনুদ্দিন সে সময়কার বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন 'খান সাহেব' উপাধি। সে সময় তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। সেইসঙ্গে জড়িত ছিলেন নানা জনকল্যাণমূলক কাজে। নাজিমুদ্দিন সাহেবের বড় ছেলে আনসারুদ্দিন আমেদ চাকরি করেন। মেজ ছেলে এল এল বি পাস

করে শিক্ষকতা করছেন। খান সাহেবের ভাইপো মসলেমউদ্দিন আমেদ পেশায় শিক্ষক এবং বামপন্থী রাজনীতিতে সংযুক্ত। সব মিলিয়ে উত্তরসূরিদের যৌথ সংসার রীতিমত জমজমাট। খান সাহেব আমিনুদ্দিনের কিন্তু জবাব নেই। এই গ্রামেই তাঁর বাবার তৈরি মক্তব তাঁর উদ্যোগে মাদ্রাসায় রূপান্তরিত। ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রাসা জুনিয়র হাইস্কুল হিসাবে চলে আসছে। এর পিছনে রয়েছে গ্রামবাসীদের সহায়তা। এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলেরা পড়াশুনো করে। প্রধান শিক্ষক সন্ন্যাসী চরণ জানা প্রায় ছাব্বিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন।

কিন্তু সংশয় জাগে কিভাবে হিন্দু রাণা প্রতাপের বংশধর মুসলমান হিসেবে পরিচয় লাভ করলেন? এমন কি ঘটেছিল যার ফলে দাপুটে হিন্দু রাণা প্রতাপের আত্মীয় রূপান্তরিত হলেন মুসলমানে? হাল্যানের শুরুতে রয়েছেন রাণা প্রতাপের আরেক বংশধর খাঁড়া পরিবার। তারা হিন্দু। এ গ্রামে একই বৃন্তে দুটি ফুল-হিন্দু-মুসলমান। একই পুরুষের উত্তর পুরুষ তাঁরা।

গ্রামের শুরুতে বসবাসকারী হিন্দু পরিবারটির পদবী খাঁড়া। পঁচাত্তর বছরের শ্রী সন্তোষ খাঁড়া এখন খাঁড়া বংশের প্রবীণ মানুষ। একরকম অবসর প্রাপ্ত। জীবনযাপন করছেন স্বাচ্ছন্দ্যেই। চোখে মুখে প্রশান্তির ছাপ। কিন্তু কোথায় যেন লুকিয়ে আছে একটা চাপা ক্ষোভ। বংশের অনেকেই বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছেন বিভিন্ন জায়গায়। ফলে খাঁড়া পরিবার বলতে এখন গ্রামের শুরু এবং শেষ প্রান্তে কয়েক ঘর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক গৌর খাঁড়া বয়সে যুবক তাই টগবগ করছে ইচ্ছে অনিচ্ছার স্বপ্নগুলো। মনেপ্রাণে স্বদেশী। এঁর পেছনে যে অনুপ্রেরণা কাজ করছে তা হল–সদ্য প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী ভবতোষ খাঁড়ার আদর্শ। উনি মনে করেন যে উত্তরসূরি হিসাবে খুব বেশি গৌরব করার মত কিছুই নেই। 'যা আছে আমাদের নতুন প্রজন্ম। চেষ্টা করব তাদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার।' কথায় কথায় অজিত খাঁড়া জানালেন, 'আমরা যা হব ভেবেছিলাম তা হতে পারিনি। দোষ কারুর নয়, দোষ আমাদেরই। তাই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। চেষ্টা করব আমাদের উত্তরসূরিরা যেন যোগ্যতার সঙ্গে নিজেদের পরিচয় গড়ে তুলতে পারে।'

এবার ফিরে তাকান যাক এই গ্রামের প্রেক্ষাপটে। হাওড়া জেলার বাগনান থানার দক্ষিণে রূপনারায়ণ, দামোদর আর ভাগীরথী দিয়ে ঘেরা এই হাল্যান গ্রাম। বর্তমানে লালমাটির রাস্তা গ্রামের বুক চিরে বয়ে গেছে। দু'ধারে সবুজ ধানক্ষেত। এই গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু ইতিহাসের কণা।

দিল্লির সিংহাসনে তখন আকবর। রাজ্যের পরিধি বিস্তারের পরিকল্পনা আঁটছেন তিনি। কিন্তু সেই সময় দুধর্ষ রাজপুত জাতি তার বাধা হয়ে দাঁড়ান। শেষ পর্যন্ত ছলে বলে কৌশলে রাজপুত রাজন্যবর্গকে নিজের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হন। সেই সঙ্গে রাজপুত অহংকার মেবারকেও। সেনাপতি আসফ খাঁ ও সেনাপতি রাজা মানসিংহর অধীনে বিরাট মোঘলবাহিনী মেবার রাজধানী চিতোর আক্রমণ করতে পাঠান। রাণা উদয় সিংহ ছেলে রাণা প্রতাপ সিংহের বিশাল পদাতিক তীরন্দাজ অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী সমেত ১৫৭৬ খৃঃ মোগল বাহিনীকে সিংহ বিক্রমে আক্রমণ করেন। যুদ্ধের আকার ঘোরতর হয়ে ওঠে। জয় পরাজয় হয়ে ওঠে অনিশ্চিত। শেষ পর্যন্ত রাজপুত বীর রাণা প্রতাপ যুদ্ধে হেরে পালিয়ে যান। তখন সপরিবারে প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নেন জঙ্গলাকীর্ণ এক পর্বত গুহায়। সেই সঙ্গে তাঁর সেনাপতিদের মোগলের কাছে আত্মসমর্পণ না করে নিজ নিজ ইচ্ছায় আত্মগোপন করার আদেশ দেন। 'রাণা ঘুরাণ সিং' রাণা প্রতাপের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সেই সঙ্গে যুদ্ধের প্রধান সেনাপতিও। তাঁরই এক আত্মীয় এবং সহকর্মী সোহান খাঁড়া (দাস) কে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সেনাপতির পোশাকে হলদিঘাট যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দুর্গম পথ, বনজঙ্গল, পাহাড় পর্বত, নদী-নালা পার হয়ে বহু কষ্টে বাংলার নিভৃত রাস্তাঘাটবিহীন জনশূন্য গ্রামে এসে আশ্রয় নেন। বাসস্থান বলতে একটা অস্থায়ী ছাউনি। জায়গাটা জনশূন্য ঠিকই।
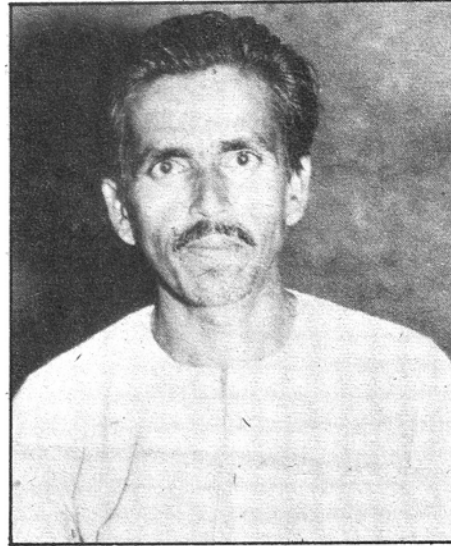
অশ্বিনী খাঁড়া

সেখ আবদুল ওদুদ

এই নির্জন জায়গাকে ঘুরাণ সিং নিরাপদ ভাবলেও বেশ কিছুলোক তার পরিচয় জানার জন্য পেছনে লেগে রইল। তাঁর পরিচয় জানার কৌতূহল প্রকাশ করল আশপাশের গ্রামের মানুষজন। সেনাপতি ঘুরাণ সিং তাঁর মাতৃভাষায় 'হলদিঘাট, যুদ্ধ, রাণা প্রতাপ সিং হারলেন'-এই কথাগুলি বোঝাতে চেষ্টা করলেন। তখন থেকেই লোকমুখে এই জায়গাটার নাম হল 'হারলেন' বা হাল্ল্যান।
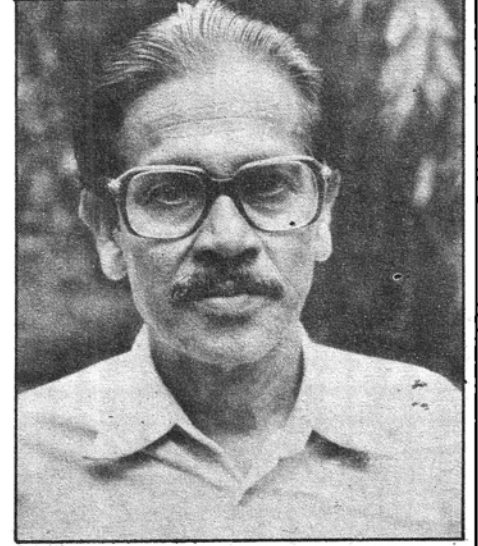
কিন্তু সৈনিকের পরিচয় যাবে কোথায়? এই নির্জন জায়গাকে ঘুরাণ সিং নিরাপদ ভাবলেও বেশ কিছুলোক তার পরিচয় জানার জন্য পেছনে লেগে রইল। তাঁর পরিচয় জানার কৌতূহল প্রকাশ করল আশপাশের গ্রামের মানুষজন। সেনাপতি ঘুরাণ সিং তাঁর মাতৃভাষায় 'হলদিঘাট, যুদ্ধ, রাণা প্রতাপ সিং হারলেন'–এই কথাগুলি বোঝাতে চেষ্টা করলেন। তখন থেকেই লোকমুখে এই জায়গাটার নাম হল 'হারলেন' বা হাল্ল্যান। এই রাজপুত সেনাপতি ঘুরাণ সিং ও সহকর্মী সোহান খাঁড়া স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন এই 'হাল্ল্যান' গ্রামে। এর মধ্যেই ৩০/৩৫ বছরের যুবক রাজপুত ক্ষত্রীয় বর্ণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ঘুরাণ সিং ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। নাম হয় ঘুরাণউল্লা। এবং বিয়েও করেন এক মুসলিম মহিলাকে। কিন্তু তাঁর সঙ্গী সোহান দাস, যিনি পরে খাঁড়া পদবী পান, তিনি ধর্মান্তরিত না হয়ে দিব্যি রয়ে গেলেন এই গ্রামে।

কিন্তু সরকার তাঁর (ঘুরাণউল্লা) পিছু ছাড়লেন না। তাঁকে কব্জা করতে জারি করলেন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। শেষ পর্যন্ত আটক হলেন ঘুরাণউল্লা। পরে তিনি ছাড়াও পেলেন। ততদিনে তাঁর একমাত্র ছেলে খাইরুল্লাহ শিক্ষায়, বুদ্ধিদীপ্ততায় এবং বহু জনকল্যাণমূলক কাজে রীতিমত জনপ্রিয়।

রাস্তাঘাট তৈরি, পুকুর কাটা, দূর থেকে লোকজন এনে গ্রামে বসবাস করার সুযোগ দিতে থাকলে সরকার তাঁকে খাইরুল্লাহ খান বাহাদুর উপাধিতে সম্মানিত করেন। খাইরুল্লাহ সাহেবের একমাত্র ছেলে এনায়েতুল্লাহ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুর্শিদাবাদে নবাব সেরেস্তায় উচ্চপদে স্থায়ীভাবে চাকরি করতে শুরু করলেন। চাকরির শেষে ফিরে এলেন নিজের গ্রামে। বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। তাঁরই একক প্রচেষ্টায় ১৭০২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হল গ্রামের প্রাচীন মসজিদটি। এছাড়াও তাঁদের পূর্বসূরি সোহান খাঁড়ার উত্তরসূরিদের জীবনযাত্রা ও কাজের সুবিধের জন্য তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে ধোপা, নাপিত, তাঁতি, তেলি, ও ব্রাহ্মণ পরিবারদের গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। যাঁরা আজও গ্রামের মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়ে সুন্দর ভাবে জীবন যাপন করছেন।

প্রেমচাঁদ খাঁড়ার উত্তরসূরিদের ঘুরাণউল্লার উত্তরসূরিদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রয়েছে। যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা দানা বাঁধছে ঠিক সেই সময়ে ৪০০ বছরের প্রাচীনতম এই দুই বংশধর হিন্দু মুসলিম শেখ আর খাঁড়াদের বিয়ের আচার অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ অভিনব মিলন সত্যিই এক উজ্জ্বল উদাহরণ। শুধু তাই নয়, ইসলামিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গ্রামের অমুসলিম মানুষেরা ও অমুসলিমদের পূজা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুসলিমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চাঁদা দিয়ে অংশ গ্রহণ করে আসছে যুগ যুগ ধরে। এ এক আশ্চর্য যুগলবন্দী। এই মুসলিম পরিবারে হিন্দু মেয়েদেরও বিয়ে হয়েছে। তারা নিজেদের ধর্ম বজায় রেখে দিব্যি সংসার করছে।

একই পরিবারে দুই ধর্মসহাবস্থান করছে। দুই ধর্মেরই রীতি নীতি আচার ব্যবস্থা আলাদা। ঘুরাণ উল্লার পরিবারে যখন ঈদ বা বকরঈদের পরব হয় তখন কিন্তু বাদ যান না হিন্দু পরিবারের লোকেরা। মুসলিমদের এই অনুষ্ঠানে তারাও কাজে হাত লাগান। পাত পেড়ে খেতে বসে যান। পায়েস, হালুয়া, ফিরনির এলাহি ব্যবস্থা। আর থাকে বিরিয়ানি। খাঁড়া পরিবারের লোকেদের তখন মনেই হয় না তারা আরেক ধর্মের লোক। পারস্পরিক ভাব বিনিময় চলে। চলে সুখ দুঃখের আলাপচারিতা। এই ট্র্যাডিশান সমানে চলছে। নাজিমুদ্দীন সাহেব গলা জড়িয়ে ধরেছেন হয়তো গৌরের। সালাম পর্ব সমাধা হতেই গৌর আসন নেয়। নাজিমুদ্দীন ততক্ষণে ফিরনির বাটি এনে ধরেছেন, গৌর তোর চেহারাটা এতো খারাপ হয়ে গেল কেন রে? গৌর তখন ভারি লাজুক হয়ে যায়, আর বলবেন না। এবারে কাজের চাপ বেশ বেড়ে গেছে। নাজিমুদ্দীন সস্নেহে হাত বুলিয়ে দেন পিঠে, ওরে মিতা ওকে আরেকটু ফিরনি দে। মিতা আসলে হিন্দু। বিয়ে হয়েছে ঘুরাণউল্লার পরিবারে। মুসলিম আচার ব্যবহারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে নিজেকে। কারো সঙ্গে দেখা হলেও, সালাম
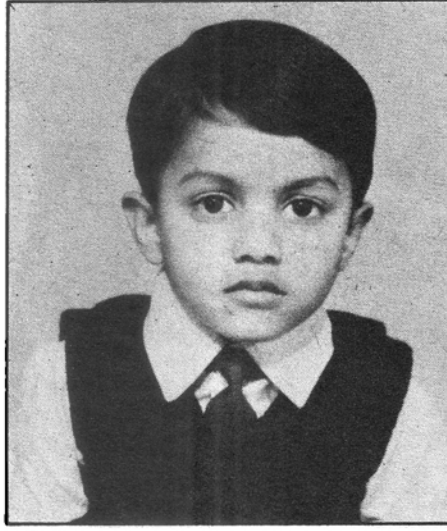
রোহন কুদ্দুস

একই পরিবারে দুই ধর্মসহাবস্থান করছে। দুই ধর্মেরই রীতি নীতি আচার ব্যবস্থা আলাদা। ঘুরাণ উল্লার পরিবারে যখন ঈদ বা বকরঈদের পরব হয় তখন কিন্তু বাদ যান না হিন্দু পরিবারের লোকেরা। মুসলিমদের এই অনুষ্ঠানে তারাও কাজে হাত লাগান। পাত পেড়ে খেতে বসে যান। পায়েস, হালুয়া, ফিরনির এলাহি ব্যবস্থা। আর থাকে বিরিয়ানি। খাঁড়া পরিবারের লোকেদের তখন মনেই হয় না তারা আরেক ধর্মের লোক। পারস্পরিক ভাব বিনিময় চলে। চলে সুখ দুঃখের আলাপচারিতা।

আলেইকুম বলতে একটুও অসুবিধে হয় না। বক্‌রা ঈদের সময়ও তো কম ঝক্‌কি যায় না? কুটুমদের পরিচর্যা করতে হয়। খাওয়া দাওয়ার তদারকি। তখন খাঁড়া পরিবারের মেয়েদের কেউ কেউ আসে। ভিয়েনে ভিড় বাড়ে।

ঘুরাণউল্লা পরিবারে এমন দৃশ্য বিরল নয়। তাদের উৎসব অনুষ্ঠানে ও পরিবারের বাচ্চারা ভিড় করে। তাদের নানা আবদার। শবেবরাতেও আনন্দের ঝর্ণা বইতে থাকে। সেদিন মজা বড় কম হয় না। শবেবরাতের অর্থ ভাগ্য নিধারণের রাত্রি। সারা রাত নামাজ পাঠ হয়। আল্লাহর কাছে সৌভাগ্যের প্রার্থনা। পরের দিন নানা আয়োজন। চালের রুটি, পায়েস। হিন্দু পরিবারের লোকেরা আসেন একে একে। খাওয়া দাওয়া হয়। এই আচার চারশ বছর ধরেই চলে আসছে।

আবার দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়তেই হাল্যানে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। এ গ্রামে দুর্গাপুজো হয় না। দুর্গাপুজো হয় পাশের গ্রামে। সেই রেশ ভেসে আসে এই গ্রামে। আনন্দময়ীর এই সর্বজনীন পুজো ধর্ম মানে না। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর রাতে ঘুরাণউল্লার পরিবারের লোকেরা বেরিয়ে পড়েন ঠাকুর দেখতে। সঙ্গে খাঁড়া পরিবারের লোকেরা। দলবল নিয়ে ঠাকুর দেখার সুখই আলাদা। কিছুটা হেঁটে, বাসে চেপে চলে এই পুজোর ঠাকুর দেখা। বাতাসে বেজে ওঠে ঢাকের বোল। কলকাতার মত অবশ্য আলোর রোশনাই নেই। নেই তেমন চমকও। তবু আনন্দ আনন্দই। তার কোন বিকল্প নেই। বাচ্চারা আইসক্রীম বেলুনের বায়না করে। আবার দুই পরিবার চলে আসে কলকাতাতে। এমন রোশনাই যে সহজে ভোলা যায় না।

ধর্মীয় কারণে হয়তো পুজোর অঞ্জলি দেওয়া চলে না মুসলিমদের। কিন্তু ঈশ্বরকে পেতে তো বাধা নেই। ঈশ্বর সকলের। সর্বজনীন। তাই অষ্টমীর দিন মণ্ডপেও হাজির থাকেন তারা। হিন্দুদের সঙ্গে আত্মিক বন্ধন উপলব্ধি করতে। বিজয়া এলে চোখ সবারই ছলছল করে ওঠে। বিসর্জনের বাজনা হৃদয় দুলিয়ে দেয়। মন খারাপ করে। তখন খাঁড়া পরিবারে বিজয়ার অনুষ্ঠান। কোলাকুলি। ঘুরাণউল্লার উত্তরপ্রজন্মের পরিবারের লোকেরা বিজয়া সারতে আসেন। কোলাকুলি সাঙ্গ হলে মিষ্টিমুখ। মুসলিম ভাইরাও যেন বেদনায় ছলছল করে ওঠেন। এ পুজোকে তারাও হৃদয় দিয়ে মেনে নিয়েছেন।

হাল্যানে সরস্বতী পুজোর চল আছে। জমাটিই হয়। খাঁড়া পরিবারের সরস্বতী পুজোতে সামিল হন ঘুরাণউল্লা পরিবারের লোকজনেরা। চাঁদা তোলা, মণ্ডপ তৈরি। পুজোর তদারকি। ঠাকুর আনতে প্রতিমা শিল্পীদের বাড়িতে খাঁড়া পরিবারের সঙ্গে তারাও হাজির, এবার সরস্বতীকে ভালো করে সাজান কর্তা। মাকে আমরা এবার বড় মুখ করে নিয়ে যাব। বলতে বলতে দাড়ি চুমরে নেন কামালুদ্দিন, মণ্ডপটা দেখে যাবেন আপনারা।

পুজোর দিনগুলোতে সকাল থেকেই সাজ সাজ রব। গৌর, সন্তোষদের সাথে সাথে ছায়ার মত ঘুরে বেড়ান ওরা। আবার লক্ষ্মী পুজোতেও পর্দা ছেড়ে মেয়েরা সমবেত হয় বাড়িতে। কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে হিন্দুদের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত থাকেন মুসলিম পরিবারের মহিলারা। পাতে চাল কলা, আপেল, বাতাবি লেবু, খেজুর আর ভোগ। মা লক্ষ্মীর কৃপা নিতে পিছপা নন মুসলিম মহিলারা। এমন রাত বছরে একটাই আসে।

এ তো গেল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কথা। খাঁড়া পরিবারের সাত পাকের অনুষ্ঠানগুলিতে ঘুরাণউল্লা পরিবারের লোকেরাও হাজির হন। নহবতে সানাই বাজে। গায়ে হলুদের আসরে এয়োতিরা উলু দেয়। এই উলু দেন মুসলিম মেয়েরাও। মেয়েকে বিয়ের আসরে বসিয়ে বরের আগমন প্রতীক্ষায় থাকেন বাড়ির মেয়েরা। তখন কোন ভেদাভেদ নেই। বরকে আনতে খাঁড়া পরিবারের গিন্নিদের সঙ্গে বিবিদের ব্যস্ত দেখা যায়। এমন কি সাতপাকের অনুষ্ঠানে তাদের থাকা চাই। বর এলে তাকে নিয়ে মেতে ওঠেন ওরা। হিন্দু ধর্মের আচার অনুষ্ঠান প্রায় তাদের নখ-দর্পণে। প্রয়োজনে কনের পায়ে আলতাও পরিয়ে দেন তারা।

আবার ঘুরাণউল্লাদের কোন বিয়েতেও এই খাঁড়া পরিবারের লোকেরা দিনরাত খাটছে। হয়তো বা খাঁড়া পরিবারের বয়স্ক কেউ কর্তা হয়ে যান, পেট ভরে খাবেন কর্তা। একেবারে নিজের মনে করে চেয়ে নেবেন। ওরে, এদিকে একটু বিরিয়ানি দিয়ে যা। দ্যাখ তো পরের ব্যাচের লোক কত হয়েছে? আসলে দুই ধর্মের লোকেরা একসঙ্গে থাকতে থাকতে পারস্পরিক আচার অনুষ্ঠান রপ্ত করে নিয়েছে। এমন কি অন্নপ্রাশন হলেও ঘুরাণউল্লা পরিবারের লোকেদের ডাক পড়ে। মেয়েরা হাজির হয়। এই ধরনের মিলিত সহাবস্থান অবশ্য নতুন কিছু নয়। আজ থেকে চারশ বছর আগেও যখন এই এক শিকড় দুই মুখী হয়ে গিয়েছিল তখন থেকেই এই ধরনের ব্যাপার স্যাপার চলে আসছে। আজ একবিংশ শতকের দিকে এগিয়ে যাওয়া বাংলায় এই দুই ধর্মের মিলন চিত্র এতকাল লোকের চোখের আড়ালেই থেকে গিয়েছে। কেউ কি জানে হিন্দুধর্মের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় ঘুরাণউল্লার পরিবারের কণ্ঠস্থ! তেমনই শবেবরাতের কিংবা রমজান মাসের বিধিপালন খাঁড়া পরিবারের লোকেরা ভালোমতই জানেন। এমন হার্দিক যুগলবন্দী এই রূপসী বাংলার বুকে টলটল করছে, সে খবরই বা কতজন জানেন।

রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন এই গ্রামের বিভিন্ন সময় বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা বৈঠক করে গেছেন বিভিন্ন সময়ে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, বিশ্বনাথ মুখার্জি প্রমুখ নেতা। হাওড়া জেলার অন্যতম শিক্ষিত সাংস্কৃতিক মুসলিম প্রধান গ্রাম এই হাল্যান। এই গ্রামের মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত হাল্যান জুনিয়র হাই স্কুল ও হাল্যান আজাদ সংঘ গ্রামের সমস্ত মানুষের আন্তরিকতার ফসল। ওরা সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত। মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, শশ্মান সবকিছুই এই বংশের প্রথম পুরুষ শেখ ঘুরাণউল্লা সাহেবের দান ও আশীর্বাদধন্য। এছাড়াও এই গ্রামের কয়েকটি ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে পাঠান পাড়া, মোগল পাড়া যার বর্তমান নাম ঘোল পাড়া, বামুন গ্রাম, মীর পাড়া কিংবা জয় চণ্ডীর পুকুর এ। (যেখানে থেকে এক সময় জয় চণ্ডীর ঠাকুর পাওয়া গেছিল) পাঠান পাড়া, মোগল পাড়ার সেরকম কোন ইতিহাস জানা যায় না। এইসব স্মৃতি স্মারক থেকে অনুমান করা যায় ঘুরাণউল্লার আগেও হয়তো এখানে মোগলদের আবির্ভাব ঘটে। মসজিদ তৈরির কিছুকাল পরে পাওয়া গেছিল ফারসী ভাষায় লেখা কয়েকটি ইঁট, নবাবী আমলের চেরাগ, শেরশাহের আমলের কয়েকটি কাঁচা টাকা, গাছের পাতায় লেখা পুঁথি ইত্যাদি। বহু কিছু ইতিহাস এই হাল্যান গ্রামের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু আজ তার অনেক কিছুই ম্লান হয়ে যাচ্ছে। বীর রাজপুত রাণা প্রতাপের বংশধর ঘুরাণ সিং ও সোহান দাস আজ এক ইতিহাস। সেই ঘোড়াশালাও নেই, নেই সেই প্রাচীন ঐতিহ্য। আছে নবম প্রজন্মের নাজমুদ্দিন সাহেব থেকে দ্বাদশ প্রজন্মের রোহন। আর আছে সেই প্রথম পুরুষ শেখ ঘুরাণউল্লা সাহেবের সমাধিক্ষেত্র।

ঘুরাণ উল্লাহের সমাধি

আসলে দুই ধর্মের লোকেরা একসঙ্গে থাকতে থাকতে পারস্পরিক আচার অনুষ্ঠান রপ্ত করে নিয়েছে। এমন কি অন্নপ্রাশন হলেও ঘুরাণউল্লা পরিবারের লোকেদের ডাক পড়ে। মেয়েরা হাজির হয়। এই ধরনের মিলিত সহাবস্থান অবশ্য নতুন কিছু নয়। আজ থেকে চারশ বছর আগেও যখন এই এক শিকড় দুই মুখী হয়ে গিয়েছিল তখন থেকেই এই ধরনের ব্যাপার স্যাপার চলে আসছে।

ইতিহাস এখানে থেমে রয়েছে। বেঁচে রয়েছেন রক্ত মাংসের চরিত্ররা। সাধারণ মানুষের মত সুখ দুঃখ রয়ে গেছে তাঁদের। অভাব রয়েছে, রয়েছে নানা অভিমান অভিযোগ। তবু স্মৃতি কখনো পুরনো হয় না। এ সোনার মতই চিরকাল চকচক করে। এ স্মৃতি তাই ভোলা যায় না।

আবদুল কাইউম

ছবি : দেবেশ মুখোপাধ্যায়

মিঃ আর কিং

এক আশ্চর্য বিচার

ইংরেজ অফিসার মিঃ রউস কিং কুমায়ুন কমিশনারীতে ডেপুটি কালেক্টর তথা কলকাতার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। তিনি রানীক্ষেতে কয়েকবছর কাটিয়ে ছিলেন। কলকাতা থেকেও উনি রানীক্ষেতে যেতেন। 'কিংস ডায়েরী' তাঁর সে সময়ের স্মরণীয় বই। বইটিতে তিনি এক আশ্চর্য ঘটনার কথা উল্লেখ করে গেছেন, এক অভূতপূর্ব বিচারের ইতিহাস।

জানুয়ারি ১৯১৭–এর অন্ধকারের রাত। রানীক্ষেত বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। তুষারপাত এবং ঠাণ্ডায় পাহাড়ী শহরের চারদিক সুনশান।

রানীক্ষেত থেকে দু-কিলোমিটার দূরে মাল রোডে 'ভিভিয়ান ভিলা' নামে একটি বাংলো ছিল। সেই বাংলোতে ছিলেন এক দক্ষিণ ভারতীয় অফিসার। শ্রী রামস্বামী।

মাঝরাতে হঠাৎই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। আজব এক অশান্তভাব তাঁকে ছেঁকে ধরল। ভয়ংকর ঠাণ্ডাতে আর তেষ্টায় তাঁর গলা শুকিয়ে যেতে লাগল। তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন আর জানলার দিকে রাখা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। টেবিলের উপর জলের জগ আর গেলাস রাখা ছিল। সবে তিনি দু'তিন ঢোক জল খেয়েছেন কি খাননি অমনি বেডরুমের ভেতর পেটাঘন্টার কর্কশ আওয়াজে তিনি চমকে উঠলেন। অন্ধকারের মধ্যে তিনি ঘন্টার আওয়াজ শুনে ভয়ে কেঁপে উঠলেন। হাত থেকে গেলাস পড়ে গেল, আর ঝনঝন আওয়াজ করে ভেঙে গেল।

সে সময়ে জানলার স্বচ্ছ কাঁচের উপর উনি একটি ছায়ামূর্তি দেখতে পেলেন। ওই ছায়ামূর্তিটি খোলা চুল এক যুবতীর। বাইরের দরজায় ব্যথাতুর কান্নার আওয়াজ শুনে তার চোখেমুখে অভূতপূর্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি হল। ৫৩ বছরের রামস্বামী দরজা পর্যন্ত এগোবার সাহস পর্যন্ত রাখতে পারলেন না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বিছানায় বসে পড়লেন। কিন্তু ঘুম এলো না চোখে, কারণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয়নি। মাঝে মাঝে যন্ত্রণাকাতর চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, তাঁর আত্মা সচকিত হয়ে উঠছিল। রাতভর তিনি বুক ধড়পড়ানি আর ভয়ে কাবু হয়ে জেগে রইলেন।

কোনক্রমে রামস্বামীর সেই বিভীষিকাময় কালরাত্রি কাটল। পরের দিন ভোরেই উনি 'ভিভিয়ান ভিলা' ছেড়ে দিলেন। ওই বাংলো বাড়ির দু'ফার্লং দূরে বেগর নামে এক ইংরেজের বাড়িতে থাকতে চলে গেলেন। ভীত-সন্ত্রস্ত রামস্বামী ভিভিয়ান ভিলার রহস্যময় ঘটনা বিষয়ে মিস্টার বেগর আর তাঁর পরিবারের সকলকে বললেন। তার কথা শুনে তাঁরা কেউই আশ্চর্যান্বিত হলেন না। কারণ ভিভিয়ান ভিলা সম্পর্কে তাঁরা আগে থেকেই জানতেন। আসলে ওই বাংলো ছিল একটি অভিশপ্ত বাংলো বাড়ি আর সেখানে বাস করত এক যুবতীর অতৃপ্ত আত্মা। ও রাতে অশান্ত হয়ে উঠত আর সেখানে বসবাসকারী যে কোন লোককেই নিরুপদ্রবে থাকতে দিত না। আর এজন্য এক রাত্রির বেশি সেই বাংলোতে কেউ থাকতে পারত না।

এ থেকেই ক্রমে ভিভিয়ান ভিলা অভিশপ্ত বাড়ি বলে খবর ছড়িয়ে পড়ল। ছড়াতে ছড়াতে ওই খবর দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছল। এ ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য কার্যরত দক্ষ এবং সম্মানিত পুলিশ ইন্সপেক্টর হায়দর আগা কে রানীক্ষেত পাঠানো হল। সাহসী ইন্সপেক্টর হায়দর অন্ধবিশ্বাস এবং ছড়ানো খবরকে পরোয়া করতেন না। উনি রানীক্ষেতে এলেন এবং রামস্বামী, মিস্টার বেগর ও অন্যান্য স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি ভিভিয়ান ভিলাতেই রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। দিনের বেলায় ভিভিয়ান ভিলার বিষয়ে সকলের কাছ থেকে জানলেন আর ঘুরে ফিরে সবকিছু দেখলেন।

ক্রমে রাত গভীর হয়ে এল, ইন্সপেকটর হায়দর নিজেকে পুরোপুরি তৈরি করে নিয়ে ভিভিয়ান ভিলায় রাত কাটাতে চলে গেলেন। গভীর অন্ধকারে ডুবে থাকা বাংলোতে সেই রাতে ইন্সপেক্টর আগার একরকমের বিশেষ অনুভূতি হচ্ছিল।

বেডরুমে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন। ল্যাম্পের আলোও ছিল মৃদু। পেটা ঘন্টার দড়ি কি মনে করে তিনি আগেই ছিঁড়ে দিয়েছিলেন। বেডরুমের দরজা এভাবে বন্ধ করেছিলেন যাতে মনে হয় যে এটি ভেতর থেকে বন্ধ করা আছে।

মধ্যরাতে যেমন গির্জা-ঘরের ঘন্টার আওয়াজ অন্ধকার চিরতে চিরতে এগিয়ে আসে তেমনি বেডরুমে পেটা ঘড়ি চিৎকার করে ওঠে। ইন্সপেক্টর হায়দর চমকে উঠলেন। রিভলবার ধরা হাত শক্ত হয়ে উঠল। পেটা ঘন্টার দড়ি তিনি আগেই কেটে দিয়েছিলেন। ঘন্টাই বা তাহলে বাজল কি করে! লাফিয়ে গিয়ে তিনি বেডরুমের দরজা খুলে দিলেন।

দরজা খুলেই ইন্সপেকটর আতঙ্কে হতভম্ব হয়ে গেলেন। ঠিক তিন ফুট দূরে আপাদমস্তক সাদা কাপড় ঢাকা একটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়েছিল। ইন্সপেক্টর আগা চকিতে হাতের রিভলবার তুলে শাসাতে যেতেই সেই ছায়ামূর্তি চলতে লাগল।

আচমকা সেই রহস্যময়ী ছায়ামূর্তি যন্ত্রণাকাতর গলায় বলে ওঠে–'হায়দর সাহেব, আপনি ঠিকমত বুঝতে চেষ্টা করুন। আপনি এক জাঁহাবাজ পুলিশ অফিসার। আমি একজন সাধ্বী নারী। আমার একটি ব্যথাভরা কাহিনী আছে। কিন্তু কোন বিচার হয়নি। আপনি যদি আমার কাহিনী শোনেন তাহলে অবশ্যই কিছু করতে পারবেন।'

ইন্সপেক্টর হায়দর কি যেন ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে?

হায়দর সাহেব। আপনি ধৈর্য্য ধরুন। আমি আপনার মত মহান মানুষের অপেক্ষা করছিলাম। আপনি আমার পুরো ঘটনা শুনুন। তারপর আপনিই এর বিধান করুন। আমাকে যথার্থ বিচার পাবার ব্যবস্থা করে দিন।

ইন্সপেক্টর হায়দর ওই রহস্যময়ীর রহস্যময় ঘটনা শুনতে আগ্রহী হলেন। বললেন, 'তুমি যেইই হও, তোমার পুরো ঘটনা শুনলেই আমি কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় কিনা ভেবে দেখব। তুমি কি বলতে চাও?

–ইন্সপেক্টর সাহেব। আমি একজন সুন্দরী

পাহাড়ী মেয়ে ছিলাম। নাম ছিল ডাবেরী। আমার মা জ্যোলিকোট (নৈনিতালের)-এর একজন দেহপসারিণী ছিলেন। নাচ গান করে তিনি অনেক পয়সা আয় করতেন। আমার বয়েস যখন ১৩ বছর হল তখন আমার সুন্দর শরীরটি ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে দেখে নিজের পেশায় আমাকে নিয়ে আসতে চাইলেন তিনি।

কিন্তু শৈশব থেকেই আমি প্রচণ্ড জেদি। আমি আমার মায়ের কথার তুমুল বিরোধিতা করি। সেসময়ে একজন ইংরেজ সৈনিক আমাদের গাঁয়ে বেড়াতে আসেন। ওর নীল চোখে কি জানি কোন যাদু ছিল মাত্র দু'তিন বার দেখা সাক্ষাতের পরই আমি তার প্রেমে পড়ে গেলাম। তার নাম আইজাক। ক্রমে সে আমার শরীর মন এমন বাঁধনে বেঁধে ফেলল যে তাকে ছাড়া এক মুহূর্ত আমি থাকতে পারতাম না।

একদিন রাতে আমরা ওখান থেকে পালিয়ে গেলাম। পালাবার সময় মায়ের নামে একটি চিঠি লিখে এলাম এই বলে যে আমি পতিতা বৃত্তির মত নোংরা পেশাতে থাকতে পারব না বলে জেনেশুনেই সেখান থেকে চলে যাচ্ছি। আমাকে খোঁজ করার বৃথা চেষ্টা যেন না করা হয়।

রানীক্ষেতের গীর্জায় আমাদের দু'জনের বিয়েও হয়ে গেল। পালাবার সময় আমি আমার মায়ের সিন্দুকের গয়না আর নগদ টাকা চুরি করে নিয়েছিলাম। আইজাক আমার প্রেমের মধুর-স্মৃতিতে এই সুন্দর বাংলোবাড়ি বানায়। আইজাক আমার নাম রেখেছিল 'ভিভিয়ান' আর বাংলোর নাম দিয়েছিল 'ভিভিয়ান ভিলা'।

আমার এই বিয়ের পর সাত মাসও হয়নি, হঠাৎই আইজাকের নামে বিলেত থেকে টেলিগ্রাম আসে যে ওর বৃদ্ধ পিতা মরণ শয্যায়। আইজাক শীগ্গিরই ফিরে আসবে বলে আমাকে একলা রেখে বিলেত চলে গেল।

প্রায় দু'মাস পরে আইজাক একদিন সন্ধ্যেয় এখানে ফিরে আসাতে আমার মন আনন্দে নেচে উঠল। কিন্তু কথাবার্তায় ব্যবহারে আইজাককে আমার কেমন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছিল। নিজের মায়ের জমা করা সম্পদ চুরি করে যার প্রেমে পাগল হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম, সে শেষপর্যন্ত ধোঁকাবাজ প্রমাণিত হল। সেই রাতেই আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে মিশতে সে নিজের মাফলার গলায় জড়িয়ে আমাকে মেরে ফেলল। আমার গয়নাগাঁটি আর পয়সার লোভে আমাকে সরিয়ে দিল পৃথিবী থেকে।

আমাকে মেরে ফেলে ওই প্রতারক ওই ঘরেই আমাকে ফেলে গেল। যদি আপনি এই ঘরটি খুঁড়ে দেখেন, আমার মৃতদেহের অবশেষ এখানে পাবেন। যে মাফলারে গলায় জড়িয়ে আমার শ্বাসরোধ করেছিল সেই মাফলার আমার লাশের সঙ্গে পাবেন। সেইসঙ্গে ওর জামার বোতামও পাবেন যা আমি আমার মুঠিতে ধরে রেখেছিলাম। আমাকে মেরে ফেলে আইজাক আমার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার

ডাবেরী

কথা প্রচার করে ভিভিয়ান ভিলা বেচে দিয়ে রামনগর চলে গেল।

ইন্সপেক্টর সাহেব, আমি চাই, আমার হত্যার ঘটনা আদালতে উঠুক। যে প্রমাণাদির কথা বললাম তা আদালতে পেশ করে আইজাকের সাজার ব্যবস্থা করুন। এই হল আমার জবানবন্দী। এই ন্যায় বিচারের জন্য সেদিন থেকেই আমি এখানে পড়ে আছি।

এই ঘটনার পর পুলিশ পদাধিকারীরা আইজাকের বিরুদ্ধে হত্যার মামলা দায়ের করলেন এবং ওকে আইনানুগ পদ্ধতিতে রানীক্ষেত আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দেওয়া হল।

আইজাক ইন্সপেক্টর হায়দরের আনা সমূহ অভিযোগ অস্বীকার করলেন আর এই সব মিথ্যে অভিযোগ আনার জন্য পুলিশের উপর মানহানির মামলা আনার শাসানি দিলেন। প্রেতাত্মা কখনো জবানবন্দী দেয়?

আইন এক্ষেত্রে আইজাকেরই পক্ষে। ইন্সপেক্টর হায়দর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। একদিনের সময় চেয়ে নিয়ে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ভিভিয়ান ভিলায় পৌঁছলেন। সেই অভিশপ্ত ঘরের ভেতর মাঝরাতে সেই রহস্যময়ী যুবতীর কান্নার আওয়াজ শোনা গেল। পাশে বসা আশ্চর্যান্বিত ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হায়দর কাগজ কলম রেখে তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, ডাবেরী, তোমার জবানবন্দী নিয়ে আমি মহা সমস্যায় পড়েছি। আদালতে প্রমাণের সাপেক্ষে ন্যায় বিচার হয়। তুমি কাল যে বয়ান আমাকে লিখিয়েছিলে তাকে তোমার হাতের লেখায় সই ছাড়া মিথ্যে বলা হচ্ছে।

হঠাৎই কান্নার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। এবারে সুন্দরীটি ধীরে ধীরে টেবিলের দিকে এগিয়ে এসে কলম তুলে নিল।

ডাবেরীর সই করা জবানবন্দী আবার আদালতে পেশ করা হল। ডাবেরী হত্যাকাণ্ডের উপর শুনানি শুরু হল। কিন্তু কিছুদিনের পরে আবার কিছু প্রমাণের দরকার পড়ল। কর্তব্যনিষ্ঠ ইন্সপেক্টর হায়দর পুনরায় ভিভিয়ান ভিলায় পৌঁছলেন। তিনি ডাবেরীর কাছে গীর্জা ঘরে বিয়ের প্রমাণপত্র, আইজাকের বাবার টেলিগ্রাম এবং সব রকম প্রমাণপত্র চাইলেন। বাংলো বাড়িতে যেখানে এইসব প্রমাণপত্র লুকোনো ছিল ডাবেরী হায়দরকে সেই সব জায়গার হদিশ দিল। হায়দর সেইসব প্রমাণপত্র আদালতে পেশ করলেন।

ডাবেরী নানা রহস্য উন্মোচন করল। আইজাকের পিতার টেলিগ্রামও মিথ্যে ছিল কারণ তার চার বছর আগেই আইজাকের বাবা মারা গেছিলেন। ডাবেরীর গয়নাগাঁটি ও ক্যাশ টাকা হাতাবার উদ্দেশ্যে বাবার নামে আইজাক মিথ্যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল।

জ্যোলিকোটের মিডিল স্কুলের দপ্তরে ডাবেরীর স্বাক্ষরও পাওয়া গেল। জবানবন্দীর স্বাক্ষর ও স্কুলের স্বাক্ষর একেবারে মিলে গেল। এইসব প্রমাণ সাপেক্ষে আইজাক সমস্যায় পড়ল। আইজাক আগের মত নিজের যুক্তিতে অটল থাকতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত তা পারল না। নিজের অপরাধ সে স্বীকার করে নিল। ডাবেরীর হত্যাকাণ্ডের অপরাধে আইজাককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল আদালত থেকে।

মামলা চুকে যাবার পর ইন্সপেক্টর হায়দর ভিভিয়ান ভিলার সেই অভিশপ্ত ঘরে আবার পৌঁছলেন। আগের মতই মাঝরাত হতেই আজ আর কোনো ব্যথাতুর কান্না শোনা গেল না। ঘরে ঘন অন্ধকার ছেয়ে ছিল। ইন্সপেক্টর হায়দর ডাকলেন, ডাবেরী! ডাবেরী!

এবারে ডাবেরীর আত্মা প্রকটিত হল, বলল, ইন্সপেক্টর আমার হত্যাকারীকে সাজা দিয়ে আপনি আমার অশেষ উপকার করেছেন। আজকের রাতের পর ভিভিয়ান ভিলার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না।

এই ন্যায় বিচারের জন্য যা কিছু আমি খুশি মনে আপনাকে এবং আপনার স্ত্রীকে দিতে চাই অনুগ্রহ করে তা আপনি গ্রহণ করুন। আমি তাহলে খুবই খুশী হব।...

শেষ রাতে ইন্সপেক্টর হায়দর ভিভিয়ান ভিলায় নিশ্চিন্তে রাত কাটালেন। সকাল হতেই তিনি উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারদের সঙ্গে বেডরুমের পিছনের বাগানে খুঁড়তে গিয়ে লোহার একটি বাক্স পেলেন। বাক্সে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং প্রায় আশি হাজার টাকার গয়না ছিল।

সম্মানিত ইন্সপেক্টর হায়দর এগুলি আলমোড়ায় সরকারী কোষাগারে জমা করলেন। তাঁর সম্মানে ইংরেজ সরকার এই সম্পত্তির অর্ধেকভাগ তাঁকে পুরস্কার দিলেন।

আজ রানীক্ষেতে ভিভিয়ান ভিলার অবশেষও নেই। কিন্তু 'কিংস ডায়েরী'তে উল্লিখিত এই আশ্চর্য আর রহস্যময় স্মৃতি কথা যেমনি ছিল তেমনি আছে।

সুধীর শাহ্

আজ রাতে নিভিও নাকো বাতি

আঁধারেতে আবেশের
রঙ যাবে হারিয়ে

রঙীন
কনডম্ ।

কোহিনুর ফিয়েস্তা

লাল, সবুজ, নীল, বেগুণী বা কালোর বর্ণালী বাহারে পাওয়া যাচ্ছে।

TTK উৎপাদন
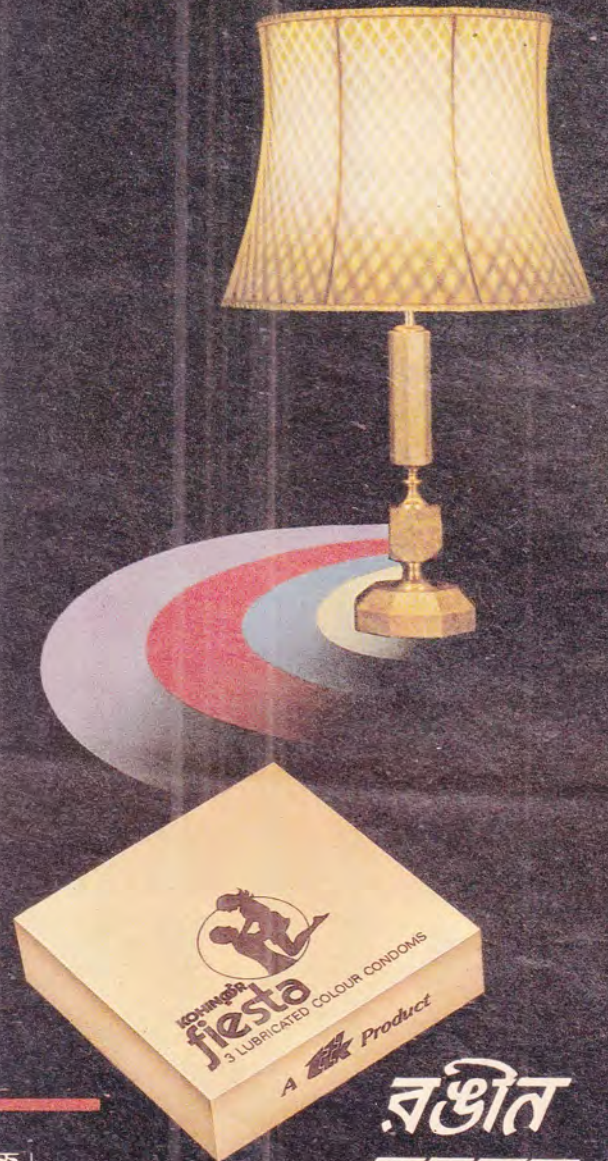
শান্তি দেবীর পূর্বজন্ম :একটি 'ঐতিহাসিক' ইতিবৃত্ত

হে অর্জুন, আমার এবং তোমার অনেক জন্ম হয়ে গেছে, আমার সেসবের স্মৃতি অটুট, কিন্তু তোমার বিস্মৃতি ঘটেছে।
শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতা : ৪।৫

এখানে আমি আগেও কখনো এসেছিলাম, কিন্তু কতদিন আগে কিংবা কিভাবে, তা তো বলতে পারি না, দরজার ওপারে ঘাসের গন্ধও যে কত টাটকা, কত মধুর আমি জানি···
দ্যান্তে গ্যাব্রিয়েল রোজেটি।

ও জীবন। তুমি আমার বহু অবসানের অবশেষ,···এই জন্মের পূর্বে সহস্রবার মৃত্যু হয়েছে আমার।
ওয়াল্ট হুইটম্যান (সঙ অফ মাইসেলফ)

পিতার কোলে শান্তি (১৯৩৫ সালের ছবি)

শান্তি দেবী, প্রৌঢ়ত্বে নিজের বাড়িতে

এই নিবন্ধটির লেখক ডঃ কীর্তিস্বরূপ রাওয়ত জন্মান্তরবাদ নিয়ে বহুবছর ধরে মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও গবেষণায় রত। এবং এই বিষয়ে তিনিই প্রথম পি এইচ ডি প্রাপ্ত ব্যক্তি। রাজস্থানের 'পরামনোবিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান'-এর তিনি নির্দেশক। বর্তমানে রাজস্থানের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজশাস্ত্র বিষয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রধান পদে কর্মরত। বর্তমান নিবন্ধে তিনি একটি পুরনো পুনর্জন্ম-কাহিনীর বিষয়ে খোঁজখবর করেছেন নতুনভাবে, বিশেষভাবে 'আলোকপাত'-এর জন্য।

জন্মান্তরবাদ এখনো এক অপার রহস্য। গোঁড়া বস্তুবাদীরা পুনর্জন্মের ধারণা নস্যাৎ করে দিলেও পরা-মনোবিজ্ঞানী-দের কাছে এ এক অনুসন্ধানের বিষয়। পুনর্জন্ম বিষয়ে সারা পৃথিবীতে যে সব অনুসন্ধান-কার্য এবং গবেষণা বহুদিন ধরে চালিয়ে আসা হচ্ছে, সেসব রিপোর্টের ভিত্তিতে অন্তত এটুকু বলা যায় যে বিষয়টি উড়িয়ে দেবার মতো নয়। পাঠকদের কাছে পুনর্জন্মের বহু আশ্চর্য উপাখ্যান পত্রপত্রিকা মাধ্যমে আজ পরিচিত ঘটনা—সেসব যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

সংশয়বাদীরা অনেক সময় নিছক বিরোধী-তার জন্যই এসব ঘটনাকে অবাস্তব, অযৌক্তিক বলে গুরুত্ব দিতে চান না। আজ আমি ৬১ বছর আগেকার একটি ঘটনার কথা পাঠকদের বলবো, যা সেসময় দেশেবিদেশে প্রভূত আলোড়ন তুলেছিল। সেসময় তো এত প্রচার মাধ্যম ছিল না, তাই ঘটনাটা বহু মানুষের মনে কৌতূহলের উদ্রেক করেছিল। এতদিন পর কেন সেই প্রসঙ্গ, তার একটা কারণ আছে।

১৯৮৫ সালের ১ ডিসেম্বর সংখ্যায় আমাদের দেশের একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পুনর্জন্ম নিয়ে বিশেষ সংখ্যা বের করে, তাতে ৬১ বছর আগেকার ওই কেসটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলা হয়, সেদিনের সেই পুনর্জন্ম কাহিনীর নায়িকা শান্তি-দেবী আজ কোথায়? তিনি কি সত্যি সত্যি ছিলেন কখনো?

জন্মান্তরের ঘটনাবলী নিয়ে বর্তমানে যাঁরা খোঁজখবর ও গবেষণা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ইয়ান স্টিভেনসন অন্যতম। ইনি ১৯৮৬'র ফেব্রুয়ারিতে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সেসময় আমি দিল্লীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। উপরোক্ত ইংরেজী সাপ্তাহিক–এর মন্তব্য সম্পর্কে তাঁকে বললাম। তিনি ঐ পুরনো ঘটনার নায়িকা শান্তিদেবীর ঠিকানা সংগ্রহ করে আমাকে দিয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি আমি শান্তিদেবীর সঙ্গে দেখা করি। তারপর ঐ ব্যাপারটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দিল্লী, মথুরা এবং জয়পুরের নানা স্থানে গিয়ে অনুসন্ধান করেছিলাম। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের

সঙ্গে কথাবার্তার রেকর্ডিং, স্থানগুলির ভি ডি ও রেকর্ডিং করে রেখেছি। শান্তিদেবী এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর পূর্বজন্মের বহু স্মৃতি চমৎকার বলে যেতে পারতেন। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৭। ২৭ ডিসেম্বর তার মৃত্যু হয়।

ডঃ ইয়ান স্টিভেনসন–এর সঙ্গে আলোচনা, শান্তিদেবীকে নিয়ে লেখা বইপত্র ও নিবন্ধ, আমার নিজের অনুসন্ধান–এসবের উপর ভিত্তি করে ঘটনাটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করছি।

১৮ জানুয়ারি ১৯০২ তারিখে মথুরা'র নগলা পাইসা এলাকায় চতুর্ভুজ চতুর্বেদী মহাশয়ের একটি কন্যা জন্মায়, তার নামরাখা হয় লুগদী। দশ বছর বয়সে লুগদীর বিবাহ হয় ঐ এলাকারই কেদারনাথ–এর সঙ্গে। কেদারনাথের এটি ছিল দ্বিতীয় বিবাহ, তার প্রথম স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। চৌবে কেদারনাথ–এর মথুরাতেই কাপড়ের দোকান ছিল, হরিদ্বারেও ছিল আরেকটা দোকান। বিয়ের কিছুদিন পর লুগদীদেবী স্বামীর সঙ্গে হরিদ্বারে যান। সেখানে তাঁর পায়ে খুব চোট লাগে। পরবর্তীকালে লুগদীদেবী গর্ভবতী হন, অপারেশনের পর তার পেটে মৃত একটি কন্যাসন্তান পাওয়া যায়। এরপর সন্ধিবাতের দরুন লুগদীদেবী বাড়ির উপর নিচ করতে পারতেন না। দ্বিতীয়বার গর্ভধারণের পর ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ তারিখে অপারেশনের পর তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মে। ৪ অকটোবর লুগদীদেবী মাত্র ২৩ বছর বয়সে মারা যান।

পরের বছর ১৯২৬ সালের ১১ ডিসেম্বর দিল্লীর কাছে চিরাখানে এলাকায় রঙ্গবাহাদুর মাথুর মহাশয়ের একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিন-চার বছর বয়সের পর শান্তি নামের ঐ বাচ্চা মেয়েটি ধীরে ধীরে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলতে থাকে। তার বাড়ি নাকি মথুরায়, তার স্বামী সেখানে থাকেন। কে তার স্বামী জিগ্যেস করলে নাম বলে না, কিন্তু বলে যে (১) তার রঙ ফর্সা (২) কানের বাঁদিকে একটা বড় তিল আছে (৩) পড়বার সময় তিনি মাঝে মাঝে চশমা ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া, দ্বারকাধীশ মন্দিরের সামনে তার দোকান আছে।

বারবার এসব কথা বলতে থাকায় শান্তি'র বাবা মা চিন্তিত হয়ে ডাক্তার দেখালেন। ডাক্তারকে শান্তি ঐসব কথা বলতে থাকে। প্রসবের সময় তার মৃত্যু হয়েছিল। এমন কথাও বলে, তখন তার বয়স ২৩ বছর। সকলেই বুঝতে পারছিলেন, শান্তি তার পূর্বজন্মের কথা বলছে। এরকম সময়ে শান্তিদের এক আত্মীয় মথুরায় শান্তির বলা নাম ঠিকানায় একটা চিঠি দিয়ে জানতে চাইলেন, এসব বিবরণ ঠিক কিনা। শান্তি তার স্বামীর নামও জানিয়েছিল কেদারনাথ চৌবে। কেদারনাথ চিঠির উত্তরে জানালেন, মেয়েটির কথাবার্তা সব ঠিক মিলে যাচ্ছে। আপনারা দয়া করে দিল্লীর অমুক ঠিকানায় আমাদের আত্মীয় শ্রীযুক্ত কাঞ্জিমল চৌবে–র সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

কাঞ্জীমলজী শান্তি'র সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি মথুরায় গিয়ে কেদারনাথকে নিয়ে এলেন শান্তির সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্য। দিনটা ছিল ১২ নভেম্বর ১৯৩৫ সাল। কেদারনাথ–এর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর তৃতীয়া স্ত্রী এবংদ্বিতীয়া স্ত্রী লুগদী'র গর্ভজাত পুত্র নবনীতলাল।

শান্তি কেদারনাথকে দেখে নিজের স্বামী বলে চিনতে পারে। শান্তি তার স্বামী সম্পর্কে যেসব কথা বলত, যেমন কানের বাঁদিকে বড় তিল প্রভৃতি–দেখা গেল সবকিছু ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে। অতিথিদের জন্য জলখাবার তৈরির সময় শান্তি তার স্বামীর খাওয়াদাওয়ার পছন্দের কথা বলে মাকে সেসব রান্না করতে বলে। কেদারনাথের তবু সন্দেহ ঘোচে না। তিনি শান্তিকে বলেন, তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। শান্তি বলে ওঠে, আচ্ছা উঠোনের এককোণে যে কুয়োটা আছে, সেখানে চান করতাম না? নবনীতলাল–কে দেখিয়ে শান্তি বলে, ও তো আমার ছেলে। সে তার সব খেলনা নবনীতকে দিয়ে দেয়। রাত্রিবেলা কেদারনাথ শান্তি–কে একান্তে ডেকে কিছু কথা জিগ্যেস করেন। তারপর তিনি সকলের সামনে ঘোষণা করেন, এই বাচ্চা মেয়েটি সবকিছু ঠিক বলেছে, পূর্বজন্মে এই ছিল আমার স্ত্রী লুগদী।

আন্তর্জাতিক পরামনোবিজ্ঞানী, সুইডেনের অনওয়েল স্টুর লোনস্ট্রেন্ড : যিনি প্রথম ঘটনাটিতে উৎসাহিত হন।

শান্তি দেবী : তরুণী অবস্থায়

চারদিকে শান্তি সম্পর্কে নানারকম খবর প্রচলিত হতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত এই ব্যাপারটি শুনে শান্তিকে দেখতে চেয়েছিলেন। তিনিও শান্তিকে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। শান্তির বিষয়টি গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্য ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি হয়েছিল।

এরপর ধীরে ধীরে চারদিকে শান্তি সম্পর্কে নানারকম খবর প্রচলিত হতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত এই ব্যাপারটি শুনে শান্তিকে দেখতে চেয়েছিলেন। তিনিও শান্তিকে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। শান্তির বিষয়টি গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্য ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি হয়েছিল। সেই কমিটিতে তৎকালীন সাংসদ দেশবন্ধু গুপ্তা, জাতীয় নেতা পণ্ডিত নেকীরাম শর্মা, সুপ্রসিদ্ধ উকিল তারাচাঁদ মাথুর প্রমুখ ব্যক্তি ছিলেন। ২৪ নভেম্বর ১৯৩৫ কমিটি শান্তির কথাবার্তা পরীক্ষা করবার জন্য নানারকম উপায় অবলম্বন করেছিলেন। শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেকটি লোককে সে চিনতে পারে, কোথায় কি ছিল সবই প্রায় ঠিক ঠিক বলে দিতে থাকে। বাপের বাড়িতে গিয়েও শান্তি সবাইকে চিনে
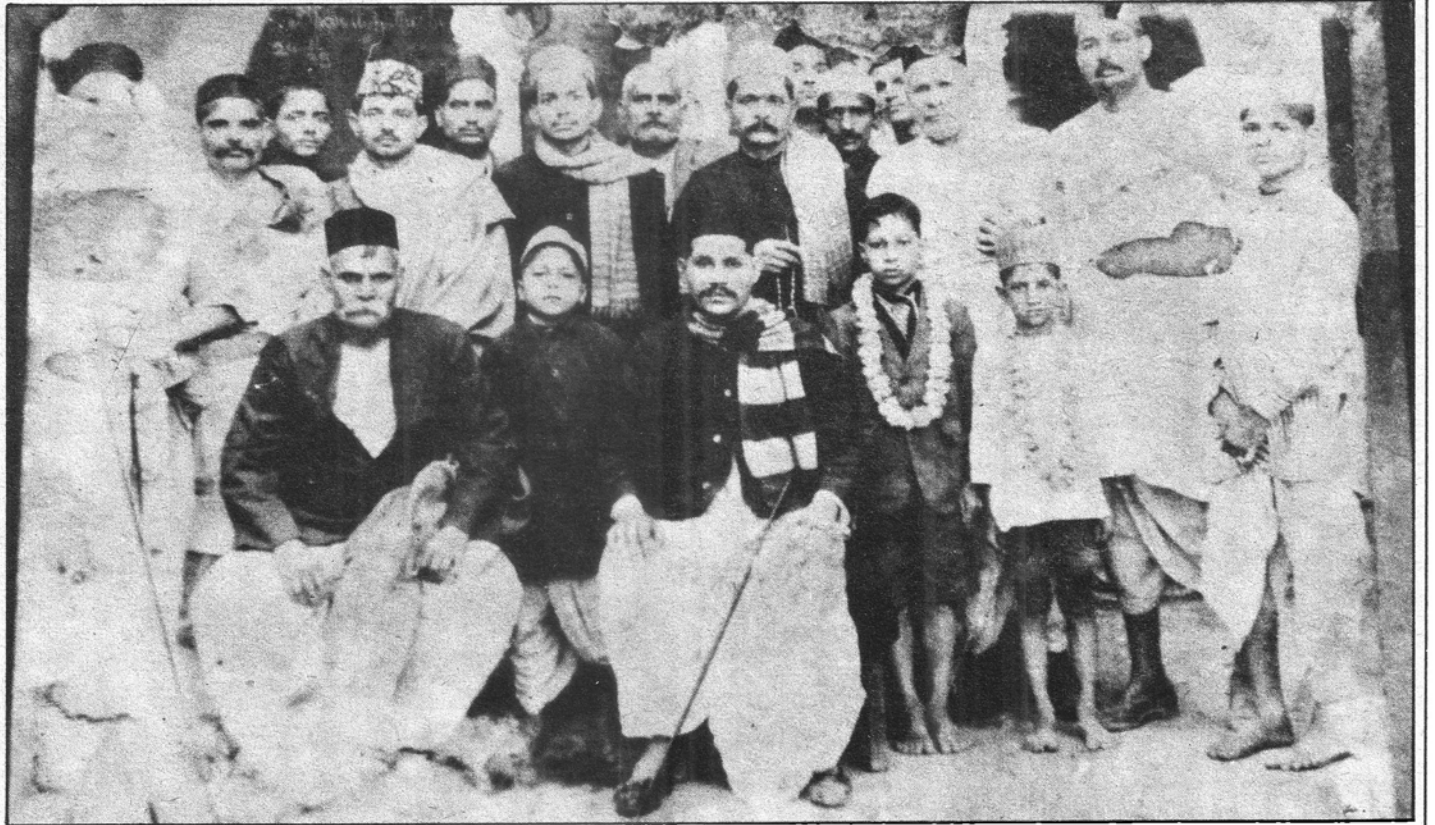
পূর্বজন্মের লুগদী দেবীর পরিবারের সদস্যরা

ফেলে। বাবার গলা জড়িয়ে ধরে সে কাঁদতে থাকে, তাকে তার পূর্বজন্মের বাবার কাছ থেকে বহুকষ্টে ছাড়িয়ে আনা হয়। এখানেই কমিটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে লিখেছেন, 'এখন দেখা যাচ্ছে, পূর্বজন্মের কথা বিস্মৃত হওয়াটা একটা আশীর্বাদ।'

যাইহোক, কমিটির লোকজন ঐদিনই রাত্রে দিল্লী ফিরে আসেন শান্তিকে নিয়ে। এরপর কমিটি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গবেষক, পরা-মনোবিজ্ঞানী এবং আরো বহু বিদ্বজ্জন–এর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এঁদের মধ্যে ডঃ ইন্দ্রসেন, কে·এম· টেলগিরি, স্বামী পরমহংস প্রজ্ঞানেশ্বর যতি, এস নিহাল সিংহ, ডঃ ইয়ান স্টিভেনসন, এস বি বোস, পারসনাথ সহায়, বালবন্দ নাহাটা প্রমুখের নাম উল্লেখ্য।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক এস নিহাল সিংহ নিজে সস্ত্রীক শান্তিকে নিয়ে মথুরায় যান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন শান্তির বাবা, পণ্ডিত নেকীরাম এবং ডঃ ইন্দ্রসেন। সেবারেও তাঁরা শান্তি–র বলা বিবরণগুলি বহুক্ষেত্রেই সঠিক বলে লক্ষ্য করেন। তবে, এবার কিছু কিছু অসঙ্গতিও ধরা পড়ে।

এস নিহাল সিংহ শান্তিকে নিয়ে মথুরায় যান

শান্তির পূর্বজন্মের স্বামী শান্তির কথায় শেষপর্যন্ত বিশ্বাস করেছিলেন

শান্তি তার পূর্বজন্মের শ্বশুরালয় ও বাপের বাড়ির লোকজনেদের ঠিক ঠিক চিনে ফেলেছিলেন। স্বামীর চেহারার বর্ণনা, তার কাপড়ের দোকানের কথা এমনকি নামও বলে দিয়েছিলেন। প্রথম যখন কেদারনাথের সঙ্গে তার দেখা হয়, সে লোকটিকে কোনদিন দেখেনি অথচ স্বামী বলে চিনতে পারে। তাকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রথম দর্শনে কেদারনাথকে তার বড়ভাই বলে শান্তিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু শান্তি দৃঢ়ভাবে বলে, না ইনিই আমার স্বামী।

খাবার তৈরির সময় কেদারনাথের পছন্দমত খাবারদাবারের কথাও শান্তি তার মা'কে বলেছিল। কেদারনাথের সঙ্গে তাঁর তৃতীয়া স্ত্রীকে দেখে সে একবার একান্তে বলেছিল–তুমি আমাকে বলেছিলে আর বিয়ে করবে না, তাহলে কেন আবার বিয়ে করলে? লুগদী যখন মারা যান, তখন তার পুত্রের বয়স মাত্র ন'দিন, অথচ নবনীতলালকে দেখে তার মধ্যে যে মাতৃভাবের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, তা উপস্থিত প্রত্যেকের কাছে বিস্ময়ের ঠেকে। শান্তির বয়সও তো তখন মাত্র নয় কি দশ। সে তার খেলনাপাতি নিজে থেকেই নবনীতকে দিয়ে দেয়। সে কিছু পয়সা নিজের শোবার ঘরের কোণে লুকিয়ে রেখেছিল, এ তথ্যও জানায়।

এতসবের পর কেদারনাথ–এর মোটামুটি ধারণা হয় যে মেয়েটি হয়তো পূর্বজন্মে তার স্ত্রী–ই ছিল। কিন্তু তার সন্দেহ ঘোচে না। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর যে ঘরে তৃতীয়া স্ত্রী ও দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র নবনীতকে নিয়ে কেদারনাথ শুলেন, সেই ঘরে শান্তি–কে তিনি ডেকে পাঠালেন। বললেন, আচ্ছা, এমন কিছু বল তো, যা আমি আর তুমি ছাড়া কেউ জানতো না। তখন শান্তি কেদারনাথের স্ত্রী'কে দেখিয়ে বলে, ওকে ওঘরে পাঠান তাহলে বলবো। কেদারনাথ বলেন, গতজন্মে তুমি আমার কাছে যতখানি ছিলে, এও তো তাই। ওর সামনেই বলো। তখন শান্তি বলে, আচ্ছা আমি যখন অসুস্থ ছিলাম আমার জন্য একটা নার্স রেখেছিলে, মনে আছে?

কেদারনাথ সামান্য চমকে উঠে প্রসঙ্গ পাল্টালেন, বললেন, আর এমন কিছু বলতে পারো, যা তুমি ছাড়া কেউ জানতো না। এরপর শান্তি কেদারনাথের কাছে উভয়ের রতি-ক্রিয়ার বর্ণনা এমনভাবে করে যা কেদারনাথের কাছে অসম্ভব সত্যি বলে মনে হয়। একটা নয় বছরের বাচ্চা মেয়ে দুই বয়স্ক স্বামী-স্ত্রী'র যৌন মিলনের সময়কার আচার আচরণের কথা এমনভাবে বলেছিল যে তারপর কেদারনাথ শান্তি–কে পূর্বজন্মের লুগদী বলে মেনে নিতে প্রায় বাধ্যই হলেন।

ঘটনাটিকে পরীক্ষা করার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের যে সমিতি গঠিত হয়েছিল তার সদস্যদের সঙ্গে শান্তি

১৯৩৬ সালের ২ এপ্রিল। ১৩ এপ্রিল রাত্রে শান্তির একটি 'হিপনোটিক টেস্ট' নেওয়া হয়। সেই সম্মোহন-বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন—সম্মোহনকারী শ্রী জগদীশ মিত্র, প্রোঃ বেগ, ডঃ ইন্দ্রসেন, উকিল মহেন্দ্রসিংহ বেদী, শান্তির বাবা এবং শ্রীযুক্ত মিত্রের দুই বন্ধু।

এই সম্মোহনে শান্তি লুগদীদেবীর মৃত্যু ও তৎপরবর্তী মুহূর্তগুলির এক স্বপ্নময় বর্ণনা দেয়। ডঃ স্টিভেনসন এবং আমি দু'জনেই ১৯৮৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি শান্তি দেবীর সঙ্গে দেখা করি। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সেই সম্মোহনের সময়কার অনুভূতির কথা মনে রেখেছেন। পরে আমি দেখেছি, মৃত্যু পরবর্তী মুহূর্তগুলির বর্ণনা পৃথিবীর সব সম্মোহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রায় একরকম। শান্তিদেবীর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ডঃ স্টিভেনসন এই কেসটি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন, ...'আমার অনুসন্ধানের ফলে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি যে শান্তিদেবীর বলা বর্ণনাগুলির অন্তত চব্বিশটি হুবহু ঠিক প্রমাণিত হয়েছে।' আমি ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য শান্তিদেবীর পুনর্জন্মের বিষয়টি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারিনি। প্রথমত, সেসময় যেসব লোকজন এই অনুসন্ধানে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের কেউই বৈজ্ঞানিকভাবে এধরনের কেস বিশ্লেষণে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন না। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে এরকম ঘটনা

শান্তি এবং শ্রীকাঞ্জিমল-এর মধ্যে প্রথম কথোপকথন

শান্তির পূর্বজন্মের স্বামী কেদারনাথ চিঠিতে শান্তি'র সব কথাবার্তা জানতে পেরে উত্তরে শান্তির বাবাকে লিখেছিলেন, মেয়েটির সমস্ত কথাবার্তা ঠিকঠিক মিলে যাচ্ছে, আপনারা অনুগ্রহ করে আমার যে আত্মীয় দিল্লীতে থাকেন, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এরপর কেদারনাথের সেই আত্মীয় শ্রী কাঞ্জিমল চৌবে শান্তির সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁদের নিম্নলিখিত কথোপকথনের লিখিত রিপোর্ট পাওয়া গেছে। স্বয়ং কাঞ্জিমলজী লিখেছেন:

আমি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে শান্তির সঙ্গে কথাবার্তা বলি।

আমি—আমাকে তুমি চেনো?

শান্তি—হ্যাঁ।

আমি—আমার নাম কি?

শান্তি—আমার মনে নেই।

আমি—তাহলে আমাকে চিনলে কি করে?

শান্তি—তুমি আমার স্বামীর ছোট (খুড়তুতো) ভাই।

আমি—তোমার স্বামীর নাম কি ছিল?

শান্তি—চৌবে কেদারনাথ।

আমি—মথুরায় তোমার বাড়ি কোথায় ছিল?

শান্তি—চৌবে গলিতে।

আমি—নিজের বাড়ি সম্পর্কে কিছু বল তো?

শান্তি—সামনেই একটা দোকান ছিল।

আমি—পূর্বজন্মে তুমি কাউকে পয়সা ধার দিয়েছিলে?

শান্তি—সেটা তো মনে নেই তবে নিজের ঘরে কিছু পয়সা পুঁতে রেখেছিলাম।

আমি—কত টাকা? কোন জায়গায় পুঁতে রেখেছিলে?

শান্তি—প্রায় দেড়শো টাকা, দোতলায় নিজের কামরায়।

আমি—জায়গাটা বলতে পারবে তো?

শান্তি—হ্যাঁ।

আমি—পূর্বজন্মে তোমার কটি বাচ্চা ছিল?

শান্তি—দুটি, এক ছেলে, এক মেয়ে।

আমি—তুমি কোথায় কিভাবে মারা গিয়েছিলে?

শান্তি— তা তো মনে নেই।

আমি—তোমাকে মথুরা রেলস্টেশনে একা ছেড়ে দিলে নিজের বাড়ি যেতে পারবে?

শান্তি—বাড়ি থেকে অনেক দূর, তাহলেও চলে যেতে পারবো।

আমি—তুমি মথুরায় যেতে চাও?

শান্তি—হ্যাঁ, ভীষণ। আমাকে মথুরায় নিয়ে চলুন না।

লুগদী দেবীর ভাই, শান্তিদেবীর কথার সমর্থন করেন

লুগদী দেবীর বোনও, এই পরীক্ষণে সামিল হন

শান্তিদেবীর সম্মোহন পরীক্ষা

১৩ এপ্রিল, ১৯৩৬, রাত সাড়ে আটটা। শান্তির বয়স তখন নয়। ওর একটি হিপনোটিক টেস্ট নেওয়া হয়। ঐ পরীক্ষা সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক জগদীশ মিত্র (ইনি সম্মোহন করেছিলেন), শান্তি, অধ্যাপক বেগ, ডঃ ইন্দ্রসেন, আইনজীবী মহেন্দ্রসিংহ বেদী, শান্তির বাবা লালা বঙ্গবাহাদুর এবং শ্রীমিত্রের দুই বন্ধু। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেগ–এর কাছে নিম্নোক্ত কথোপকথনের লিখিত রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকেই এটি সংগৃহীত।

শান্তি: লুগদীর খুব অসুখ পট্টি বাঁধা হচ্ছে লুগদীর খুব অসুখ–ফল দেওয়া হচ্ছে সকাল হয়ে গেল। লুগদীকে চান করানো হচ্ছে। লুগদী মারা গেল এবার লুগদী খাট থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

হিপ্নোটিস্ট: লুগদী নাকি তার আত্মা উঠে দাঁড়াচ্ছে? শরীর তো মৃত।

শান্তি: হ্যাঁ, শরীরটা খাটের ওপর, ওর আত্মা উঠে দাঁড়াচ্ছে–চারটে লোক হলদে কৌপীন পরে দাঁড়িয়ে, ওদের সিংহাসন রয়েছে, তিনজন সাধু রয়েছেন নীল কালো আর সাদা পোশাকে–লুগদী ভগবানের কাছে গেল–হাতের কাগজটা দেখাচ্ছে, খারাপ লোকগুলো কাঁদছে, অনেক দূরে–কাঁদছে।

হিপ্নোটিস্ট: ভগবান কী বলছেন? বলছেন–এটাই তোর শেষ জন্ম?

শান্তি: হ্যাঁ।

হিপ্নোটিস্ট: লুগদী কী করছে?

শান্তি: লুগদী সোনা-রূপোর সিঁড়ি দিয়ে নামছে, রাস্তায় খারাপ লোকেরা–খোলা ময়দান–লুগদী এপারে চলে এল।

হিপ্নোটিস্ট: লুগদী এখন কত বড়?

শান্তি: ছোট হয়ে যাচ্ছে, ছোট–খুব ছোট হয়ে গেল, ব্যস, সকাল হয়ে গেল।

হিপ্নোটিস্ট: লুগদী এখন কোথায়?

শান্তি: লুগদী অনেক ছোট, বিছানায় শুয়ে রয়েছে।

বিশ্লেষণের কতকগুলি নির্দিস্ট পদ্ধতি আছে। অবশ্য ডঃ ইন্দ্রসেন একমাত্র ব্যতিক্রম। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন, কেসটি সম্পর্কে বহু তথ্যের জন্য তিনি অপরের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, শান্তিদেবীর এই ব্যাপারটি সেসময় খুব প্রচার পেয়েছিল, তিনি যত বড় হচ্ছিলেন, নানা সূত্র থেকে বিভিন্ন সব অজ্ঞাত তথ্য তার কাছে এমনিতেই পৌছে যাচ্ছিল। তৃতীয়তঃ তার কথিত বর্ণনাগুলির বহু অংশ সঠিক প্রমাণিত হলেও, অনেক বিবরণ ভুল পাওয়া গিয়েছে। যাইহোক, তবু শান্তিদেবীর ঘটনাটির প্রতি আমাদের একটা কৌতূহল এবং বিস্ময় নিবদ্ধ থেকেই যায়।
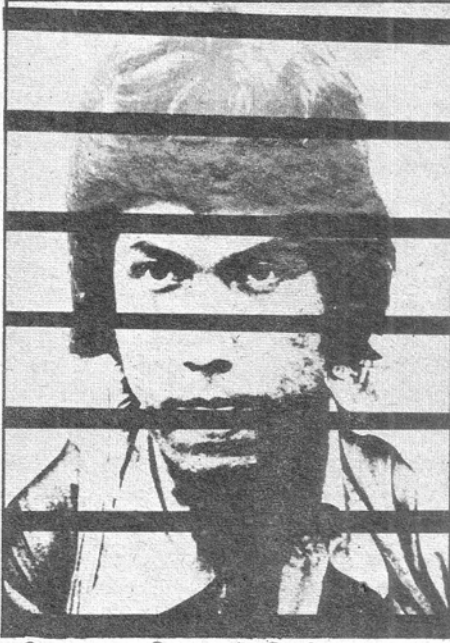
ডেভিড ওরফে ব্রতীন্দ্র রায়চৌধুরী-প্রতিভার অকালসমাপ্তি

ডেভিড মৃত্যুরহস্য

এখানেই রাতভর মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে থাকেন ডেভিড
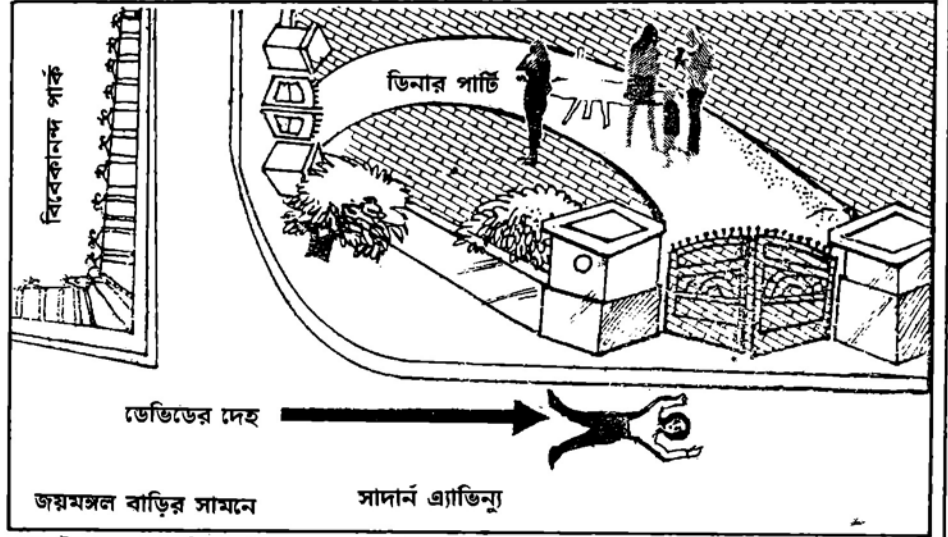
'কলকাতা কলকাতা' টি·ভি· সিরিয়ালের সহপরিচালক ব্রতীন্দ্র রায়চৌধুরী ওরফে ডেভিডের আকস্মিক মৃত্যুকে ঘিরে যে রহস্যময়তা দানা বেঁধে উঠেছে তার নেপথ্যে আলোকপাত।

ডেভিডদা'র মত মুখচোরা, লাজুক প্রকৃতির মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। 'কলকাতা কলকাতা' সিরিয়াল করতে গিয়েই ওর সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ। ওই সিরিয়ালের প্রথম চার পাঁচটা এপিসোডের সহকারি পরিচালক কিন্তু ডেভিডদা ছিলেন না, ছিলেন আরেকজন। তার নামটা আমি মনে করতে পারছি না। পাঁচ কি ছয় নম্বর এপিসোড থেকেই ডেভিডদা'কে কাজ করতে দেখি। কাজ সম্পর্কে প্রচণ্ড সচেতন ছিলেন উনি। খুঁটিনাটি সব দিকেই ছিল ওঁর নজর। ডিটেলসের ব্যাপারেও লক্ষ্য ছিল খুব। এক কথায় ডেভিডদা ছিলেন তেমনই সহকারি যে কাজ করলে সব পরিচালকই পারেন খুবই নিশ্চিন্ত থাকতে।

—অমন কাজ পাগল সচেতন যুবকের মৃত্যু সম্পর্কে আপনার কি মনে হয়?

—খবরের কাগজে ওঁর মৃত্যু সংবাদটি পড়ে আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম। অমন সাদাসিধে মানুষটাকে খুন করে কার কি লাভ হতে পারে? আমি তো কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না।

—সেদিন পার্টিতে আপনি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন কি?

—না পাবার কি আছে। আমি তো 'কলকাতা কলকাতা' সিরিয়ালের একটা ইমপর্ট্যান্ট রোলে অভিনয় করেছি। সেই সিরিয়ালের সাকসেস উপলক্ষে পার্টি, আর আমি ইনভাইটেশন পাব না? আমি আমার ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলাম।

—কখন গিয়েছিলেন?

—সাতটা নাগাদ। আমি কলকাতার বাইরে থাকি তাই তাড়াতাড়ি পার্টি থেকে চলে এসেছিলাম। সব মিলিয়ে দেড়-দু'ঘন্টার বেশি নয়।

—ডেভিডকে পার্টিতে দেখতে পাননি?

—এত লোক সেদিন পার্টিতে গিয়েছিল যে, এ মুহূর্তে ঠিক মনে করতে পারছি না। দেখে থাকলেও শুধুই চোখের দেখা। কথা কিছু হয় নি। কেননা, আমি বাড়ি ফেরার জন্য খুবই ব্যস্ত ছিলাম।

—পার্টিতে কি সেদিন মদ্য পানের ব্যবস্থা ছিল?

—মোটেই না। সফ্‌ট ড্রিংকের বেশি কিছুই ছিল না। এ নিয়ে দু'একজন অতিথিকে দুঃখ করতে শুনেছি।

এ পর্যন্ত বলে থামলেন 'কলকাতা কলকাতা' সিরিয়ালের অভিনেত্রী রীতা চট্টোপাধ্যায়।

'কলকাতা কলকাতা' সিরিয়ালটি দূরদর্শনে প্রচারিত হয়ে যত না আলোড়ন তুলেছে তার থেকে বেশ কয়েকগুণ বেশি আলোড়ন তুলে দিয়েছে ওই সিরিয়ালের সহকারী পরিচালক আটত্রিশ বছরের ব্রতীন্দ্র রায়চৌধুরি ওরফে ডেভিড—এর আকস্মিক মৃত্যু। ব্রতীন্দ্র ছোটবেলায় এতই ফর্সা ছিল যে অনেকেই ওকে বিদেশী বলে ভুল করতেন। সেই সূত্র ধরেই ওঁর ডাক নাম হয়ে যায় ডেভিড।

এমনিতে লাজুক প্রকৃতির হলে কি হবে লেখাপড়ায় খুবই ভাল ছিল ডেভিড। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কেটেছে ছাত্রজীবন। লা মার্টিনিয়ার-এর কৃতী ছাত্র। বি কম পাশ করেছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে। একটু চেষ্টা করলেই মাঝারি গোছের কোন চাকরি পাওয়া ডেভিডের কাছে মোটেই শক্ত কাজ ছিল না, কিন্তু অন্তরে শিল্পী মানুষ, বাঁধা ধরা চাকরি করার স্বপ্ন দেখবেন কেন? নিজেকে বিকশিত করার নানান চেষ্টাই তো হবে স্বাভাবিক ব্যাপার।

ডেভিডও তাই করেছিলেন। গভীর ছিল তাঁর সঙ্গীতবোধ, নাটক নিয়ে ছিল বিস্তর পড়াশুনো। ছবি আঁকা, ছবি তোলা অভিনয় সব কিছুতেই ডেভিড খুবই পারদর্শী। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, ওই রায়চৌধুরি পরিবারে অত সম্ভাবনা নিয়ে আর কেউ জন্মায় নি। এ সত্যটা পরিবারের সবাই এমন কি বাবা বলেন্দ্রনাথ ও মা মাধুরীদেবীও মনেপ্রাণে মানতেন, তাই কেউই কখনও ডেভিডের কোন ইচ্ছাতেই কখনও বাধা দেন নি। ফলে, কিছুটা নিয়মহীন জীবনও কাটিয়েছেন তিনি।

বছর দু'য়েক আগে বলেন্দ্রনাথ মল্লিকপুরে বাড়ি করেছিলেন। ছোট্ট ছিমছাম বাড়ি, বাহুল্য কম আন্তরিকতা বেশি। তবে ওই বাড়িতে ডেভিড কিন্তু তেমন থাকতেন না। ওঁর যাবতীয় কাজ ছিল শহরকেন্দ্রিক তাই মাসের মধ্যে বেশি দিনই ডেভিড থাকতেন বালিগঞ্জ প্লেসের মামার বাড়িতে।

ওঁর ছোটবেলার বন্ধু ছিলেন গৌতম ঘোষ। গৌতম বড় পরিচালক হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন, আর সেই স্বপ্নকে সত্যি করে তোলার ব্যাপারে বড় মদতদার ছিলেন ডেভিডও। সব সময়েই নতুন কিছু করার কথা ভাবতেন ডেভিড, তাই চিরাচরিত পথে কখনই হাঁটেননি। বাজারের আর পাঁচজন সহকারী পরিচালকদের মত ডেভিডকে তাই দেখা যায় নি টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ায় কাজের ধান্দায় ঘুরতে। চিত্রজগতের যেসব মানুষজন দূরদর্শনের সঙ্গে তেমন যুক্ত নন, তাদের অনেকেই কিন্তু ডেভিডকে চেনেনই না। এমনিতেই মুখচোরা, তার উপর ডেভিড স্টুডিও পাড়ার বাইরে বেশি কাজ করার জন্যই অমন হয়েছিল। যদিও ডেভিড গৌতম ঘোষের সঙ্গে প্রায় শুরু থেকেই যুক্ত আছেন। করেছেন একাধিক তথ্যচিত্র ও ফিচার ফিল্ম।

সহকারী পরিচালক হিসাবে ডেভিড কেমন ছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে রীতাদেবী বলেন, সব পরিচালকই মনে প্রাণে কামনা করেন, অমন সচেতন সহকারী যেন পান। অসম্ভব কর্মতৎপর ছিলেন ডেভিড, আর কাজের সময় কাজ ভিন্ন অন্য কোনদিকেই ওর নজর থাকত না। তবু অভিযোগ উঠেছে ডেভিড নাকি স্যুটিং-এর সময়ও মদ্যপান করতেন।

জনৈক কলাকুশলী এ কথা শুনেই আপত্তি জানিয়ে বললেন, এ কথা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। অমন কাজ পাগল মানুষ কখনই অমন করতে পারে না। যারা ডেভিডকে খুব কাছ থেকে দেখেছে তাঁরা কেউই এ কথা বিশ্বাস করবে না। আমি তো নয়ই।

মদ অনেকেই খায় আবার কারোকে মদে খায়। ডেভিড কিন্তু প্রথম দলের মানুষ। কাজেই নিজের প্রতি ওর যথেষ্ট কন্ট্রোল ছিল। আর আমি যতদূর জানি ডেভিড রেগুলার মদ খেত না।

ওই একই কথা বলেছেন ডেভিডের খুড়তুতো ভাই সতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরি। উনি বলেছেন, ডেভিড মাঝে মাঝে খেত, তাও খুব কম।

'কলকাতা কলকাতা' সিরিয়ালের নায়িকা রীতা চট্টোপাধ্যায়

সহকারী পরিচালক হিসাবে ডেভিড কেমন ছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে রীতাদেবী বলেন, সব পরিচালকই মনে প্রাণে কামনা করেন, অমন সচেতন সহকারী যেন পান। অসম্ভব কর্মতৎপর ছিলেন ডেভিড, আর কাজের সময় কাজ ভিন্ন অন্য কোনদিকেই ওর নজর থাকত না। তবু অভিযোগ উঠেছে ডেভিড নাকি স্যুটিং-এর সময়ও মদ্যপান করতেন।

এভাবেই চলছিল। তরতাজা যুবক ডেভিড জীবনের মধ্যভাগে এসে স্বপ্ন দেখতেন নিজে ছবি পরিচালনা করবেন, নতুন কিছু দেবেন দর্শকদের। কিন্তু সে স্বপ্ন অসমাপ্তই রয়ে গেল।

'কলকাতা কলকাতা' সিরিয়ালের নির্মাতা ছিলেন 'টেলিফ্রেম সংস্থা'। যার প্রধান তিন কর্ণধার হলেন, লেখক সমরেশ মজুমদার, অরিজিৎ গুহ এবং রমাপ্রসাদ বণিক। এঁরা তিনজনই আগে অন্য আরেকটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মতভেদের কারণে ওরা তিনজন মিলে নিজেরাই আরেকটি সংস্থা তৈরি করে ফেলেন। যার নাম 'টেলিফ্রেম'।

পঞ্চম সিরিয়ালের শ্যুটিং-এর সময় থেকে ডেভিড এদের সঙ্গে যুক্ত হন। 'কলকাতা কলকাতা' সিরিয়ালটির পরিচালক ছিলেন তিনজন। তিন কর্ণধারই ভাগাভাগি করে সিরিয়ালের বিভিন্ন পর্ব পরিচালনা করেছেন। ডেভিড কাজ করেছেন তিনজনের সঙ্গেই। পরিচালক পাল্টালেও টেকনিশিয়ান একই থেকে গেছে।

খুব একটা আহামরি কোনও সাফল্য না পেলেও 'কলকাতা কলকাতা' যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সিরিয়ালটি শেষ হওয়ার পর টেলিফ্রেম যুক্ত সকলের জন্যই একটা পার্টির আয়োজন করেছিলেন। ওই মর্মে একটি আমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছিলেন একশ তিরিশজন মানুষ। যার মধ্যে প্রায় সকলেই কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত ছিলেন ওই সিরিয়ালের সঙ্গে। ছিলেন 'সুবর্ণলতা' সিরিয়ালের পরিচালক রাজা সেন। রাজাবাবু 'কলকাতা কলকাতা' সিরিয়ালেরও কয়েকটি এপিসোড নাকি পরিচালনা করেছিলেন।

পার্টির স্থানটি ছিল দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত 'জয়মঙ্গল' বাড়ি। যা উৎসব অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়ার জন্য বিখ্যাত। উপস্থিত ছিলেন একশ সাতাশ জনের মত নিমন্ত্রিত। 'টেলিফ্রেম' অতিথিদের খাওয়ানর দায়িত্ব দিয়েছিলেন স্বস্তিক ক্যাটারার্সকে। খাওয়ার মেনু ছিল, কচুরি, চপ, ফিশ তন্দুরি, চিকেন রেজালা ও আইসক্রীম। এ ছাড়া ছিল সফ্ট ড্রিংকস।

ডেভিড পার্টিতে এসেছিলেন সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। যেহেতু পার্টিতে মদ নিষিদ্ধ ছিল তাই ডেভিড, অভিনেতা বব ওয়াং ও অভিনেত্রী পামেলা ঘোষালের স্বামী এই তিন জন বসে মদ্যপান করেছেন গেটের বাইরে অ্যাম্বাসাডার গাড়িতে বসে। মাঝে এক নাট্য পরিচালকও নাকি ওই আসরে যোগ দিয়েছিলেন।

সারাক্ষণই যে ডেভিড গাড়িতে ছিলেন, তা নয়। মাঝে মাঝেই গাড়ি থেকে নেমে পার্টির মধ্যে গেছেন। পরিচিতজনের সঙ্গে কথা বলেছেন। গোটা ব্যাপারটাই ছিল স্বাভাবিক। পার্টিতে উপস্থিত কারোরই কোন অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ে নি।

ওই দিন দুপুরে সাড়ে তিনটে নাগাদ ডেভিড

যখন মল্লিকপুরের বাড়ি থেকে চলে আসেন তখন তাঁর মাকে বলেছিলেন, দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে ফিরে আসছি। তাড়াতাড়ি খেয়েই চলে আসব। ওখান থেকে ডেভিড এসেছিলেন গৌতম ঘোষের বাড়িতে। হাসি ঠাট্টা করা, চা খাওয়া এবং গৌতম কন্যা আনন্দীর সঙ্গে গল্প করা এবং ছবি এঁকে দেওয়া আর পাঁচটা দিন যেমন যায় সেদিনও তেমন গিয়েছিল। এমন কি সেদিন ওই বাড়ি ছেড়ে চলে আসার আগে ডেভিড এন.এফ.ডি.সি.–তে থাকার কথাও গৌতমকে বলেছিলেন।

গৌতম ঘোষের গড়চার বাড়ি থেকেই ডেভিড সরাসরি সাদার্ন এভিনিউ–এর 'জয়মঙ্গল'–এ এসেছিলেন। কতক্ষণ ছিলেন সেই পার্টিতে, তা নিয়েও শোনা যাচ্ছে নানা পরস্পর রিবোধী বক্তব্য। কেউ বলেন রাত দশটা, কেউ সাড়ে দশটা, কেউ বা এগারটা পর্যন্ত।

যাই হোক, রাত্রি এগারটা নাগাদ ওই অঞ্চলের কয়েকজন যুবক ডেভিডকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। তারা ডেভিডের মুখে মদের গন্ধ পেয়ে বুঝতে পারেন, উনি ওদিককার 'জয়মঙ্গল' বাড়ির একজন অতিথি। অতিরিক্ত মদ্যপানে ওই অবস্থা!

তাঁরা যখন 'জয়মঙ্গল' বাড়িতে এসে রাস্তায় একজনের শুয়ে থাকার খবর দেন, পার্টিতে তখন নিমন্ত্রিত বা আয়োজক বলতে কেউই ছিল না, ছিলেন স্বস্তিক ক্যাটারারের এক কর্তাব্যক্তি উত্তম সাহা।

এরপর উত্তমবাবু ঘটনাস্থলে এসে ডেভিডকে দেখেন এবং চিনতে পারেন না। এমন কি পার্টিতেও তাঁকে দেখেছিলেন কিনা মনে করতে পারেন না। নিয়মমত উনি ডেভিডের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। ফিরে এসে ক্যাটারিং–এর জিনিসপত্র গুছিয়ে উনি নাকি বাড়ি ফিরে যান।

সারারাত ডেভিড পড়ে থাকেন ফুটপাতে। পরদিন ভোরে সাদার্ন এভিনিউ–এর বাসিন্দা ডাঃ অনিলকুমার ঘোষ মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়ে ডেভিডকে দেখতে পান। চিৎ হয়ে পড়েছিলেন ডেভিড। নিঃশ্বাস পড়লে কি হবে, ডেভিডের মুখের কাছে উড়ছিল মাছি। ডাক্তার ঘোষ সন্দেহ করেন, কেউ মারধোর করে ওখানে ফেলে দিয়ে গেছে তাঁকে।

অত ভোরেও নাগরিক কর্তব্য পালনে ত্রুটি করেন নি। বাড়ি ফিরেই অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করেন। কিন্তু সে গাড়ি আসার আগেই টহলদারি এক পুলিশের গাড়ির নজরে পড়ে ডেভিড। পুলিশ তখনই তাঁকে বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডেভিডের পকেট থেকে ঠিকানা জোগাড় করে তাঁর বালিগঞ্জ প্লেসের মামাবাড়িতে খবর দেয় পুলিশ।

সংবাদ পেয়েই তাঁরা ছুটে আসেন। বাঙুর হাসপাতাল থেকে ডেভিডকে নিয়ে যান রিপোজ নার্সিংহোমে। তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। ওখানে ডেভিড দীর্ঘ এগার দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে যান। বেশির ভাগ সময়েই উনি ছিলেন কোমায় আচ্ছন্ন। মাঝে মধ্যে জ্ঞান ফিরে এলেও কথাবার্তা
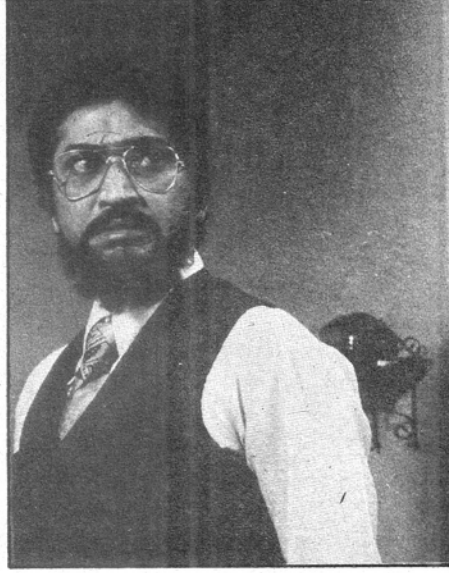
রমেন রায়চৌধুরী

সারারাত ডেভিড পড়ে থাকেন ফুটপাতে। পরদিন ভোরে সাদার্ন এভিনিউ-এর বাসিন্দা ডাঃ অনিলকুমার ঘোষ মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়ে ডেভিডকে দেখতে পান। চিৎ হয়ে পড়েছিলেন ডেভিড। নিঃশ্বাস পড়লে কি হবে, ডেভিডের মুখের কাছে উড়ছিল মাছি।

বিশেষ বলেন নি। যা কথা বলেছেন তার মধ্যে বেশিটাই ছিল টুকরো সংলাপ। বিচ্ছিন্ন। যেমন বলেছেন, আর মদ খাব না। খুব কষ্ট হচ্ছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে সেদিনের কথা ডেভিড একবারও উচ্চারণ করেননি, কেননা তার কিছুই মনে ছিল না। অসুস্থতার জন্য পুলিশও তাকে জেরা করার সুযোগ পায় নি।

নার্সিং হোমে ডেভিডের চিকিৎসা করেছেন ডাঃ মৃন্ময় নন্দী। উনি বলেছেন, ডেভিডের মাথায় সাংঘাতিক চোট লেগেছিল। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও ভিতরে ব্লিডিং হচ্ছিল। এ ধরনের আঘাত অবশ্য স্বাভাবিক ভাবে লাগে না। কোন অস্বাভাবিক কারণেই এ জাতীয় আঘাত লাগে। অতঃপর গত ১৮ আগস্ট ডেভিড ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মারা যান।

ডেভিডের ওই মৃত্যু নিয়ে প্রথম দিকে কোন হৈচৈ বা লেখালিখি হয় নি। বোম্বাই থেকে চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ একটা বিবৃতি দিতেই ব্যাপারটা নিয়ে সোরগোল উঠল। প্রধানত দু'টি দৈনিক এ ব্যাপার নিয়ে রেষারেষি করে নানান সংবাদ দিনের পর দিন ছাপতে শুরু করার পরই পুলিশকে নড়ে চড়ে বসতে হয়। একটু দেরি হলেও তাদের তদন্তে নামতে হয় পুরোদমে।

ওই সব সংবাদে পরস্পরবিরোধী নানা কথা লেখা হতে থাকে। যা ডেভিডের মৃত্যুকে নিয়ে নানা জটিলতার–জন্ম দেয়। প্রত্যেক হত্যারই একটা মোটিভ থাকে। ডেভিডের মৃত্যুর মোটিভ নিয়েও নানা গুজব তৈরি হয়ে যায়।

অভিনেতা রমেন রায়চৌধুরি ডেভিডের আত্মীয়। খুব নিকট সম্পর্ক না হলেও ওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। দুই পরিবারের মধ্যেও মেলামেশা ছিল। রমেন এক সাক্ষাৎকারে এই প্রতিবেদককে বলেছেন, ডেভিড ছিল নেহাতই ভালমানুষ। ওর কোন শত্রু থাকতে পারে বলে আমি অন্তত মনে করিনা। যদিও ডেভিড আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট, আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা বেশি। কেননা ওরা দু'জন প্রায় সমবয়সী।

–আপনি কি ডেভিডের খুন হওয়ার সম্ভাবনার কথা একদম উড়িয়ে দিচ্ছেন?

–আমার কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। প্রত্যেক খুনের পিছনে থাকে একটা না একটা মোটিভ। ডেভিডকে খুন করে কার কি লাভ হতে পারে! আমার তো কোন উত্তর মাথায় আসছে না।

–কোন কোন সংবাদসূত্র ডেভিডের বান্ধবীদের জড়িয়ে নানা কথা বলছে, এ প্রসঙ্গে আপনার কি বক্তব্য?

–ডেভিড মাঝে মধ্যে মদ্যপান করত এ সংবাদটা আমি জানি, কিন্তু ওর মহিলা সংক্রান্ত কোন দুর্বলতার কথা আমি কখনই শুনিনি। আমি স্থির নিশ্চিত ডেভিডের আর যাই থাক মহিলা প্রসঙ্গে কোনরকম দুর্বলতা ছিল না।

–তাহলে ডেভিড মরলেন কি করে?

–সব দিক ভেবে আমার মনে হয়েছে ব্যাপারটা সম্ভবত কোন দুর্ঘটনা। নচেৎ অমন হবার কোন কারণ নেই? ডেভিডকে মারব বলে কেউ মেরে ফেলেছে–এ তথ্যটা মনে নিতে আমার মন কোন সায় দিচ্ছে না।

ওই একই কথা বলেছেন গৌতম ঘোষের স্ত্রী নীলাঞ্জনা ঘোষ। ওঁর মতে ডেভিডের তেমন কোনও শত্রু নেই। গৌতম ঘোষও এ প্রসঙ্গে বলেছেন অনেক কথা। ওঁর মতে, যদি রাতেই কেউ ডেভিডকে হাসপাতালে নিয়ে যেত তাহলে হয়ত ওকে এভাবে মরতে হত না। সারারাত বিনা চিকিৎসায় একটা তরতাজা ছেলে কলকাতার বিশিষ্ট এলাকার সবাইকার চোখের সামনে পড়ে রইল, কেউ ফোন করে এ্যাম্বুলেন্সে বা পুলিশকেও খবর দিল না! এটা আমার চিন্তার বাইরে। আমাদের কত গর্ব কলকাতায় আমরা মানুষের জন্য ভাবি, সবাইকে ভালবাসি। একে অপরের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ি। কই, কোথায়, আমাদের সেইসব মানবিক মূল্যবোধ?

নানা পরস্পরবিরোধী বক্তব্য প্রকাশিত হবার

পর থেকেই ডেভিড মৃত্যু রহস্য ক্রমশ জটিল হয়ে পড়তে থাকে। অবস্থা খারাপ দেখে বালিগঞ্জ প্লেসে ডেভিডের মামার বাড়িতে গত ৩০ আগস্ট এক প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছিল। আয়োজক ছিলেন টেলিফ্রেম সংস্থা, গৌতম ঘোষ এবং ডেভিডের আত্মীয়স্বজনেরা। গৌতম ঘোষ ছাড়া সকলেই অভিযোগ জানান দৈনিক পত্রিকাগুলির বিরুদ্ধে। গৌতমবাবু বলেন, ডেভিডের প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ক্ষমতা অনুযায়ী যত সুযোগ ও সম্মান পাওয়া উচিত ছিল তা তিনি পান নি। এর জন্য ওঁর মনে দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণা ছিল। সব মিলিয়ে একটা গুণী যুবকের জীবন বলতে যা বোঝায়, ওঁর ছিল তাই।

ডেভিডের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে 'মৃত্যুর কারণ আঘাত'। ডেভিডের মাথার পিছনে ছিল বিরাট পাঁচ ইঞ্চির লম্বালম্বি ক্ষত। ওই আঘাতেই ডেভিড মারা যায়। একে বলে আঘাতজনিত মৃত্যু।

ময়না তদন্তকারি ডাক্তার অপূর্ব নন্দী পুলিশকে পরিষ্কার জানান যে, ডেভিডের আঘাত পাওয়ার ধরন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ওর আঘাত লেগেছে শক্ত পাথর কিংবা লোহার রেলিং—এর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে। সাধারণত ওই জাতীয় আঘাত লাগতে পারে, শক্ত পাথর বা লোহার রেলিং—এ জোর করে কেউ মাথা ঠুকে দিলে। তাতে কোমরের মেরুদণ্ডে কোন আঘাত লাগবে না। নচেৎ কোমরে আঘাত লাগবেই। ডেভিডের কোমরে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। ছিল বাঁ-হাতের তিন জায়গায় ছিঁড়ে যাওয়ার চিহ্ন।

এ রিপোর্ট পাবার পর পুলিশ আরও গভীর তদন্তে নামে। দক্ষিণ কলকাতার যতীন বাগচী রোড, সাদার্ন এভিনিউ, কেয়াতলা, বিবেকানন্দ পার্ক এলাকার নানা বাসিন্দার সঙ্গে কথা বলে। তারপর গত ১৭ সেপ্টেম্বর বিকালে সাত নম্বর লেক কলোনি থেকে উত্তম সরকার, সমীর দাস এবং মাধব দাস নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশের কাছে ধৃতরা বলেন: গত ৬ আগস্ট রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ ওই কলোনির এক মহিলা রাস্তার কলে বাসন ধুচ্ছিলেন। ওইসময় ডেভিড মদ্যপ অবস্থায় ওখানে এসে মহিলার সঙ্গে নাকি অশালীন ব্যবহার করতে শুরু করে। মহিলার চিৎকারে ওই তিনজন এসে ডেভিডকে ঘিরে ধরে। একজন একটি চড় আরেকজন একটি ঘুঁষি মারে। ব্যালেন্স ঠিক রাখতে না পেরে ডেভিড পিছন ফিরে পড়ে যান এবং জ্ঞান হারান। আঘাতকারীরা এ পরিণতির জন্য তৈরি ছিলেন না। তারা ডেভিডকে রাস্তা থেকে ফুটপাথে তুলে শুইয়ে দেন। খবর দেন 'জয়মঙ্গল' বাড়িতে। কিন্তু উত্তম সাহা ডেভিডকে চিনতে পারেন না। আঘাতকারীরাও অত রাত্রে দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। ফলে ডেভিড সারারাত্রি ফুটপাথেই পড়ে থাকেন।

এখন ধৃত যুবকদের ওই বক্তব্য ডেভিডের ঘনিষ্ঠজনেরা ঠিক মেনে নিতে পারছেন না। তাঁদের কথা হলো, ডেভিডের আর যাই থাক মহিলা ঘটিত কোন দুর্বলতা ছিল না। দ্বিতীয়ত প্রহারের ফলে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেলে ময়নাতদন্তকারী ডাক্তারের মত অনুযায়ী কোমরে আঘাত লাগতো, তা যখন নেই, তাহলে ডেভিডের পড়ে যাওয়ার বিবৃতি কি মেনে নেওয়া যায়? মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন ডেভিড, শরীরের নানা জায়গায় আঘাতও লেগেছিল। আহত একজনকে ওভাবে সারারাত ফেলে যাওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকতাই কি বেশি নয়? যদি যুবকদের ডেভিডকে প্রাণে মারার বাসনাই না থাকবে তাহলে কি দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত হত না? বিশেষত তারা যখন ডেভিডের পোশাক দেখে এবং মদের গন্ধ পেয়ে পার্টিতে আসা বিশিষ্টদের একজন বলে মনে করতে পেরেছিলেন।

পুলিশের বক্তব্য, ডেভিডকে হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে আঘাত করা হয় নি। কিন্তু ওই যুবকদের আঘাতেই ডেভিড মারা গেছেন। তাই তাদের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারা অনুযায়ী একটা মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

আশা করা যায়, আদালতে ডেভিডের নিকটজনের ওইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে। তারই অপেক্ষায় দিন গুনছেন ওঁরা। এ ছাড়া উপায়ই বা কি?

-তপন রায়।

জঙ্গী কংগ্রেসী নেতা
সুব্রত মুখোপাধ্যায়
ছবি: তাপস কুমার দেব
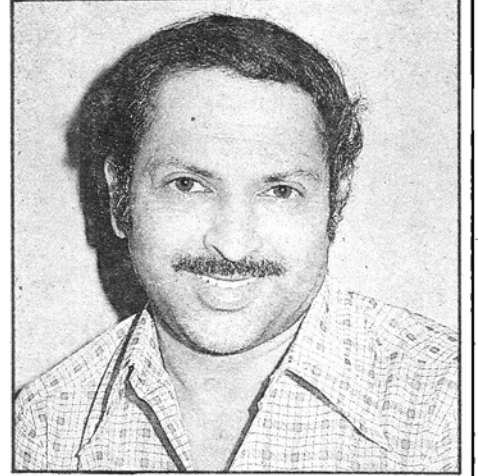
আগামী নির্বাচন লক্ষ্য করে পশ্চিমবংগে কংগ্রেস প্রস্তুতি নিচ্ছে

লোকসভা নির্বাচন আসন্ন ধরে নিয়ে পশ্চিমবংগ প্রদেশ কংগ্রেস গোপনে রাজনৈতিক প্রস্তুতি নিয়ে চলেছে। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী, সোমেন মিত্র, মমতা ব্যানর্জি ও সুব্রত মুখার্জির হাত ধরে কি সেই রাজনৈতিক কৌশল এ রাজ্যের গ্রুপবিদীর্ণ কংগ্রেস কর্মীদের মনে আশার প্রদীপ জ্বালাবে?
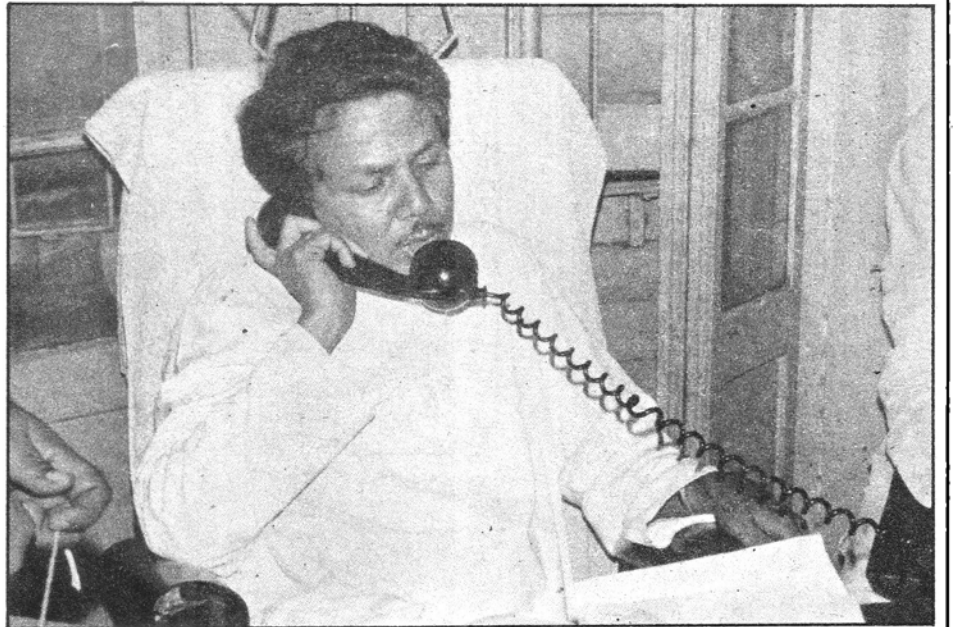
না, আমাদের মধ্যে এখন আর কোনও অনৈক্য নেই: প্রিয়রঞ্জন
ছবি: প্রদীপ দাস

২১ আগস্ট ১৯৮৮ তারিখে দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড় শিক্ষা-নিকেতনে বিধানসভা কেন্দ্র ওয়ারি কংগ্রেস কর্মী সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তথা কেন্দ্রিয় বাণিজ্য মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী প্রতিটি কর্মীকে ১ সেপ্টেম্বর থেকে চূড়ান্ত ভোটারলিস্ট টাঙানোর অফিসগুলিতে 'বঙ্গলিপি' খাতা হাতে হাজিরা দিতে নির্দেশ দেন। শ্রীদাশমুন্সী বলেন, আগামী লোকসভা নির্বাচনে সি.পি.এমের 'রিগিংটেকনিক' রুখতে এইভাবে 'বঙ্গলিপি' খাতায় বুথ ওয়ারি বাতিল ভোটার ও সন্দেহজনক ভোটারদের নাম লিখে রাখতে হবে। এবং এই উদ্দেশ্যে ১ সেপ্টেম্বর থেকে প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে কেন্দ্রিয় সরকারি অতিথি অফিস 'নিজাম প্যালেস'—এ 'কন্ট্রোল রুম' খোলা হবে। প্রতিটি বুথ থেকে কর্মীরা ডিরেক্ট সেখানে রিপোর্ট করবে। সেই কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে থাকবে প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক পর্যায়ের অফিসিয়ালরা।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির এই নয়া নির্বাচনী টেকনিক গ্রহণের ঘোষণা আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রস্তুতিপর্বের দিকটিই সূচিত করে। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে জোর গুজব ছিল, সন্তোষমোহন দেব ও সাংসদ মনোরঞ্জন ভক্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীকে সরিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী বরকত গণিখান চোধুরীকে দায়িত্ব দেবেন। কিন্তু চলতি বছরের জুন মাসের উপনির্বাচনে শ্রমিক অধ্যুষিত বারাবনী কেন্দ্র সি.পি.আই (এম)-এর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার পর থেকেই বর্তমান রাজ্য নেতৃত্ব সম্পর্কে হাইকমাণ্ডের ধারণা বদলাতে থাকে। অবশ্য ইতিমধ্যে কংগ্রেসী রাজ্য রাজনীতিতে গোষ্ঠীগত দলবাজির ধারাগুলির পরিবর্তন হয়েছে

অনেক।

১৩টি উপদল লালিত রাজ্য কংগ্রেসে এখন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী ও সুব্রত মুখার্জির দুই গোষ্ঠী একসঙ্গে চলতে আরম্ভ করেছে। অর্থাৎ কংগ্রেসে উক্ত দুজনের নিজেদের গোষ্ঠী সমর্থক ছাড়াও অফিসিয়াল যুব কংগ্রেস এবং আই.এন.টি.ইউ.সি এই দুই নেতার পায়ের তলার ভিত শক্ত করছে দারুণভাবে। প্রকৃতপক্ষে জঙ্গী যুবনেতা হিসাবে সুব্রত মুখার্জি এ রাজ্যের কংগ্রেস রাজনীতিতে একটি জবরদস্ত স্তম্ভ বিশেষ। সুব্রতবাবুর শক্ত ভিত দাঁড়িয়ে আছে মূলত শ্রমিক সংগঠন আই.এন.টি.ইউ.সি এবং ছাত্র পরিষদের উপর। আই.এন.টি.ইউ সি র রাজ্য সভাপতি তিনি নিজে, এবং ছাত্র পরিষদের সেরা সংগঠক অশোক দেব তাঁর একান্ত অনুগামী। অন্যদিকে প্রিয়রঞ্জনের

মমতা ব্যানার্জি, নতুন পদ প্রাপ্তি!

পিছনে রয়েছে রাজ্য যুব কংগ্রেস। এর সভাপতি প্রদ্যোৎ গুহ প্রকাশ্যেই নিজেকে প্রিয় অনুগামী বলে বেড়ান। ৭০ দশকে বামপন্থী জঙ্গী রাজনীতির মোকাবিলা করে যে নের্তৃত্ব কংগ্রেসকে ক্ষমতায় এনেছিল তা 'প্রিয়–সুব্রত গোষ্ঠী–' বলেই বাংলায় পরিচিত। এই দুই নেতার বৃহৎ দুই গোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধতা অবশ্যই কংগ্রেসের আগামী নির্বাচনে লড়ার প্রস্তুতি।

এই দুটি গ্রুপ ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে আর যে গ্রুপগুলি বর্তমান তা, সোমেন মিত্র, বরকত গণি খানচৌধুরী, প্রফুল্ল কান্তি ঘোষ, অজিত কুমার পাঁজা, সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের গ্রুপ এবং মমতা ব্যানার্জির গ্রুপ উল্লেখ যোগ্য। এগুলির বাইরে যে ছোটখাট গ্রুপ আছে তার ক্ষমতা খুবই সীমিত ও জেলাভিত্তিক এবং তারা মূলত প্রথম তিন বড় গ্রুপ প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী, সুব্রত মুখার্জি কিংবা সোমেন মিত্রর গ্রুপের সঙ্গে ইস্যুভিত্তিক কাজকর্ম করে থাকে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির স্ট্র্যাটেজি

রাজ্য রাজনীতিতে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী এখন সুকৌশলে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে নেমে পড়েছেন। আর এই নেমে পড়ার মধ্য দিয়েই কংগ্রেসের পরস্পর বিবদমান গ্রুপগুলি এক এক করে আত্মসমর্পণ করছে তার কাছে। একদিকে কেন্দ্রিয় মন্ত্রীত্বে থাকার সুবাদ অন্যদিকে হাইকমাণ্ডের নিশ্চিন্ত আশ্রয় রাজ্যরাজনীতিতে প্রিয়রঞ্জনকে সুপার লীডার করে তোলার দিকে দারুণ সহায়তা করছে।

এইভাবেই মমতা ব্যানার্জি ও সুব্রত মুখার্জির গ্রুপ প্রিয়দাশমুন্সীর নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছে। নির্বাচনের আগে এই দুটি গ্রুপকে নিজের করে পাওয়া তাঁর প্রয়োজন। মমতা ব্যানার্জি ও সুব্রত

যুব কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যোৎ গুহ

মুখার্জিকে জয় করতে প্রিয়রঞ্জনকে কিছু কনসেসন ছাড়তে হচ্ছে। এখন অফিসিয়াল যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের কমিটি দুটি প্রিয়বাবুর অধীনে। সেখানে নিজের লোক যুব সভাপতি প্রদ্যোৎ গুহকে সরিয়ে মমতা ব্যানার্জিকে রাজ্য কমিটির সভাপতি করতে এবং ছাত্র সভাপতি বিভাস চৌধুরীর ক্ষমতা খর্ব করে সুব্রত অনুগত ছাত্র নেতা অশোক দেবকে রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান করতে প্রিয়রঞ্জন রাজী হয়েছেন। আবার হাইকমাণ্ড প্রেরিত কংগ্রেসের দুই সার্ভেয়ার সন্তোষমোহন দেব ও মনোরঞ্জন ভক্তর রিপোর্টেও এই দুটি সুপারিশ ছিল।

হাইকমাণ্ড থেকে এই দুটি সুপারিশ কাজে পরিণত করার আগেই প্রিয়রঞ্জন নিজ উদ্যোগে ওই কাজটি করার প্রচেষ্টা নিয়ে রাজ্য কংগ্রেসে একটা বড় ধরনের কার্যকর ঐক্যকে স্থায়ীভাবে একদিকে যেমন ডেকে আনছেন, অন্যদিকে, প্রিয় বিরোধী শক্তির প্রধান স্তম্ভ বরকত গণিখান চৌধুরীর প্রদেশ কংগ্রেস বদলের দাবিকে দুর্বল করে দিচ্ছেন।

রাজ্য কংগ্রেসের বৃহৎ ঐক্যের প্রথম ধাঁপটি অতিক্রম করার পর প্রিয়রঞ্জন দলীয় রাজনীতিতে তার বিরোধী শিবিরের দিকে একটা জোরদার হানা দিয়েছেন ঐক্যমন্ত্রের বাহানা নিয়ে। ১৯ আগস্ট সভাপতি আবদুল মান্নানের নেতৃত্বে সেবাদলের বিশাল মিছিল 'দুর্নীতির দায়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পদত্যাগের দাবিতে' কলকাতা পরিক্রমা করে। এই সেবাদলই এখন প্রিয়বিরোধী দুই নেতা সোমেন মিত্র এবং বরকত গণিখানের রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম। এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই সোমেন–বরকত গোষ্ঠী প্রদেশ কংগ্রেসের প্যারালাল আন্দোলন 'জনজাগরণ কর্মসূচী' চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সেবাদলের মিছিলে ১৯ আগস্ট প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী আচমকাই এসপ্ল্যানেড ইস্টের মুখে যোগ দিলেন। সভাপতি মান্নান বিব্রত বোধ করলেও প্রদেশ সভাপতিকে তো আর অস্বীকার করতে পারেন না। তাই স্বাগত জানালেন বাধ্য হয়ে। সেদিন সেবাদল সমাবেশেও প্রিয়রঞ্জন, ঐক্যের ডাক দিয়ে বক্তব্য রাখলেন। সেদিন তাঁর বক্তব্যের মূলকথাই ছিল–ঐক্য না হলে সামনের নির্বাচনে বিপদে পড়তে হবে আমাদের। পরবর্তী দিনগুলিতে সেবাদল প্রধান আবদুল মান্নানও জোর দিতে বাধ্য হয়েছেন তিন নেতার ঐক্যে। এটা খুবই সত্যি পরপর তিনটি সাধারণ নির্বাচনে ৪২ শতাংশ ভোট পাওয়া কংগ্রেসকে জিততে হলে প্রিয়–সুব্রত–সোমেন এই তিন নেতার ঐক্যকে কার্যকর করতেই হবে।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস রাজনীতির দুটি ধাপ বরাবর সক্রিয়। একটি কলকাতাকেন্দ্রিক রাজনীতি-এর মধ্যে কলকাতার চারটি জেলা ছাড়াও পাশ্ববর্তী শ্রমিক অধ্যুষিত ৪টি জেলাও পড়ে যায়। এই চারটি জেলা হল উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, হাওড়া এবং হুগলী। কলকাতা সহ এই আটটি জেলার বিশাল অংশ শ্রমিকবেল্ট। আর তার নেতৃত্বে আই .এন.টি.ইউ.সির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অন্যদিকের ধারাটি হল মফঃস্বল কেন্দ্রিক। ৬০ এর দশক পর্যন্ত এই ধারাটিকে মদত দিতেন হুগলী মেদিনীপুর গ্রুপের প্রফুল্ল চন্দ্র সেন এবং অজয় মুখার্জির মত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরা। এখন সেই হুগলী জেলা থেকে উঠে এসেছেন বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য নেতা আবদুল মান্নান। তাঁকে সহযোগীতা করছেন মালদা জেলার বরকত গ্রুপ এবং পূর্বতন যুব কংগ্রেসের সভাপতি সোমেন মিত্র।

এই দুটি পৃথক ধারার কথা মনে রেখেই কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের কাছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নতুন সাংগঠনিক রদ বদলের প্রস্তাব গেছে। সেটি হল বোম্বাই শহর কংগ্রেস কমিটির ধাঁচে কলকাতাকে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস থেকে আলাদা করে পৃথক কমিটি গড়া। প্রস্তাবকদের সুপারিশ হল প্রধান বিবদমান দুই নেতা সুব্রত ও সোমেন মিত্রকে সম্পাদক করে এবং প্রাক্তন বাণিজ্য মন্ত্রী ডঃ

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি করে পৃথক কলকাতা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি গড়া হোক। অন্যদিকে গ্রুপ বহির্ভুত নেতা, ও বর্তমান রাজ্যপরিষদীয় দলের নেতা আবদুস সাত্তারকে সভাপতি করে কলকাতা ও দুই চব্বিশ পরগণা বাদে অন্যান্য জেলাগুলিকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি গঠনের দাবিও জানিয়েছেন উক্ত প্রস্তাবকরা।

প্রস্তাবগুলি সাধারণভাবে খুবই আকর্ষণীয়। কিন্তু বাস্তবে এ দুটি কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে। কেননা গ্রুপ রাজনীতির শিকড় রাজ্য কংগ্রেসের কি মফঃস্বল কি শহর সর্বত্রই উইপোকার মত সংগঠনের শরীরে ছেয়ে গেছে। কোন না কোন সময়ে যিনি একবার নেতা মনোনীত হয়েছিলেন, ক্ষমতা চলে যাওয়ার পরে কিন্তু তার তৈরি করা গোষ্ঠী শেষ হয়ে যায়নি। বরং ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে ব্যালেন্সিং পাওয়ারের খেলা খেলেছেন। বর্তমান দল–প্রধান প্রিয়, পূর্ববর্তী ৫ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কেউই এর ব্যতিক্রম নয়। ইন্দিরাগান্ধী দ্বিতীয় বারের মত কংগ্রেস ভাগ করার পর এ রাজ্যে সভাপতি হয়েছেন পাঁচজন। যথাক্রমে এরা হলেন বরকত গণিখান চৌধুরী, আনন্দ গোপাল মুখার্জি, অজিত পাঁজা, প্রণব মুখার্জি ও প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী। সভাপতি পদে থাকা কালে এরা কেউ গোষ্ঠী রাজনীতির বাইরে থাকতে পারেননি।

গত পাঁচ বছরে রাজ্য কংগ্রেস দিল্লি থেকে চাপিয়ে দেওয়া দুই অ্যাডহক সভাপতিকে পেয়েছেন। প্রথমজন প্রণব মুখার্জি ও দ্বিতীয়জন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী। প্রণববাবু তো দল থেকে বিতাড়িত হয়ে ফের নতুন করে এসে হাজির হয়েছেন। অন্যদিকে কংগ্রেস (এস) থেকে আগত 'দুর্দিনের দলত্যাগী' প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী নিজস্ব রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই ঘটাচ্ছেন। তবে দুজনের কেউই এতদিন পর্যন্ত রাজ্য কংগ্রেসকে সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য কিছুমাত্র কাজ করেননি। আন্দোলন বা মিছিল মিটিং যা করেছেন তা স্রেফ গোষ্ঠী রাজনীতির মুখ চেয়ে। তবু কংগ্রেস যে গত তিনটি বিধানসভা নির্বাচনে ৪২ শতাংশ ভোট পেয়েছেন তা স্রেফ এ রাজ্যের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ পলিটিক্যালি পোলারাইজড বলে। মাত্র ১৫ শতাংশ মানুষ ফ্লোটিং ভোটার ছাড়া বাকি সবই কমিটেড বলে নির্বাচনী ফলাফলে প্রমাণিত হয়েছে। আর এই ফ্লোটিং ভোটারের উপস্থিতি শহরাঞ্চলেই বেশি। সেখানে এরাই টার্নিং পয়েন্ট।

শহরাঞ্চল বলতে ওই গুরুত্বপূর্ণ এলাকাটিতে কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, দুই ২৪ পরগণা ও নদীয়া পড়ে। এই এলাকার দুই গুরুত্বপূর্ণ নেতা প্রদেশ কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক সোমেন মিত্র ও ইনটাকের রাজ্যসভাপতি সুব্রত মুখার্জি আগামী নির্বাচনের বিষয়ে পৃথক পৃথক ভাবে জানালেন কলকাতার চারটি লোকসভা কেন্দ্র ও অন্যান্য ৫টি

প্রণব মুখার্জি: কংগ্রেসে আবা'র ! ছবি: কমল কুমার ঘোষ

জেলার ১৩টি লোকসভা কেন্দ্রে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে ফাইট দিই তাহলে ৯০ শতাংশ আসনে আমরা জিতবই। যুব কংগ্রেস, ছাত্রপরিষদ, আই.এন.টি.ইউ.সি. ও সেবাদল কর্মীরা যদি সুসংবদ্ধ ভাবে নির্বাচনী কাজে না সি.পি.এমের সমস্ত সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে পারে, তাহলে শহরাঞ্চলের ১৬টি আসনে আমরাই ফেবারিট। এবং বাকি ২৬টি আসনের মধ্যে অন্তত অর্ধেক আসন আমরাই পাব।

রাজ্য সেবাদল সভাপতি আবদুল মান্নান এবং রাজ্য যুবকংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যোৎ গুহ বর্তমান প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাদা আলাদা আলোচনায় দুটি বিশেষ নির্বাচনী প্রস্তুতির কথা জানালেন। উভয় নেতাই দাবি করলেন রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটার তালিকার কারচুপি, ভোটের দিন রিগিং, গ্রামে গঞ্জে সন্ত্রাস রুখতে প্রতি কেন্দ্রে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ৫,০০০ করে কর্মীকে মোতায়েন করা হবে। তাঁরা গণতান্ত্রিক পথে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি নিয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ে মাঠে নামবেন।

কিন্তু নির্বাচনী ইস্যু কি হবে আপনাদের, যখন কেন্দ্রিয় নেতৃত্বের ঘাড়ে দুর্নীতির অভিযোগ?

টেবিল চাপড়ে যুব কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যোৎ গুহ বললেন, ওসব বোফর্স টোফর্স মানুষ বিশ্বাস করে না। দেখেছেন তো বরাবনীর উপনির্বাচন। সি.পি.এমের লাল সন্ত্রাসের মুখে দাঁড়িয়েও ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলাম জুন মাসে। এ কি এলাহাবাদ নাকি মশাই। এর নাম পশ্চিমবঙ্গ, এখানে মার্কিন দালালদের ঠাঁই নেই। আর দুর্নীতির কথা বলছেন? সেটাই তো আমাদের আগামী নির্বাচনের ইস্যু করব। জ্যোতি বসুর দুর্নীতির কথা তো প্রিয়দা (প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী) ফাঁস করেই দিয়েছেন। আমরা প্রশ্ন করব কিভাবে জ্যোতি বসুর ছেলে দশ বছরে শিল্পপতি বনে যায়, ব্যবসায়ীদের কাছে রডন স্কোয়ার বিক্রি করে কত টাকা কাটমানি নিয়েছেন সি.পি.এম নেতারা, পরিবহন দপ্তরে দোতলাবাস কিনতে গিয়ে কোটি কোটি টাকা ঘুষ নেন কোন নেতা? গ্যাস টারবাইন কেনার দালালি কার নামে কোন ব্যাংকে জমা আছে? এসবের উত্তর জ্যোতিবাবু দিতে পারবেন কি? আমরা জানি, তা পারবেন না। উত্তর দেবেন জনগণ তা ত্রিপুরার মত ব্যালট বিপ্লব করে।

প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী আগামী নির্বাচনী প্রস্তুতির কথা জানাচ্ছিলেন। বললেন—না, আমাদের মধ্যে এখন আর কোনও অনৈক্য নেই। এই তো সেদিন আমি সেবাদলের মিছিল কলকাতায় লীড করলাম, অথচ আপনারা লেখেন মান্নানের সঙ্গে আমার নাকি ঝগড়া। আসলে কংগ্রেসের মধ্যে তথাকথিত ঝগড়া সৃষ্টি করে আপনারা সংবাদের বেসাতি করেন। নির্বাচনী প্রস্তুতিপর্বে এ ধরনের অপপ্রচারের সুযোগ আমি আর দেব না।

সাংগঠনিক প্রস্তুতির কথা তুলতে প্রিয়রঞ্জন বললেন, এবার আমরা নির্বাচনকে অবাধ করতে দ্বিমুখী ব্যবস্থা নিচ্ছি। ভোটারলিস্টের কারচুপি বন্ধ করতে বুথে বুথে ১ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ভোটার লিস্ট পাবলিশড হওয়ার তারিখ থেকেই কংগ্রেসের স্থানীয় স্পেশাল টীম নজরদারি জোরদার করবে,

বাধ্য করবে ভুতুড়ে ভোটারদের নাম তুলতে, অন্যদিকে ভোটের দিন বুথে বুথে যুব কংগ্রেস ও সেবাদলের কর্মীরা পাহারা দেবে যাতে মাসল পাওয়ার ইউজ করে সি.পি.এম কোনমতে যেন রিগিং করতে না পারে। প্রথমটির জন্য নিজাম প্যালেসে কন্ট্রোল রুম খোলা হচ্ছে, দ্বিতীয়টির জন্য ব্লকে ব্লকে 'শিক্ষণশিবির' চালু করা হবে। লাল সন্ত্রাসের মোকাবিলায় যুব কংগ্রেস ও সেবাদল প্রয়োজনে রুটমার্চ করবে। শিল্পাঞ্চলে যুবশক্তিকে সাহায্য করবে আই.এন.টি.ইউ.সি।

প্রিয়রঞ্জন আরও জানালেন, নির্বাচনের আগে প্রদেশ কংগ্রেসে পরিবর্তন হবে কি না তা হাইকমাণ্ডই একমাত্র বলতে পারবেন তবে আঞ্চলিক সাংগঠনিক সমস্যা মেটাতে স্থানীয়ভাবে যুব কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ বা সেবাদলে কিছু অদল বদল করা যেতে পারে। তবে তা নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপর।

রাজ্য কংগ্রেস প্রধান প্রিয়রঞ্জনের এই ইঙ্গিতই প্রমাণ করে মহিলা নেত্রী মমতা ব্যানার্জি, ছাত্রপরিষদে অশোক দেব এবং সেবাদলে সৌগত রায়ের অধিষ্ঠান আসন্ন। আর তা একান্তভাবেই আগামী নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে।

ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের ১৬ জন বিজয়ী সংসদ সদস্য নিজ নিজ নির্বাচনী কেন্দ্রে ঘোরাঘুরি শুরু করে দিয়েছেন। স্বয়ং প্রিয়রঞ্জন ঘুরছেন নিজ নির্বাচনী কেন্দ্র হাওড়ায়। বন্ধ কারখানা খুলতে জোরদার তদ্বিরও নাকি চালাচ্ছেন। কংগ্রেসের দাবি ইতিমধ্যে খুলিয়েছেন দু-একটি। অজিত পাঁজা, ভোলানাথ সেন, আনন্দ গোপাল মুখার্জি, গোলাম ইয়াজদানি, তরুণকান্তি ঘোষ, বিমলকান্তি ঘোষ, দেবী ঘোষাল, মনোরঞ্জন হালদার প্রতি সপ্তাহে ঘুরছেন নিজের লোকসভা কেন্দ্রের পরিধিতে। মমতা ব্যানার্জি ২৪ পরগণায় এবং বরকত গণি খান মালদায় তো নানান স্থানীয় ইস্যুতে প্রায় যুদ্ধ ঘোষণাই করে বসেছেন। শহরাঞ্চলের প্রায় সব বিধানসভা এলাকাতেই বুথওয়ারি কর্মী বাছা শুরু হয়ে গেছে।

এসব সাংগঠনিক প্রস্তুতির বাইরে কংগ্রেস সম্ভবত অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে। গত মাসে রাষ্ট্রসংঘে গিয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রিয় মন্ত্রী অমিয় কিস্‌কু ঝাড়খণ্ডের হয়ে ওকালতি করে সারা দেশের বিতর্কভাজন হয়েছেন। তবু কিন্তু কংগ্রেস থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়নি। শ্রী কিস্‌কু মেদিনীপুর জেলার একজন শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতা। কিন্তু ইদানীং তাঁর যাবতীয় কাজকর্ম ঝাড়খণ্ডের সঙ্গেই। জেলা বা প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব তা দেখেও যেন দেখছেন না। উল্টে অমিয় কিস্‌কুর সংশ্লিষ্ট কংগ্রেস নেতারা বলছেন, অমিয়বাবু যা করছেন তা প্রধানমন্ত্রীর গ্রীণ সিগন্যাল পেয়েই! একথা যদি সত্যি হয় তাহলে শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয় বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশায় ঝাড়খণ্ডীদের সঙ্গে কংগ্রেসের গোপন আঁতাত হতে পারে। যার প্রভাব কম করে ১০০টি লোকসভা
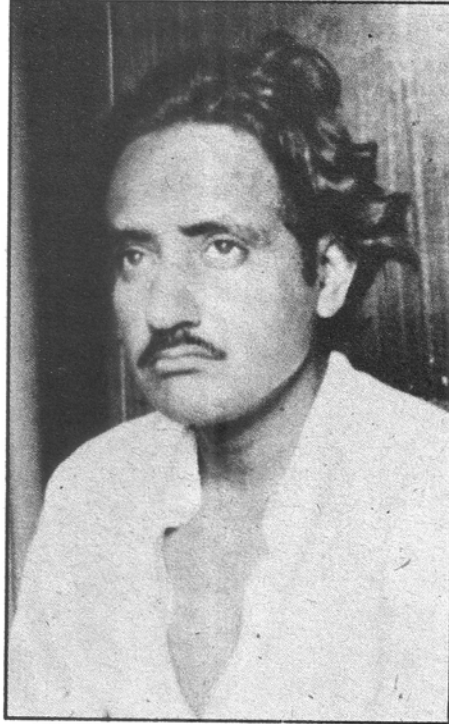
অশোক দেব, ছাত্র নেতা (সুব্রত)

ছবি : প্রদীপ দাস

> *সুব্রত মুখার্জির ভাষায়, বামফ্রন্টে এখন আর কোন ঐক্য নেই। নিচুতলায় এরা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরস্পর পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। আগামী নির্বাচনে আমরা অবশ্যই এ ব্যাপারটি কাজে লাগানোর কথা ভাবব।*

কেন্দ্রকে প্রভাবিত করবে।

অমিয় কিস্‌কুর ঘনিষ্ট মহলের এই বিতর্কিত বক্তব্যের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কাজকর্মেরও যেন সামান্য কিছু মিল পাওয়া যায়। প্রধানমন্ত্রীর জুন মাসের বিহার সফরে ঝাড়খণ্ডীদের প্রিয় আর্চবিশপের সঙ্গে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। বিহারের আদিবাসী বেল্টের পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর এই কার্যক্রম অবশ্যই ছিল সুচিন্তিত।

পশ্চিমবঙ্গে ঝাড়খণ্ডীদের নিষ্ক্রিয় সমর্থনও যদি কংগ্রেস পায় তাহলে তার নিজস্ব ৪২ শতাংশ ভোটের সঙ্গে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর পুরুলিয়া, বীরভূম, বর্ধমানের স্থানে স্থানে নির্বাচনী জয় অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে। আর দক্ষিণবঙ্গে ঝাড়খণ্ডীদের কংগ্রেস কাছে পেলে উত্তরবঙ্গে উত্তরখণ্ডী দল এবং দার্জিলিং এ জি.এন.এল এফ কেও কংগ্রেস সঙ্গে পাবে। যেভাবে ত্রিপুরায় উপজাতি বাহিনী যুবসমিতিকে কংগ্রেস নির্বাচনী দোসর করে ছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই ঝাড়খণ্ডী, জি.এন.এল.এফ ও উত্তরখণ্ডী দলকেও পেতে পারে। বামফ্রন্টের মোকাবিলায় কংগ্রেসের এই গোপন ব্লু প্রিন্ট যদি সফল হয় তাহলে কংগ্রেসীরা আশা করছেন রাজ্যের ৪২ টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে তিরিশটিতেই কংগ্রেস জয়পতাকা ওড়াতে সক্ষম হবে।

আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের সব থেকে বড় সাফল্য আসবে যদি বামফ্রন্টের মধ্যেকার অনৈক্যকে কংগ্রেস কাজে লাগাতে পারে। প্রকাশ্যেই এখন সি.পি.এমের সঙ্গে বামফ্রন্টের অন্য তিন শরীকের হাড়্ডাহাড়্ডি লড়াই এর সম্পর্ক। এই তিন শরীক হল আর.এস.পি, ফরোয়ার্ড ব্লক আর সি.পি.আই। প্রকাশ্য পাবলিক মিটিং এ এই তিন শরীকের নেতারা মন্ত্রী হয়েও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে বিবৃতি ও মিছিল মিটিং এর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বেঙ্গল ল্যাম্পকে নিয়ে জ্যোতি বসু ও যতীন চক্রবর্তীর বিতর্ক এখন তুঙ্গে। জঙ্গী কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখার্জির ভাষায়, বামফ্রন্টে এখন আর কোন ঐক্য নেই। নিচুতলায় এরা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরস্পর পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। আগামী নির্বাচনে আমরা অবশ্যই এ ব্যাপারটি কাজে লাগানোর কথা ভাবব। দেখছেন তো ইতিমধ্যেই তার কিছু কিছু কাজ শুরুও হয়ে গেছে। মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের জবরদস্ত সি.পি.আই.সাংসদ নারায়ণ চৌবের স্ত্রী গৌরী চৌবে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। আগামী দিনে সি.পি.এম শরীকদের উপরে আগ্রাসী মনোভাব যত বাড়াবে তত ওইসব তিতিবিরক্ত শরীক দলগুলির কর্মীরা কংগ্রেসে ভিড় জমাবে।

এটা খুবই সত্যি সর্ব ভারতীয় প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসের অবস্থা যাইহোক পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে এখনও খুব শক্তিশালী বলা যাবে না। দলে ঐক্যের অভাব। তবে যদি সামগ্রিক ঐক্য নাও হয় তবু যদি প্রিয়রঞ্জন, সুব্রত মুখার্জি এবং সোমেন মিত্র যদি এক হন এবং মমতা ব্যানার্জি ও গণিখান চৌধুরীর ইমেজকে কাজে লাগাতে পারেন, তাহলেই নির্বাচনী ফলাফলে তার অনুকূল প্রভাব পড়া অসম্ভব নয়।

তবে অনেকেই বললেন, নির্বাচনের প্রাক্কালে এই তিন নেতাকে স্মরণ রাখতে হবে সত্তর দশকের দিনগুলিতে সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে কংগ্রেসী মাসলম্যানরা তামাম শহরাঞ্চল দাপিয়ে কংগ্রেসের ইমেজকে যেভাবে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল—এবারেও তার পুনরাবৃত্তি হলে তার প্রতিক্রিয়াও বিরূপ হতে বাধ্য।

রমাপ্রসাদ ঘোষাল

রাজকন্যাকে হাওয়া করছে দুই 'সহচরী'!

স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা…!

আপনি কি আপনার স্বপ্নকে সফল করতে চান? চান রাজকন্যা, প্রধানমন্ত্রী, নায়ক বা বিশ্ববিখ্যাত কেউ হতে? জিম স্যাভাইলকে লিখুন।

পোশাক পরিচ্ছদে ভারতীয় রাজকন্যা হওয়া। এটা তার কাছে ছিল স্বপ্ন। এগারো বছরের শেফালি তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য জিমকে চিঠি লিখেছিল। জিম স্যাভাইল। বিবিসি–র দুই নম্বর চ্যানেলের একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব। নিজেদের ইচ্ছা বা স্বপ্ন পূরণ করার জন্য জিমকে বছরে যারা প্রায় সাড়ে তিন লাখ চিঠি দেয়, তাদের মধ্যে নির্বাচিত কিছু স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে জিম তাঁর পরিচিত টি ভি প্রোগ্রাম 'জিম উইল ফিক্স ইট' (জিম এর ব্যবস্থা করে দেবে) ১৯৭৫ থেকে করে চলেছেন। শেফালিও তাদের মধ্যে একজন।

শেফালি নিজের ইচ্ছা জানিয়ে চার বছর আগে জিমকে চিঠি লিখেছিল কিন্তু সে তার কোন উত্তর পায়নি। কিন্তু নিরাশ হয়নি শেফালি। আবার জিমকে চিঠি লিখেছে সে। এভাবেই সে জিমের নজরে আসে এবং জিম ছাড়াও ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট অফিস, এয়ার ইণ্ডিয়া এবং ওয়েলকাম গ্রুপের সাহায্যে শেফালির ইচ্ছা পূরণ হয়।

রাজকীয় আতিথেয়তার মধ্যে তাকে
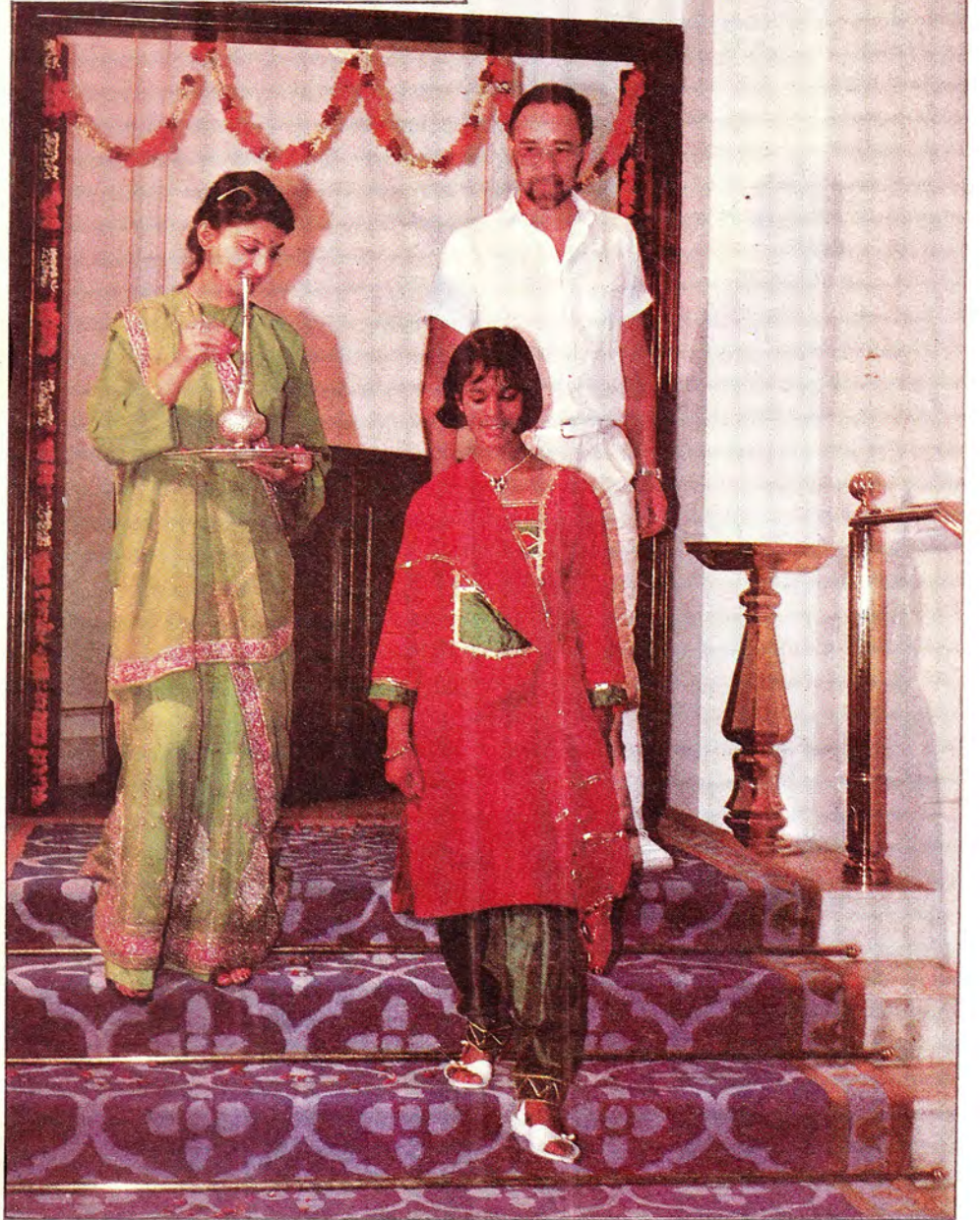
রাজকন্যা এলো…

ভারতবর্ষে স্বাগত জানানো হয়েছিল দিল্লির পাঁচতারা হোটেল মৌর্য শেরাটনের 'দম পোক্ত' রেস্তোরাঁয়। লাল ও সবুজ সালোয়ার কামিজে ধীর পায়ে হেঁটে যাওয়া শেফালিকে ছবির মত লাগছিল। তার শরীরে স্পটলাইটের আলো। তার মধ্য বি বি সি–র ক্যামেরা তার ক্রুরা তাকে ঘিরে রয়েছে। একটা বিজয়িনীর হাসি তার ঠোঁট ছুঁয়ে ছিল, তার চোখ আশপাশের সমস্ত কিছুকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। সিঁড়ির স্তম্ভগুলি, সিঁড়ির রেলিং সমস্ত গাঁদা ফুল দিয়ে সাজানো ছিল। মেঝেতে ছড়ানো ছিল গোলাপের পাপড়ি। রেস্তোরাঁর প্রবেশের মুখে যে সমস্ত মহিলারা দাঁড়িয়ে ছিলেন, 'রাজকন্যা' তাদের দিকে জড়তা নিয়ে তাকাল। তাদের মুখের বিস্মিত ভঙ্গীতে সে নিজেকে আবিষ্ট অনুভব করলো। মহিলারা যারা এই অনুষ্ঠানের জন্যই লাল উড়নি, ঘাঘরায় আর অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে তার অপেক্ষা করছিলেন, তাঁরা তাকে গোলাপ ও রূপোর আতরদানি থেকে আতর ছড়িয়ে স্বাগত জানালেন ফেলে আসা দিনগুলির মতো।

আহারে বসছে রাজকন্যে

এক সুদৃশ্য, লাল মখমলে সাজানো সিংহাসন তার জন্য রাখা ছিল। সিংহাসনের উপরে একটি বাজ ছত্র, তাতে জরির কাজ করা ও গাঁদাফুলের মালা ঝোলানো। ক্রীম রঙের ভূপালি কুর্তা চুড়িদার ও দোপাট্টায় সেজে থাকা দু'জন মহিলা তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। তাদের হাতে অলংকৃত হাত পাখা। 'রাজকন্যা' যখন লাঞ্চ করার জন্য বসল তাকে রুপোর থালায় সাজিয়ে পরিবেশন করা হল। তার বাবা বসলেন তার ডান দিকের আসনে।

শেফালির জন্ম বাংলাদেশে। দু'বছর বয়সে তাকে জন বেটস এবং তাঁর স্ত্রী এ্যান্ডি বেটস দত্তক হিসেবে নেন। তারা উত্তর ইংল্যান্ডের শর্পশায়ারের টেলফোর্ড কলেজের সোসাল ওয়ার্ক–এর অধ্যাপনা করেন। তাঁরা এক সুইস এজেন্সির মাধ্যমে শেফালিকে দত্তক নিয়েছিলেন। বড় হবার পর শেফালি এর আগে আর কখনো ভারতে কিংবা বাংলাদেশে আসেনি। ছেলেবেলা থেকেই সে রাজা, মহারাজার অনেক গল্প শুনেছে। এবং নিজেও রাজকন্যা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে।

'তুমি বিলিতি রাজকন্যে হওয়ার কথা ভাবোনি কেন? প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলে শেফালি–'আমার মনে হয় ভারতীয় রাজকন্যারা অনেক বেশি সুন্দর।' হবি হিসেবে শেফালির সাঁতারে সব থেকে বেশি আগ্রহ। বড় হয়ে সে চায় একজন নার্স হিসেবে ভারতে ফিরে আসতে। ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে কিনা জানতে চাইলে শেফালি বলে–'না। কিছু বছরের জন্য ভারতে থেকে তারপর আবার ইংলণ্ডে চলে যাবো।'

'ভারতে তুমি যা যা দেখেছ সবকিছু তোমার ভালো লেগেছে?' প্রশ্ন করলে শেফালি বলে–'হ্যাঁ সব কিছুই। শুধু কষ্ট হয়েছে পথে অনেক ভিখিরি দেখে।' শেফালির বাবা জন বেটসও ভারতবর্ষকে একটা অসাধারণ দেশ বলে ভাবেন। তিনি আশা করেন কিছুদিনের মধ্যে তিনি আবার তাঁর পরিবার নিয়ে এখানে বেড়াতে আসবেন।

জিম স্যাভাইল মারফত এপ্রিলে যখন শেফালি তার ভারত ভ্রমণের খবর পেয়েছিল সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছিল। তার আট বছরের বোন হান্নাকে সে তার আনন্দের খবর জানালে বোন হান্নাও তার সঙ্গে ভারতে আসতে চেয়েছিল কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সে যখন তার ভারতবর্ষ দেখার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করছিল তখন তার চোখে মুখেও সেই আনন্দের উল্লাস ফুটে উঠছিল।

ভারতবর্ষের কোন জিনিস তার বেশি পছন্দ হয়েছে? জিজ্ঞাসা করলে সে এক লহমায় বলে দেয় 'ভারতীয় গয়না আর শাড়ি'। রাজস্থানের মহারাজ গজ সিংহের অতিথি হয়ে শেফালি দিল্লি থেকে প্লেনে যোধপুর যায়। সেখানে 'উমেদ ভবন'–এ সে থাকে। তার বহুদিনের আশা তার স্বপ্ন সফল হয়ে যাবার পর 'ছোট্ট রাজকন্যা' আবার সাধারণ শেফালি হয়ে ঘরে ফিরে যায়।

–অরুন্ধতী গুপ্ত

ছবি: গিরীশ শ্রীবাস্তব
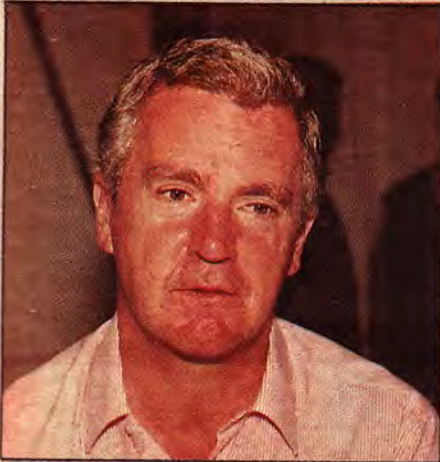
'জিম উইল ফিক্স ইট'!

বি বি সি–র দুই নম্বর চ্যানেলে 'জিম উইল ফিক্স ইট' খুবই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু করেছেন জিম স্যাভাইল ও রজার ওরডিশ। সোসাল ওয়ার্ক হিসেবে দর্শকদের সাহায্য করায় ছিল তাঁদের মূল আগ্রহ। শেফালির ভারত ভ্রমণের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের দর্শকদের আশা স্বপ্ন পূরণে এক আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন। তাঁরা 'জিম ফিক্সড ইট ফর মি' লেখা একটি ব্যাজ তাদেরকে উপহার দেওয়া চালু করলেন যাদের আশা আকাঙ্খা তাঁরা পূরণ করেছেন। শেফালিকেও একটা ব্যাজ উপহার হিসেবে দেওয়া হলে সেও সেটি তার গলায় পরে তার ভারত ভ্রমণের পর থেকে। এ ব্যাপারে রজার ওরডিশ বললেন, 'একবার আমাদের এক দর্শক যার স্বপ্নকে আমরা বাস্তবায়িত করেছি তিনি নিজের ইচ্ছাতেই মার্গারেট থ্যাচারের একটা ইন্টারভ্যু নিতে গেছিলেন। থ্যাচার তখন শুধু মাত্র একজন বিরোধী দলের নেত্রী। সাক্ষাৎকারীর গলায় 'জিম ফিক্সড ইট ফর মি' লেখা ব্যাজ লাগানো ছিল। থ্যাচার হঠাৎই তা খেয়াল করে সেটি পরবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাদের অনুষ্ঠানের কথা বলেন। পরের দিন সকালেই থ্যাচার জিমকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর প্রধান মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নকে সফল করে তুলতে অনুরোধ করেন। এরপর কিছুদিন পর থ্যাচার যখন ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হলেন তখন আমরা তাঁকে 'জিম ফিক্সড ইট ফর মি' লেখা ব্যাজ উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দিই এবং তিনি সেটি গলায় পরে নেন।

এতদিনে আপনার ত্বক হাঁপ ছেড়ে বাঁচল!

নতুন
কেয়ো-কার্পিন
অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম

লক্ষ করেছেন কি, আপনি যে অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীমটি ব্যবহার করছেন তাতে ত্বকের উপর একটা আঠালো চটচটে প্রলেপ পড়ে ? এর ফলে রোমকূপের মুখ যায় বন্ধ হয়ে। অথচ আধুনিক ত্বক পরিচর্যার গোড়ার কথা রোমকূপের মুখ খোলা রাখা। তাই 'স্টীমিং' ও 'ফেসিয়াল'-এর এত চলন। আর ঐ একই কারণে আঠালো চটচটে ক্রীম ব্যবহার না করাই ভাল। কারণ রোমকূপের মুখ বন্ধ থাকলে, ত্বকের দম যেন বন্ধ হয়ে আসে।

নতুন কেয়ো-কার্পিন অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম ঃ সেইজন্যেই দে'জ মেডিক্যাল বার করেছেন নতুন কেয়ো-কার্পিন অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম। এতদিনে আপনার ত্বক হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

এতে আঠালো চটচটে ভাব নেই ঃ তাই সহজেই এই ক্রীমটি ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ত্বক সুরক্ষিত রাখে। চটচটে নয় বলে এই ক্রীমটি আপনি ঘরে-বাইরে সব সময়েই ব্যবহার করতে পারবেন। ফলে রোদ জল থেকে আপনার ত্বক চব্বিশ ঘন্টাই সুরক্ষিত থাকবে। এবার দেখুন আপনার ত্বক কেমন স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভরে ওঠে।

আয়ুর্বেদিক ক্রীম ঃ উপরন্তু আয়ুর্বেদিক উপাদানে তৈরি বলে কেয়ো-কার্পিন অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম ব্রণ ও সাধারণ কাটা-ছড়া-পোড়ায় বেশি ভাল কাজ দেয়। শিশুর কোমল ত্বককে র‍্যাশের জ্বলুনি থেকে আরাম দিতে এটি অদ্বিতীয়। আয়ুর্বেদিক ক্রীম বলে এর নিয়মিত ব্যবহারে ত্বক থাকে সতেজ। তাই অসময়ে মুখে বলিরেখা পড়ে না। আর এটি মেখে রোদে বেরোলেও রঙ ময়লা হয় না। একবার ব্যবহার করেই দেখুন। আপনি ও আপনার ত্বক দুজনেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন!

TSAC-DMAC:IBEN

এখন হরলিক্স
অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম সহ

"অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য সুস্বাস্থ্য।"

হরলিক্স এখন অতিরিক্ত ক্যালসিয়ামে সমৃদ্ধ– বাড়ন্ত বাচ্চাদের শক্ত দাঁত আর মজবুত হাড়ের জন্য এবং পুরো পরিবারের সুস্বাস্থ্যের জন্য যা অত্যন্ত জরুরী। গর্ভবতী মহিলা ও স্তন্যদায়িনী মায়েদের জন্য আবশ্যক অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম যোগাতে সাহায্যও করে।

হরলিকস্ প্রাকৃতিক সব প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানে ভরপুর – প্রোটিন, ভিটামিন্স, মিনারেল্স ও কার্বোহাইড্রেট্স যা দেয় শক্তি, উদ্যম ও সজীবতা। আর এখন অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম, অর্থ পরিপূর্ণ সুস্বাস্থ্য।

পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়

HTA 6038 BEN

কৃতী ছাত্র হত্যার তদন্তে গাফিলতি কেন?

কোন্নগর রেলস্টেশনের কাছে কৃতী ছাত্র অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, এর আগে নরেন্দ্রপুর, ডানকুনি ও পাণ্ডুয়া রেলস্টেশনেও কয়েকজন কৃতী ছাত্রকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ত্রিকোণ প্রেম ও আত্মহত্যার নামাবলী চাপিয়ে এইসব নির্মম হত্যাকাণ্ডগুলির তদন্তে কেন দীর্ঘসূত্রতা? কেনই বা গাফিলতি?

ছবি: কাজী আবদুল মোহিত
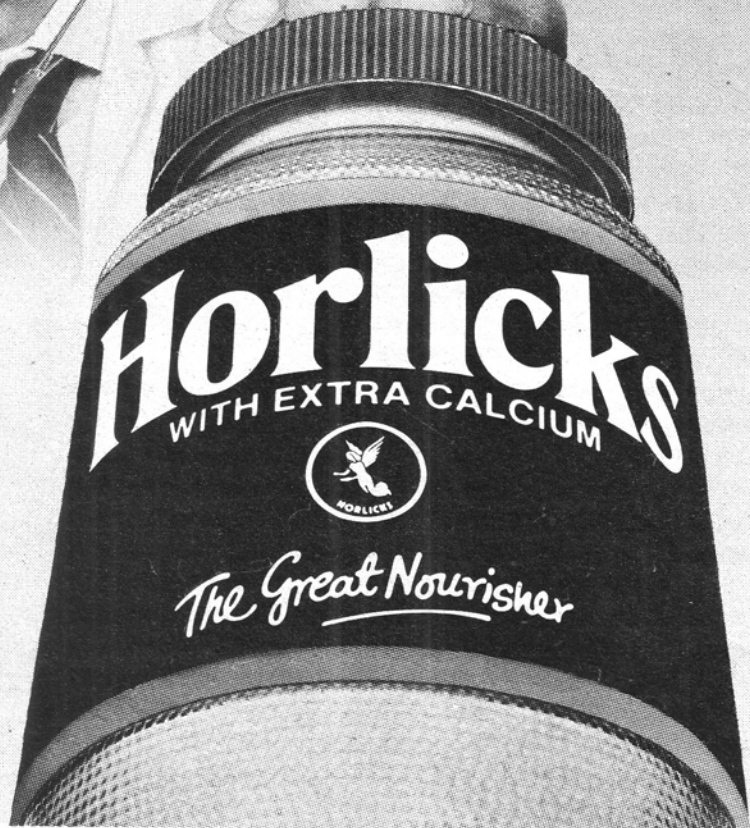
অভিজিতের মা পুতুলদেবী: 'পুলিশি তদন্তে গাফিলতি রয়েছে।'

আচমকা হুইশল বাজিয়ে ভোরের প্রথম মেলট্রেনটি লাইন কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল। ভারী গর্জনে রেলস্টেশন থরথর করে কেঁপে ওঠে। মেন লাইনের আশপাশ এখনও জেগে ওঠেনি। ভোরের আলো ফোটবার পরেই একে একে সকলে এসে প্ল্যাটফর্মে জমায়েত হয়।

কিছুক্ষণ পর রেলস্টেশনে হঠাৎ শোরগোল ওঠে। কয়েকজন ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল যে ওপাশের রেললাইনে একটি সুবেশ যুবকের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

ব্যাপারটা কানে এসে পৌঁছতেই প্ল্যাটফর্মে জমায়েত হওয়া লোকজনেরা হুড়মুড় করে ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছয়। প্ল্যাটফর্মের পঞ্চাশ গজের মধ্যে চিত হয়ে পড়ে রয়েছে ২৭ বছরের অজ্ঞাত পরিচয় একজন যুবকের মৃতদেহ। পরনে দামি শার্ট, ট্রাউজার। চোখে চশমা। কান এবং চোয়াল বরাবর আঘাতের চিহ্ন। আপাত চোখে মনে হয় ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে পড়েছে যুবকটি। সম্ভবত আত্মহত্যা।

স্থান কোন্নগর রেলস্টেশন। সকাল ছ'টা পনের।

মৃতদেহটির খবর গিয়ে পৌঁছল স্টেশন

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়: মেধাবী তরুণের মর্মান্তিক পরিণতি — ছবি: কাজী আবদুল মোহিত

মাস্টারের ঘরে। সেখান থেকে এই অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের বিবরণ পৌঁছে যায় রেল পুলিশে। সংশ্লিষ্টমহল সক্রিয় হয়ে উঠল। মৃতদেহটি নিয়ে আসা হল মর্গে। শুরু হল অনুসন্ধান। কে এই সম্ভ্রান্ত অজ্ঞাত পরিচয় যুবক? কি তার পরিচয়?

ব্যাপক অনুসন্ধানের পর হুগলী পুলিশ জানতে পারে এই অজ্ঞাত পরিচয় মৃতের বাড়ি বেহালার রয়েড পার্কে। নাম—অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়। পেশায় ইঞ্জিনিয়র এই যুবকটি কাজ করত আলিপুরের একটি কারিগরী সংস্থায়। পড়াশুনোয় অত্যন্ত মেধাবী অভিজিৎ-এর শীগগিরই জার্মানী যাবার কথা ছিল।

অভিজিৎ-এর মৃতদেহ সনাক্ত হবার পর তদন্ত করার ভার পড়ে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশান ডিপার্টমেন্টের অধীনে। ভবানীভবনের এই দপ্তর অনুসন্ধানে নেমে এটিকে নিছকই আত্মহত্যার ঘটনা বলে বর্ণনা করেন। এবং এটি প্রেমঘটিত ব্যাপার বলে প্রাথমিক রিপোর্টে জানান। রিপোর্টে তারা স্পষ্টই জানান যে মানসিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে অভিজিৎ মৃত্যুকেই বেছে নেয়। এর পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

অভিজিৎ-এর পারিবারিক ব্যাকগ্রাউণ্ডের একটু বর্ণনা দেওয়া যাক। পিতামহ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বাংলা শিশুসাহিত্যের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। বাবা মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় উত্তর কলকাতার জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যাপক। সেই সঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত।

মেধাবী অভিজিৎ এর পড়াশুনো দক্ষিণ কলকাতার মালটিপারপাস স্কুলে। প্রথম থেকেই দারুণ রেজাল্ট করে আসছিল। মাধ্যমিকে সে দশম স্থান পায়। কলেজে এসেও ভাল ফল করে। এবং স্নাতক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়। তারপর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র হিসেবেও সাফল্যের স্বাক্ষর রাখে। অতঃপর চাকরি পেয়ে যায়। নিজস্ব দক্ষতাতে কোম্পানীতেও ক্রমান্বয়ে উন্নতি করতে থাকে অভিজিৎ।

অভিজিৎ-এর এই রহস্যজনক মৃত্যুকে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন বিভাগ আত্মহত্যা বলে অভিহিত করলেও জনমানসে তীব্র সন্দেহ দেখা দিতে থাকে। আর পুলিশের আরোপিত এই বিশেষণকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না চ্যাটার্জি পরিবার। তাঁদের বক্তব্য, যদি এটি সত্যিই আত্মহত্যার ঘটনা হয়ে থাকে তবে তাঁর কান ও পাশ্ববর্তী চোয়াল দু'টিতে ভারি কিছু দিয়ে থেতলে দেওয়ার আঘাত এল কি করে? তাঁদের প্রশ্ন, ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিলে একদিকে আঘাতের চিহ্ন লাগা স্বাভাবিক। তাহলে দু'দিকে আঘাতের চিহ্নই বা হল কিভাবে?

বেহালার রয়েড পার্কের বাড়িতে মৃত অভিজিৎ-এর মা শিক্ষিকা পুতুল চট্টোপাধ্যায় এর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে রীতিমত অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হয় এই প্রতিবেদককে। আলোকচিত্রীকেও বারংবার নানা জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে পুতুলদেবীকে শান্ত করা হয়। পুতুলদেবীর কথা অনুযায়ী, অভিজিৎকে হত্যা করা হয়েছে। আর এর পেছনে রয়েছে একটি শক্তিশালী চক্র। পুতুলদেবীর অভিযোগ, পুলিশ বারবার তা চেপে দেবার চেষ্টা করছেন।

পুতুলদেবীর বক্তব্য অনুযায়ী, এই খুনের পেছনে দুটি কারণ থাকতে পারে। অভিজিৎ নাকি

পাণ্ডুয়া রেলস্টেশন: এখানেই পাওয়া গিয়েছিল সঞ্জীব-তীর্থংকরের মৃতদেহ

একটি কম্প্যুটার ফর্মূলা আবিষ্কার করেছিল। অন্তর্মুখী স্বভাবের ছেলে ছিল অভিজিৎ। নিজের মনের কথা কাউকেই ঘুণাক্ষরে জানতে দিত না। বেশ কিছুদিন ধরে সে নাকি গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটি ফর্মূলা নিয়ে কাজ করছিল। এ ব্যাপারটি সে তার মাকেও জানায়নি। বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে অবশ্য এ নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করত। পুতুলদেবী জানালেন, ছেলের এই আচরণে তাঁর মনে কিরকম যেন সন্দেহ জাগে।

'একদিন হঠাৎ অভিজিৎকে খুব খুশি দেখাচ্ছিল। আমাকে বলল মা আমি বিদেশে যাব। ভিসা পাসপোর্টের ব্যবস্থা হলেই আমি বিদেশে চলে যাব। তারপর আমাকে বলল—তুমি কিছু চিন্তা করবে না। আমি বিদেশে গিয়ে দেখবে কি করি। তুমি খুব অবাক হয়ে যাবে। ছেলের কথা শুনে আমারও খুব আনন্দ হলো।'

'অভিজিৎ ভাল গান গাইতে পারত। নাচতে জানত চমৎকার। মেধাবী বলে খ্যাতি ছিল ওর। আমি অনুমান করেছিলাম--ও কিছু একটা ফর্মূলার সমাধান করছে। বোধহয় কম্পিউটারের কোনও জটিল ফর্মূলা। মাঝে মাঝেই বলত,—এ দেশ আমাকে বুঝবে না। জার্মানীতে গেলে আমি ঠিক দাম পাব দেখো। ভীষণ অভিমানী হয়ে উঠেছিল ও।'

অভিজিতের মা পুতুলদেবী সন্দেহ প্রকাশ করেন, 'আসলে ওর গোপন কম্পিউটার ফর্মূলার জন্যও অভিজিৎ খুন হতে পারে। ও বলত, মা আমার বড় ভয় করছে। আমাকে সত্যিই ওরা মেরে ফেলবে না তো? এর বেশি কিছু বলত না।'

কিন্তু এই পরিস্থিতির চেয়ে সম্প্রতি গড়ে ওঠা একটা ঘটনাও সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। অভিজিত চাকরি করত একটা কারিগরী সংস্থায়। সেখানে নাকি সম্প্রতি কোটি টাকার তছরূপ হয়। এছাড়া শেয়ারেরও গণ্ডগোল চলছিল। পুতুলদেবী জানান, ওই সংস্থা তাকে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে রাখতে চাইছিল। শেয়ার নিয়েও ওর এক বন্ধুর সঙ্গে মন কষাকষি হয়। সংস্থার অনেকেই নাকি অভিজিৎকে সুনজরে দেখছিল না। সংস্থার একটি শাখা আছে বেলুড়ে। অভিজিৎ-এর মৃতদেহ পাওয়া যায় কোন্নগরে। ওই স্টেশনটি বেলুড়ের নিকটবর্তী।

পুতুল দেবীর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে অনুমান করা যায়, অভিজিৎ-এর মৃত্যু নেহাৎই আত্মহত্যা নয়। এর পেছনে অন্য কোন কারণ থাকতেও পারে। অভিজিতের ঘনিষ্ঠদের বক্তব্য এই মৃত্যুকে পুলিশ যতই আত্মহত্যা বলুক না কেন এটি আসলে খুনই। পুতুলদেবী আরও অভিযোগ করলেন, পুলিশ তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না। পুলিশের প্রথম দিনের বক্তব্য হল, এটি সাদামাটা আত্মহত্যা। তৃতীয় দিন তারা জানালেন এর পেছনে ত্রিকোণ প্রেমের ঘটনা রয়েছে। কিন্তু ত্রিকোণ প্রেমের ঘটনা হলে সে সম্বন্ধে বন্ধুবান্ধব বা বাড়ির লোকজন জানতে পারত নিশ্চয়ই। পুলিশের এই বক্তব্য সম্পর্কে পুতুলদেবীর বক্তব্য, অভিজিতের বিয়ের সম্বন্ধ দেখা হয়ে গিয়েছিল, সে আপত্তি করেনি। সামনের শীতে তার বিয়ে হবার কথা। পাকাপাকিও হয়ে গিয়েছিল।

এই হত্যার পিছনে কারা আছে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনও ধারণা না দিতে পারলেও অভিজিতের মা জানান, খুন হবার পরের দিন প্রথম রাতে বেশ কয়েকজন রাতের অন্ধকারে জোরালো টর্চের আলো ফেলে বাড়িতে। পুতুলদেবী চিৎকার করে উঠলে আততায়ীরা পালিয়ে যায়। রাতে কিছু হয়নি, কিন্তু তৃতীয় রাতে আততায়ীরা আবার নাকি একই ঘটনা ঘটায়।

পুলিশের তদন্তের গাফিলতির অভিযোগ এনেছেন অভিজিতের মা ও বাবা, পুতুলদেবী ও মনোরঞ্জনবাবু। তাঁদের বক্তব্য, পুলিশ কিছুতেই তাদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাদের বক্তব্য, ঠিকঠাকভাবে তদন্ত করলে আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে। এই তদন্তের ব্যাপারে এই প্রতিবেদক টেলিফোনে কলকাতা পুলিশের কমিশনার বি.কে সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান বিষয়টি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার এস.আই.এস.আহমেদের অধীনে রয়েছে। এই প্রতিবেদক তখন তাকে জানান যে উক্ত ডেপুটি কমিশনার জানিয়েছেন যে এটি তাঁর এক্তিয়ারে নেই, এটি বেঙ্গল পুলিশের অধীনে। পশ্চিমবঙ্গ

পুলিশের সদর দপ্তর থেকেও কিছু জানা যায় না। শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ করা হয় ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশান ডিপার্টমেন্টে। সেখান থেকে জানানো হয় যে বিষয়টি তদন্তাধীন। এ বিষয়ে এখনই কিছু বলা যাবে না।

বেশ কয়েক বছর ধরেই এই ধরনের কৃতী ছাত্র হত্যার বেশ কয়েকটি ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। ১৯৮২ সালে সঞ্জীব–তীর্থংকর হত্যা মামলা এমনই একটি চাঞ্চল্যকর উদাহরণ। হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া রেল স্টেশনে কৃতি ছাত্র সঞ্জীব ও তীর্থংকরের মৃতদেহ পাওয়া যায়। এই রহস্যজনক হত্যাকাণ্ডের-র তদন্তে নেমে পুলিশ এটিকে আত্মহত্যা বলে অভিহিত করে। বক্তব্য,

ছবি: কাজী আবদুল মোহিত

অভিজিতের বাবা মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিল দুইজনে। তাকে না পাবার ফলে তারা একইসঙ্গে আত্মহত্যা করে।

কিন্তু পুলিশের বক্তব্যকে সংশ্লিষ্ট মানুষজন মেনে নিলেন না। নানা মহলে শুরু হল গুঞ্জন। তাদের অভিযোগ, তাদের সুপরিকল্পিত উপায়ে খুন করা হয়েছে। এরপর আনন্দবাজার পত্রিকার উদ্যোগে প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা সিক্রেট আই-এর দেবব্রত ধর তদন্ত শুরু করেন। তদন্তে নেমে দেবব্রতবাবু বুঝতে পারেন এটি আদতেই আত্মহত্যার কেস নয়। এর পিছনে একটি পরিকল্পিত চক্রান্ত। তাঁর এজেন্সীর অনুসন্ধান মোতাবেক জানা গেল, এই খুনের পিছনে জড়িত রয়েছে একটি চক্র। সঞ্জীব ও তীর্থংকরের ছিল গোয়েন্দা বই পড়ার নেশা। শিশুসুলভ মনোবৃত্তির শিকার হয়ে তারা স্থানীয় একটি পরিবারের অবৈধ কালা কারবারের গোপন খবর জানতে পারে। ওই পরিবারটি নোট জাল করা থেকে আরও নানা ধরনের বেআইনি কাজ করত।

দেবব্রতবাবু জানান, একটি সূত্র আচমকা সঞ্জীব তীর্থংকরের এই গোয়েন্দাগিরির খবর তাদের জানিয়ে দেয়। এই ব্যাপারটি জানবার পর সঞ্জীব ও তীর্থংকরের ওপর গোপনে ওয়াচ রাখে। তারপর একদিন তাদের ফুসলিয়ে গাড়িতে তোলা হয়। গাড়িতে তোলার আগে দু'জনকে এনসথেশিয়া দিয়ে সংজ্ঞাহীন করা হয়। ভোরের আগে তাদের রেললাইনে অচেতন অবস্থায় শুইয়ে দেয় আততায়ীরা। ট্রেন তাদের গলার উপর দিয়ে চলে যায়। আপাত চোখে মনে হয় এটি আত্মহত্যা।

এই যুগল হত্যারহস্য নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে কম বিপাকে পড়তে হয়নি। পুলিশী তদন্তের বিরুদ্ধে মামলা হলে, সরকার হাইকোর্টে যান। সেখানে তারা পরাজিত হবার পর সুপ্রীম কোর্টে গেলে সিঙ্গল বেঞ্চ সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেন। সরকারের নিজস্ব অফিসারদের নিয়ে একটি তদন্তকারী টিমও তৈরি করেন। তারা রিপোর্ট দেন এটি আত্মহত্যার ঘটনা নয়, কিন্তু তারপর আর অনুসন্ধান এগোয়নি।

> *সঞ্জীব ও তীর্থংকরের ছিল গোয়েন্দা বই পড়ার নেশা। শিশুসুলভ মনোবৃত্তির শিকার হয়ে তারা স্থানীয় একটি পরিবারের অবৈধ কালা কারবারের গোপন খবর জানতে পারে। ওই পরিবারটি নোট জাল করা থেকে আরও নানা ধরনের বেআইনি কাজ করত।*

কৃতী ছাত্র খুনের তালিকাতে সোহম সেনের হত্যা রহস্যও রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতী ছাত্র সোহম সেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল শান্তনু। মধুছন্দা নামের জনৈকা তরুণীর প্রেমে পড়ে দুজনেই। দুই বন্ধুর মধ্যে পড়াশুনো নিয়েও রেষারেষি চলে। অভিযোগ, শেষপর্যন্ত নাকি এই ত্রিকোণ প্রেমেরই বলি হয় সোহম। কলেজ ক্যান্টিনে খাবার অর্ডার দেয় সোহম। একটু পরেই আসছে বলে সোহম আর ফিরে আসে না। পরের দিন তার মৃতদেহ পাওয়া যায় ডানকুনি রেলস্টেশনের কাছের রেললাইনে। পুলিশ শান্তনুকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার হয় মধুছন্দাও। অনুসন্ধান চলতে থাকে। বর্তমানে এই কেসটি সুপ্রীম কোর্টে রয়েছে।

এই ধরনের কৃতী ছাত্র হত্যার পেছনে এই ত্রিকোণ প্রেমের ঘটনাই রয়েছে কিনা এই ব্যাপারটি নিষ্পত্তি এখনও না হলেও দেখা গেছে বিভিন্ন হত্যার পেছনে রয়েছে কোন শক্তিশালী চক্র। সম্প্রতি বাঘাযতীনের একটি ছাত্র রহস্যজনকভাবে মারা যায়। তাকে পাওয়া যায় নরেন্দ্রপুর রেলস্টেশনের রেল লাইনে। পুলিশের বক্তব্য, এটি আত্মহত্যার ঘটনাই। পুলিশ বারবারই এইসব রহস্যজনক মৃত্যুকে আত্মহত্যার ঘটনা বলে অভিহিত করে কেন? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায় সেই প্রচলিত ফর্মূলা ত্রিকোণ প্রেমের পরিণতি কিংবা প্রেমঘটিত অপরাধ। ফলত অনুসন্ধান মাঝপথেই শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু এইসব রহস্যজনক মৃত্যুর সব যে নিছক আত্মহত্যা নয়, এই সন্দেহ এখন অনেকেরই। এইসব তদন্তের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা যদিও আলাদা আলাদাভাবে এ ব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ তবে তাঁরা সাধারণভাবে তিনটি কারণ দেখিয়েছেন। এক, নারীঘটিত ঘটনা, দুই, ড্রাগ, তিন, কোন কালা কারবারে জড়িত ব্যক্তিদের স্বার্থে আঘাত। সিক্রেট আই এর দেবব্রত ধরের মতে, পারিবারিক
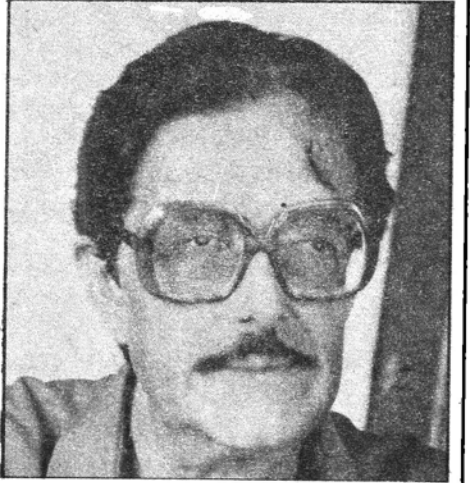
ছবি: অশোক মজুমদার

'সিক্রেট আই' সংস্থার প্রাইভেট ডিটেকটিভ দেবব্রত ধর।

অশান্তিও এর একটি কারণ আর ত্রিকোণ প্রেমের আত্মহত্যা যদিও অস্বাভাবিক নয়, বহুক্ষেত্রে খুনও ঘটে থাকে।

কৃতী ছাত্রদের হত্যার পেছনে পুলিশের তথাকথিত ঔদাসীন্য কেন ঘটে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন মহলের চাপের ফলে পুলিশ তদন্তে ঢিলেমি ঘটায়। এছাড়া প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক খুনের বা সংঘর্ষের ব্যাপারে পুলিশকে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাদের এসব ব্যক্তিগত স্তরের ব্যাপার দেখবার সময় কোথায়? এই খেদোক্তি শ্রী দেবব্রত ধরের। কিন্তু অভিজিতের মৃত্যু-রহস-এর জট এখনও ছাড়ানো যায়নি। তাই কৃতী ছাত্রদের খুনের পেছনে নারী কিংবা ড্রাগ বা কালা–কারবারের পাশাপাশি তাদের প্রতিভায় ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিদের হাতে প্রাণনাশের সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিতে পারছেন না অনেকে। ইদানিং কৃতী ছাত্রদের ড্রাগ চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। নেশার জন্য তারা সব কিছুই করতে রাজি। বহু অসামাজিক ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের সখ্যতা গড়ে ওঠে। আবার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল অপরাধীদেরও কাজে লাগায়। তাদের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত ঘটলেই নেমে আসে হত্যার ধারাল ছুরি।

মণিশংকর দেবনাথ

রাঁচীর পাগলা গারদে শুধু পাগলই নয়, অতীতের গ্লানি নিয়ে বসবাস করছে বহু সুস্থ নারী পুরুষ। সুস্থ হওয়ার পরও কেন ওরা আজীবন পাগলা গারদে বন্দী? কিভাবে ওরা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে? কয়েকটি করুণ বন্দী জীবনের প্রেক্ষাপটে সরকারি ভূমিকা বিশ্লেষণ করে সরজমিন রিপোর্ট করেছেন বিকাশ কুমার ঝা।

রাঁচীর পাগলা গারদ

চেতনাশূন্য মানুষের সুখ দুঃখের কি দাম আছে? তবুও চেতনাশূন্য মানুষের সচেতন কিংবা অবচেতন মুহূর্তে জমে থাকা গভীর দুঃখের কুয়োয় কে আর ওদের টানাপোড়েন দেখতে ঝঞ্ঝাট মাথায় নেবে। বিহারের রাঁচীতে 'মানসিক আরোগ্যশালা' তো এরই বাস্তবরূপ—সাক্ষাৎ নরক, যেখানে মানসিক রোগগ্রস্ত রুগীরা নিজেদের নির্মম ভাগ্যের নিয়তিকে সহজে স্বীকার করে নেয়।

রাঁচী মানসিক আরোগ্যশালায় গত সাড়ে তিন বছরে প্রায় সাড়ে চারশ মনোরোগী সঠিক চিকিৎসা ও খাদ্যের অভাবে আরোগ্যশালার ভেতরেই মারা গেছে। এর মধ্যেই ১৬৮ জন মহিলা মনোরোগী। ১৯৮৫তে ৬৩ জন পুরুষ মনোরোগী ও ৫১ জন মহিলা মনোরাগী। ১৯৮৭তে ৫২ জন পুরুষ মনোরোগী ও ২৯ জন মহিলা মনোরাগীর মৃত্যু তো ঘটেছেই এমন কি এ বছর অর্থাৎ ১৯৮৮–র জুন মাস পর্যন্ত ৪০ জন পুরুষ মনোরাগী ও ১৯ জন মহিলা মনোরাগীও মারা গেছে।

দেখা গেছে জীবনের হতাশ-নিরাসক্ত লোকেরা যখন চিকিৎসার জন্য রাঁচী মানসিক আরোগ্যশালায় পা রাখছে, মৃত্যু সেদিন থেকেই তাঁদের স্বাগত জানাচ্ছে। এই আরোগ্যশালায় ফাইলে অধিকাংশ মনোরাগীর মৃত্যুর কারণ—'রিফুয়্যজল অব ফুড'। আসলে এই সমস্ত ভাগ্যহীন রোগীদের অদৃষ্টে উচিৎ মাত্রায় খাবার নেই। বিহার সরকার এ সমস্ত রোগীদের খাবারের জন্য দৈনিক ১০ টাকা করে খরচ করার স্বীকৃতি দিলেও বাস্তবে পাঁচ টাকার বেশি খরচ হয় না! এই অল্প খাবারে রেগীরাই বা কিভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা করবে। আগে এই খাবারের জন্যে মাত্র ৩টাকা ৫৫ প: খরচ করা হত কিন্তু পরে হাইকোর্টের নির্দেশে বিহার সরকার তা দশ টাকা করে দেন। অবশ্য এই বৃদ্ধি কেবল কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ। এমন কি বিহার সরকার প্রতি বছর এই আরোগ্যশালায় দেওয়া সরকারি অনুদানও বাড়ান নি। ১৯৮৪–র ৫ সেপ্টেম্বর শত খানেক রোগী নিজেদের কষ্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আরোগ্যশালা থেকে চলে
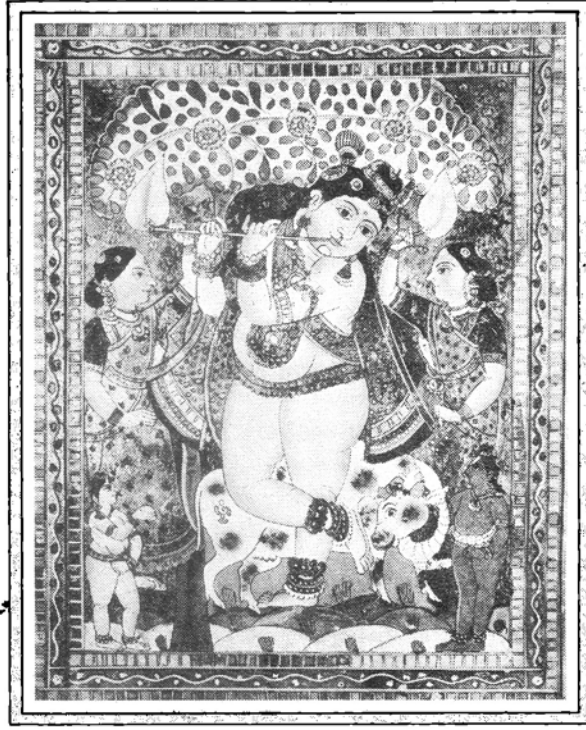
প্রায় ৪০০০ মন্দির
৪০টি স্নানের ঘাট
১৬০০ গোপিকার কাহিনী
আর অবশ্যই রাসলীলা।

মথুরা আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আপনি মাথাপিছু ১০ থেকে ৭৫ টাকার বিনিময়ে থাকার সুব্যবস্থা পাবেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই পাবেন এই মথুরায়। এই মথুরায় পাবেন থাকার সুব্যবস্থায়। মাথাপিছু ১০ টাকায় ডরমিটরিতে থাকুন বা ৭৫ টাকায় থাকুন বাতানুকূল কক্ষে, আর জপ করুন শ্রীকৃষ্ণের নাম, যা এখানকার প্রায় ৪০০০ মন্দিরে গুঞ্জিত হচ্ছে। ব্রজভূমিতে এমন রাখালের দেখাও আপনার মিলবে, যে হয়ত যাদববংশের উত্তপ্রজন্মের। মথুরা আর তার চারধারে আছে অনেক দর্শনীয় স্থান। বরষণা, গোকুল, রাধাকুণ্ড, বৃন্দাবন, নন্দগ্রাম এমনি আরও অনেক।
যে কোনও জায়গায়ই আপনি যান, যাত্রী নিবাস বা ট্যুরিস্ট বাঙ্গলোতে আপনার থাকার জায়গা সুনিশ্চিত।

আপনাকে একটি ধারণা দেওয়ার জন্য:

ট্যুরিস্ট বাংলো
বরষণা – ২০ শয্যার
(দিল্লি থেকে ১৯৫ কি·মি· দূরে)
ট্যুরিস্ট বাংলো
গোকুল •
ফোন–৪৩ – ২০ শয্যার
(দিল্লি থেকে ১৫৩ কি·মি· দূরে)
ট্যুরিস্ট বাংলো
সিভিল লাইনস
মথুরা ১৪ শয্যা
(দিল্লি থেকে ১৪৫ কি·মি· দূরে)
ট্যুরিস্ট বাংলো
রাধাকুণ্ড
(দিল্লি থেকে ১৬৯ কি·মি· দূরে)

বেরিয়ে পড়ুন, দেখুন স্বর্গীয় সুরলহরীর স্রষ্টার নিবাসস্থল। কান পাতলে হয়তো শুনতে পাবেন সেই বাঁশির সুর···
দিল্লি থেকে নিয়মিত কণ্ডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা আছে:
বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন:

উত্তর প্রদেশ ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লিমিটেড
চন্দ্রলোক
৩৬, জনপথ, নতুন দিল্লি–১১০০০১
ফোন: ৩৩২২২৫১
বা দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত উত্তর প্রদেশ সরকারের ট্যুরিস্ট অফিসগুলিতে।

F.N/XIII-96

অসহায় মানসিক রোগীরা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরই এক সহ-আবাসিকের মৃতদেহ

যায়।

মানসিক আরোগ্যশালার মোট ১,৫৮০ জন রোগীর মধ্যে ৮৭১ জন বিহারের, ৬০০ জন পশ্চিমবঙ্গের, ৯০ জন উড়িষ্যার, ৭ জন মিজোরামের, ৩ জন ত্রিপুরার এবং ৯ জন উদ্বাস্তুদের মধ্যে শয্যা সংরক্ষিত আছে। এই সমস্ত রোগীদের খাবারের জন্য বিহার সরকার ১৯৮৭-৮৮তে ২০ লক্ষ টাকার অনুদান দেন, কিন্তু আরোগ্যশালা কর্তৃপক্ষের মতে তা অতি নগণ্য। আরোগ্যশালায় খাবার সামগ্রী যোগান দেওয়া ঠিকাদারদের কাছে লাখ টাকা বকেয়া থেকে যাওয়ায় ঠিকাদারেরাও ঢিলেমি শুরু করে দেয়। এব্যাপারে আরোগ্যশালার অধীক্ষক বিহার সরকারের স্বাস্থ্য সেবা নির্দেশকের কাছে আর্থিক সংকটের লিখিত আবেদন করেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি। বর্তমান অধীক্ষকের বক্তব্য, প্রায় ৪০০ জন সুস্থ মানুষ এখনও আরোগ্যশালায় রয়ে গেছে। যাদের পরিবারের লোকেরা তাদের ফিরিয়ে নিতে নারাজ। বস্তুত এরাও আরোগ্যশালার বোঝা বাড়িয়ে চলেছে। পরিবারের উপেক্ষিত এইসব সুস্থ লোকেদের পুনর্বাসনের জন্যে বিহার সরকারের কাছে আরোগ্যশালার অধীক্ষক বহুবারই লিখিত অনুরোধ জানিয়েছেন কিন্তু উদ্যোগ বিভাগ কোন তোয়াক্কা করেন নি।

আরোগ্যশালার জন্যে বিহার সরকার ছাড়াও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য থেকে অনুদান আসার রীতি আছে। কিন্তু গত বেশ কয়েক বছর ধরে তা বকেয়াই পড়ে আছে। চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ থেকে তিন কোটি ৩৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪৬৩ টাকা,

বর্তমান অধীক্ষকের বক্তব্য, প্রায় ৪০০ জন সুস্থ মানুষ এখনও আরোগ্যশালায় রয়ে গেছে। যাদের পরিবারের লোকেরা তাদের ফিরিয়ে নিতে নারাজ। বস্তুত এরাও আরোগ্যশালার বোঝা বাড়িয়ে চলেছে।

উড়িষ্যা থেকে ৩১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭০০ টাকা, মিজোরাম থেকে ৬৬ হাজার ৯৪৭ টাকা, ত্রিপুরা থেকে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তুদের চিকিৎসার জন্য দু'লক্ষ ৯৮ হাজার ২৫১ টাকা ভারত সরকারের কাছে আরোগ্যশালার পাওনা। সেসবও বেশ কয়েক বছর ধরে পাওয়া যাচ্ছে না ঠিকঠাক। লাগাতার চেষ্টা চালিয়েও পুরোপুরি টাকা এখনও পাওয়া যায় নি।

মানসিক আরোগ্যশালায় যেসব রুগী নিরন্তর মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে তাদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, এমনকি আরোগ্যশালায় জীবিত রুগীদের মৃত বলে প্রমাণ পত্র পর্যন্ত দেখিয়ে দেন আরোগ্যশালার অফিসারেরা। এই প্রসঙ্গে বাহাদুর রামের কথা বলা যায়। হাজারিবাগ জেলার শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের এক কর্মচারী তিনি। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার দরুন তাঁর পরিবারের লোকেরা ২০ মে ১৯৮৭ এই আরোগ্যশালায় ভর্তি করে দেন। বাহাদুর রামের ভর্তি হওয়ার পর একমাসও হয়নি হঠাৎই আরোগ্যশালার অধিক্ষকের টেলিগ্রাম পৌঁছল বাহাদুর রামের বাড়িতে। টেলিগ্রামের খবর ছিল ৩১ মে ১৯৮৭ বাহাদুর রাম মারা গেছে। টেলিগ্রাম পেয়েই বাহাদুর রামের পরিবারের শোকার্ত আত্মীয়েরা রাঁচি মানসিক আরোগ্যশালায় পৌঁছল। খবর পেল ২ জুন বাহাদুর রামের অন্তেষ্টিও হয়ে গেছে। আরোগ্যশালার অধীক্ষক বাহাদুর রামের মৃত্যু-প্রমাণপত্রও তাঁর আত্মীয়দের হাতে তুলে দেন। শোকার্ত মন নিয়ে বাহাদুর রামের আত্মীয়েরা বাড়ি

ফেরেন। এরপরই হঠাৎ ১৬ই জুন ৮৭ বাহাদুর রামের একটি চিঠি আসে তাঁর বাড়িতে। মানসিক আরোগ্যশালা থেকে লিখেছেন তিনি, লিখেছেন, এই মানসিক আরোগ্যশালা একটি কারাগার, এখান থেকে যেন তাঁকে পরিবারের লোকেরা তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে যান। ফিরে আসা বাহাদুর রামের আত্মীয়েরা আবার আরোগ্যশালায় পৌঁছান। রাঁচীর কাঁকে থানায় এ ব্যাপারে একটি ডায়রি করে বাহাদুর রামকে তাঁরা আরোগ্যশালা থেকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

সম্প্রতি মানসিক আরোগ্যশালার এক প্রখ্যাত মনোচিকিৎসক আর·পি· সিনহা অনুসন্ধান চালিয়ে সরকারকে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। এই প্রতিবেদনে আরোগ্যশালার ব্যাপক দুর্ব্যবস্থার কথা লেখা ছিল। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী মনোরোগীদের খাবারের প্রতি কোন নজর দেওয়া হয় না, খাবারের অবস্থা খুব খারাপ, জলের অভাবে রোগীরা স্নান করতে পারেন না, শৌচালয়ের অবস্থাও সেইরকম, এমনকি মনোরাগীদের নাকি অপরাধীদের মতই দেখা হচ্ছে, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবও
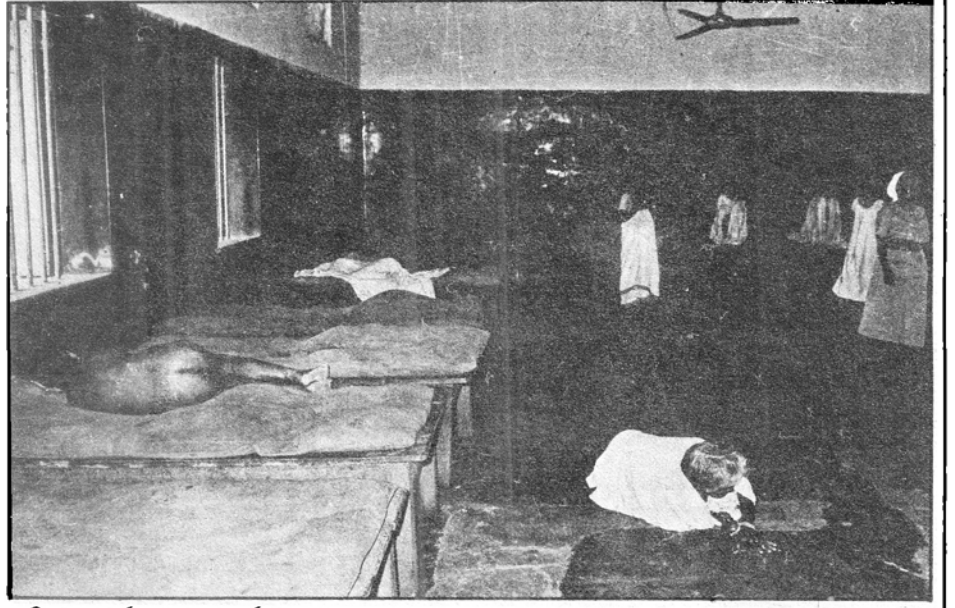
মহিলা ওয়ার্ডের ভেতরের দুর্দশা

এক দুঃখজনক ট্র্যাজেডি

প্রণব মুখার্জি, সুনীল দে কিংবা নৃপেন মজুমদার এবং পরেশ-এর মত লোকেদের সত্যি যে দুঃখ আছে তা সামান্য কথায় কিভাবে বলা যায়। এ এক এমন ট্র্যাজেডি যার জন্যে বিহার সরকার কিংবা মানসিক আরোগ্যশালার কর্তৃপক্ষ কেউই দায়ী নয়। এর জন্য দায়ী সমাজ আর পরিবারের হীন মানসিকতা যা নিজের প্রিয়জনকে, স্বজনকে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। রাঁচি আরোগ্যশালায় প্রণব, সুনীল, নৃপেন, সোমা দত্ত, কাজল এবং সারদাকে নিয়ে ৫০০র চেয়েও অধিক এমন লোক আছে যারা বছর খানেক আগেই সুস্থ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের আত্মীয়েরা তাদের স্বীকার করতে নারাজ। এমন কি, নিজের ভাই, মা, বাবার কাছ থেকে দূরে থাকার ব্যথায় ক্ষতবিক্ষত এমন লোকেরা কাকে দোষী ভাববে, কাকে কি বলবে!

আজ থেকে সতের সাল আগে ১৯৭০ এ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায় কলকাতার প্রণব মুখার্জিকে তাঁর বাবা অটল মুখার্জি এই মানসিক আরোগ্যশালায় ভর্তি করে দেন। কয়েক বছর পরেই প্রণব পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেন। আরোগ্যশালা কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে দেবার কথা লেখে। কিন্তু প্রণবের পরিবার তাঁকে স্বীকার করে নি। শেষ পর্যন্ত আত্মীয়দের কাছে পাগল প্রণব মানসিক আরোগ্যশালায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকা ছাড়া আর কোন রাস্তাই পেল না! অসুস্থ হওয়ার আগে প্রণব কলকাতার এক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের টাইপিস্ট ছিলেন। ১৯৫৪ সালে কলকাতার বঙ্গবাসী স্কুলে সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করার পর বঙ্গবাসী ইন্টার কলেজে ভর্তি হন। আর তখন থেকেই প্রণবের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। ওই সব দিনের কথা মনে করতে গিয়ে প্রণব বলে, 'আমাদের, পাশেই থাকতেন সরোজ ভট্টাচার্য ও মানা ভট্টাচার্য নামের দম্পতি। পাগল হয়ে গেছি এবং মাঝে মাঝে উলঙ্গ থাকি বলে তাঁরা প্রায়ই আমাকে উত্যক্ত করতেন। একদিন ওঁরা থানায় আমার বিরুদ্ধে কেস করেন আমি নাকি ওদের পরিবারকে ঝামেলায় ফেলেছি। পুলিশ ধরে নিয়ে যায় আমাকে, রাখে দমদম সেন্ট্রাল জেলে। পরে বাবা অবশ্য অনেক চেষ্টা করে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনেন। ছাড়া পাওয়ার পরেই পার্কস্ট্রীটের পার্ক কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে কাজ করতে থাকি। এরপর চেষ্টা করে কলকাতারই এক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে কাজ পেয়ে যাই। আমার অফিসের কাছেই মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে বাবা চেকিং ক্লার্কের কাজ করতেন। কেন জানি না সব সময় মনে হত বাবা আমার কোন সহকর্মীকে আবার আমার মানসিক বিভ্রান্তির কথা না বলে দেন। এই নিয়ে খুব আশংকায় থাকতাম। এরই ভয়ে হঠাৎ চাকরিটাও ছেড়ে দিলাম। কিছুদিন বাদেই খুব অসুস্থও হয়ে পড়লাম। ইলেকট্রিক শক্ দেওয়া হতো আর.জি.কর হাসপাতালে। এর মধ্যেই বাবা মারা যান। ঘরে ছোট ভাই ও মা। পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। আমাকে আমার পরিবারের লোকজন ঘরে রাখতে রাজি হয় না। বিধবা মা নিরুপায় ছিলেন। সেই সময় মা আমাকে এই আরোগ্যশালায় কিছুদিনের জন্য ভর্তি করে দেওয়ার কথা বলেন। সেই সময় হঠাৎই আমার অবস্থা আরও খারাপের দিকে গড়ায়। মা আমাকে রেখে যান এখানে। কয়েক বছর চিকিৎসার পর আমি সুস্থ হয়ে উঠি, এই হাসপাতাল থেকে বাড়িতে চিঠি যায়। আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু মা জানান, ভাই আমাকে ফিরিয়ে নিতে রাজি নয়। এরপর আমার আর কি করার আছে! বাবার কথা এখন খুব মনে পড়ে। তিনি বেঁচে থাকলে ভাই কি আমার সঙ্গে এমন করতে পারতো!' প্রণব বলেন, 'এ জন্যই বিয়ে করে নতুন ঘর বানানোর আশা আমার ছিল না। তাই এই আরোগ্যশালাই আমার স্থায়ী বাসস্থান হয়। টাইপ করা তো আমি আগে থেকেই জানতাম। এখানকার অফিসে মাসে টাইপ করেই দু আড়াই শো টাকা কামাতে পারি। খাবার তো এখান থেকেই পাই। অন্য কোন খরচ তো নেই। তাই এই টাকা আমি মায়ের নামে মনিঅর্ডার করে দিতাম। যাতে বৃদ্ধ মা শেষ বয়সে তীর্থভ্রমণ করতে পারেন। মা আমাকে একবার চিঠি দিয়েছিলেন, 'প্রণব, চোখ খারাপ, পয়সার অভাবে চশমা কিনতে পারছিলাম না। তোমার পয়সা পেয়েই কিনেছি।' মায়ের সেই চিঠি আমি পঞ্চাশবার পড়েছি। সেই তো আমার সুখ। মায়ের পাগল ছেলেও মাকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে কিছু অন্তত করতে পেরেছে। কিন্তু এই ছোট্ট সুখও ভাগ্যে ছিল না। কয়েকদিন বাদেই মা চিঠি দেন, আমি যেন আর পয়সা না পাঠাই। আসলে সেই পয়সা নিয়ে বাড়িতে খুব ঝামেলা হয়। তারপরই মায়ের নামে রাঁচির একটি ব্যাংকে টাকা জমিয়ে রাখি, কিন্তু এই টাকা আর কার কাজে লাগবে? আমার জীবন তো এই হাসপাতালেই একদিন শেষ হয়ে যাবে। এও জানি মা খুবই আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন কিন্তু আমি তো টাকা পাঠাতে পারি না। আমার পরিবার এই সুখও আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে'।

এতো গেল প্রণবের কথা কিন্তু সঞ্জীব দাশগুপ্তর মত অভাগারাও আছেন। আরোগ্যশালা থেকে সুস্থ হওয়ার পর হাসপাতালের এক কর্মচারীর সঙ্গে বাড়ি পাঠানো হয় তাঁকে। বাড়ি

২ জুলাই '৮৮ রাত ৯ টায় কোষাধ্যক্ষ অনন্তকুমারকে আরোগ্যশালার মধ্যেই গুলি করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী সন্ধ্যে ৫ টার পর আরোগ্যশালার প্রধান দরজার ভেতরে বাইরের কোন লোকই ঢুকতে পারে না। প্রধান দরজায় প্রহরীও ছিল। তবু অনন্তকুমারকে যে করেই হোক খুন করা হয়।

প্রকট।

এক খুনের ঘটনাকে ঘিরে এই আরোগ্যশালায় এখনও জল ঘোলা হয়ে চলেছে। গত ২ জুলাই '৮৮ আরোগ্যশালার কোষাধ্যক্ষ অনন্তকুমারের খুনের পরিপ্রেক্ষিতে গোটা আরোগ্যশালা টালমাটাল হয়ে পড়ে, সেইসঙ্গে এই জঘন্য হত্যাকে নিয়ে সন্দেহ জেগে ওঠে। প্রশ্ন হলো, এই কোষাধ্যক্ষ হত্যার পেছনে আসল রহস্য কি? মানসিক আরোগ্যশালায় টাকা তছরুপের আসল রহস্য খুলতে গিয়ে কি অনন্ত কুমার খুন হলেন?

২ জুলাই '৮৮ রাত ৯ টায় কোষাধ্যক্ষ অনন্তকুমারকে আরোগ্যশালার মধ্যেই গুলি করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী সন্ধ্যে ৫ টার পর আরোগ্যশালার প্রধান দরজার ভেতরে বাইরের কোন লোকই ঢুকতে পারে না। প্রধান দরজায় প্রহরীও ছিল। তবু অনন্তকুমারকে যে করেই হোক খুন করা হয়। দুই গার্ড মহম্মদ সালিম ও দেব বচ্চনকে রাঁচি পুলিশ এই হত্যার অজুহাতে গ্রেপ্তার করে। হত্যার কোন ক্লু যদিও পুলিশ এখনও খুজে পায়নি, তবু এই হত্যায় উত্তেজিত আরোগ্যশালার কর্মচারীদের কথা হলো—এই বছর আরোগ্যশালা ৩৪ লাখ টাকা সরকারের কাছ থেকে পেয়েছে। এই টাকা সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সরকার খাবারের মূল্য বৃদ্ধির জন্যে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই টাকা পাওয়ার সাত মাস পর রুগীদের খাবার সেই আগের অবস্থায়ই পৌছোয়! তবে কি ওই টাকা গায়েব করার চক্রান্ত চলছিল? ১৯৮৮-র এপ্রিল মাসে বিহার বিধান সভার এস্টিমেটস কমিটি আরোগ্যশালার দুরবস্থার তদন্ত করেন। কর্মচারী-দের অভিযোগ, এই তছরুপের পুরো ব্যাপার কোষাধ্যক্ষ হিসেবে অনন্তকুমারের জানা ছিল, তাই তাকে খুন করা হয়। কাঁকের বিধায়ক হরি রাম জানালেন, অনন্তকুমারের হত্যার ব্যাপারে জড়িত আছে আরোগ্যশালার নরকে জমে ওঠা ধান্দাবাজরা। হরি রাম বিধানসভায়ও এই প্রসঙ্গটি ওঠান।

মনোরোগীদের এই দুর্দশাময় সংসারে ব্যাপ্ত কুচক্রীদের বিলুপ্তি কবে হবে এর আশা হতাশ মনোরোগীরা ছেড়ে দিয়েছে। এ ব্যাপারে বোধহয় সুস্থমস্তিষ্ক মানুষদেরও সচেতন হয়ে ওঠা দরকার।

পৌছতেই সঞ্জীবের পরিবার তাঁকে নিতে নারাজ হয়। বচসার পর সঞ্জীবের পরিবার ঘরে রাখল বটে, কিন্তু পরিবারের উৎপীড়নের ফলে সঞ্জীব কিছুদিন বাদেই মারা যায়। মানসিক আরোগ্যশালায় এমন বহু সুস্থ হওয়া ব্যক্তিজীবনের করুণ কাহিনী লুকিয়ে আছে।

মানসিক হাসপাতালের এই দুর্বল, অব্যবস্থা নিয়ে বৃদ্ধ সুনীল দে'র অভিযোগে কি আসে যায়? আজ থেকে ২৫ বছর আগে সুনীল দে এখানে ভর্তি হয়েছিলেন। পূর্ব বাংলার ময়মনসিংহ জেলার সৈনবাড়ি গ্রামের অধিবাসী সুনীল দে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কিছুদিন বাদে মা, বাবা এবং ভাই বোন সঙ্গে নিয়ে কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকায় বসবাস শুরু করেন। ওই সময় বালিগঞ্জে সুনীলের দাদু থাকতেন। দাদুই সুনীলের পরিবারকে কলকাতায় আনার ব্যাপারে সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু জমিজমার ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন সুনীল, এবং জেলও হয়। তাতেই তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। তখন তাঁর আত্মীয়স্বজন তাঁকে রাঁচীর আরোগ্যশালায় ভর্তি করে দেন। সুনীলের বাবা ছিলেন পোস্টমাস্টার। তিন ভাই ও এক বোন ছিল তাঁর। কোনও নস্টালজিক মুহূর্তে সুনীল জানান, ছোট্ট বোনকে আজ অবদি ভুলতে পারেননি। 'আমার শরীর সামান্য খারাপ হলে সে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ত। জানি না সে আজ এই দুনিয়ায় আছে কি না'!

আজ থেকে দশ বছর আগে সুনীল সুস্থ হয়ে কলকাতা ফিরে যান। কিন্তু গিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন, যেখানে তাঁর পরিবার থাকত সেখানে তখন আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা। আশেপাশের লোকেদের মুখে সেই একই কথা—আমি নতুন এসেছি, কিছু বলতে পারছি না। হতাশ সুনীলের তারপর তো একটাই ঠিকানা—রাঁচীর মানসিক আরোগ্যশালা। তাই তিনি আবার রাঁচী ফিরে এলেন। সুনীল বলছিলেন, 'আমার ভাই ও অন্যান্য পরিজনেরা কোথাও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমার কাছে তাদের অস্তিত্ব তো শেষ হয়ে গেছে'।

৬০ বছর বয়েসি নৃপেন মজুমদারেরও এই একই কাহিনী। কলকাতার অমর স্ট্রীট-এ তাঁর পরিবার থাকতেন। কিন্তু সুস্থ হওয়ার পর নৃপেন কলকাতা ফিরে এসে দেখেন সেখানে কেউ নেই। পাড়াপড়শীরা বলেছিল ওরা কলকাতাতেই আছে কিন্তু কোথায় আছে কেউ জানে না। নৃপেন মজুমদার খোঁজার অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু এই মহানগরে তাদের টিকিও খুঁজে পান নি। এরপর তিনি আবার রাঁচীতে ফিরে আসেন।

মানসিক আরোগ্যশালার প্রখ্যাত মনোচিকিৎসক ডাঃ বি.বি. সিনহা বলেন, 'এদের মানসিক অবস্থা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারণে বিচলিত হয়েছে। এই রোগ কোন ছোঁয়াচে রোগ নয়। কিন্তু এই লোকগুলির দায় ওদের পরিবারকে তো নিতেই হবে। এখন দেখছি চিকিৎসায় সুস্থ হওয়ার পরও ওদের ভাই কিংবা নিকট আত্মীয়রা ওদের দায়িত্বকে স্বীকার না করে বরং ডেথ সার্টিফিকেট নেওয়ার চেষ্টা চালায়, কেননা এতে সম্পত্তি হাতানোর ব্যাপার জড়িয়ে থাকে'।

মানসিক আরোগ্যশালা থেকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাওয়া এমন মহিলাদের ব্যথা তো দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। পুরুষেরা যেমন করেই হোক জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, মহিলাদের পক্ষে তা অসম্ভব। কেননা তাদের ব্যাপারগুলি আরও জটিল, আরও সংবেদনশীল। এর ফলে তারা খুব ভেঙে পড়েন তো বটেই ভীষণ অসহায়ও হয়ে পড়েন। এমন অধিকাংশ মহিলাদের স্বামীরা দ্বিতীয়বার বিয়ে করে ফেলেছেন। যখন আরোগ্যশালা থেকে স্ত্রীর সুস্থ হওয়ার খবর পৌছয়, তা কখনই খুশির হয় না। বরং অসুবিধের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। স্ত্রীকে নেওয়ার জন্যও কেই আসে না। না শ্বশুর বাড়ি থেকে, না আসে বাপের বাড়ি থেকে। আরোগ্যশালায় সম্প্রতি এমন অবস্থায় রয়েছেন সুচিত্রা, অনিতা, শারদা, ছায়া, কাজল, নমিতা এবং শোভা ছাড়াও আরও বহু মহিলা। জীবন থেকে মুছে গেছে এঁদের নাম, পারিবারিক পরিচয়। আরোগ্যশালায় চিকিৎসকের সান্নিধ্যে থাকার দরুন কারও কারও পরিবারে অশান্তিও দেখা যায়। কলকাতার অর্চনা মজুমদারের মত ভাগ্য আর ক'টা মেয়েরই বা আছে। আরোগ্যশালায় বহুদিন থাকা অর্চনা খুবই সংস্কৃতিপ্রবণ ছিলেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও নাচেও তাঁর দক্ষতা ছিল। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলে তাঁর পরিবারের কাছে খবর দেওয়া হয়। কিন্তু অর্চনার পরিবার তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ায় সম্মতি দেয় নি। আরোগ্যশালার আর এক প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ ডি.কে. ঘোষ যিনি কিছু দিন আগেই রিটায়ার করেছেন, তিনিই অর্চনাকে নিজের মেয়ের মত কলকাতায় নিয়ে আসেন। আরোগ্যশালার কয়েক জন চিকিৎসক বলছিলেন এখন অর্চনা সত্যি তাদের পরিবারের একজন হয়ে গেছেন।

এদের কথাতো জানলেন, কিন্তু প্রণব, নৃপেন, পরেশ, কাজল, নমিতা এবং শোভা দত্তর জন্য কার প্রতি দোষারোপ করবেন আপনি? সরকার, না এই অব্যবস্থার জন্য অনেক অভিযোগের কেন্দ্র রাঁচী মানসিক আরোগ্যশালা, কার সম্বন্ধে? এই ট্র্যাজেডিগুলোর জন্য দুঃখপ্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু কি করতে রাজি হবেন আপনি?

ছবি: প্রভাকর, মীরা কিষাণ

শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় জওয়ানের কৃতিত্ব

ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক ক্যাপ্টেন শ্রী রবীন্দ্রসিংহ চৌপাসী'র অতুলনীয় সাহস ও বীরত্বের এই কাহিনী পাঠককে উদ্দীপ্ত করবে। মৃত্যুভয়হীন দেশভক্ত এইসব সৈনিকেরা আমাদের দেশের গৌরব। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও চৌপাসী যে আত্মবিশ্বাস ও দুঃসাহসের পরিচয় রেখেছেন, তাঁর নিজের মুখ থেকে শোনা সেই কাহিনীর জীবন্ত বর্ণনা।
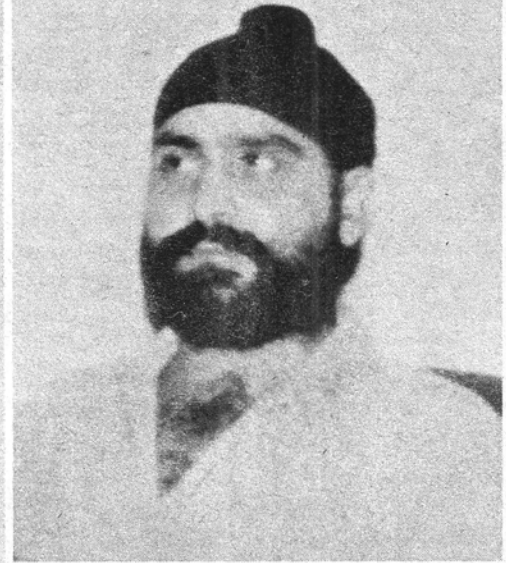
শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় শান্তি সেনার বীর সেনানী রবীন্দ্র সিংহ চোপড়া ('চৌপাসী')

আহত চৌপাসী

ছোট ছোট ঝোপ জঙ্গলে ঘেরা পুরো অঞ্চল। রাস্তার দু'দিকে সারি সারি কলাগাছ আর ঘন শরবন। তারও ওদিকে গভীর লম্বা ঘাসের জঙ্গল। জোঙ্গা জীপটির সামনের সীটে কর্নেল এ এস সেখোঁ এবং ক্যাপ্টেন চৌপাসী, পেছনের সীটে একজন রেডিও-অপারেটর, একজন স্পটার ও চারজন সশস্ত্র জওয়ান। জীপ চালাচ্ছিলেন স্বয়ং সেখোঁ।

তামিল উগ্রপন্থীদের খোঁজে বের হয়েছিল দলটি। লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম সংক্ষেপে এল টি টি ই বা লিটটে'র সদস্য তামিল উগ্রপন্থীরা সাদা পোশাকে ঘুরে বেড়ায়, ওদেরকে চিনিয়ে দেবার জন্য সেনাবাহিনী স্থানীয় বাছাই করা ব্যক্তিদের সাহায্য নিয়ে থাকেন, যাদেরকে 'স্পটার' বলা হয়ে থাকে।

জীপটি কুপ্রপুরম গ্রামে গিয়ে পৌঁছল, গ্রামটির পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি খাল। খালের পাশ দিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে ধরে জীপটি ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। পেছনে আরো কিছু জীপে সেনাবাহিনীর লোকজন আসছিলেন। একটি পুলের কাছে গিয়ে কর্নেল সেখোঁদের জীপটি বাঁদিকে ঘুরে গেল, অন্য জীপগুলি ডানদিকে চলে গেল। সেখোঁ এবং চৌপাসীদের জীপটি বাঁদিকে একটু এগিয়ে যেতে না যেতেই সামনের থেকে ছুটে এল ঝাঁক ঝাঁক গুলি। তামিল উগ্রপন্থীদের ভয়ানক প্রতি-আক্রমণ। চৌপাসী চকিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, বাঁদিকে জলভর্তি খাল, অন্যদিকে শুধুই ঘাস আর শরের জঙ্গল।

ফায়ারিং শুরু হতেই কর্নেল সেখোঁ জীপটিকে ডানদিকে ঘুরিয়ে নিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেদিক থেকেও শুরু হলো গুলিবর্ষণ। যা দেখা গেল, তাতে মনে হয় সাত আট দিক থেকে উগ্রপন্থীরা ঘিরে
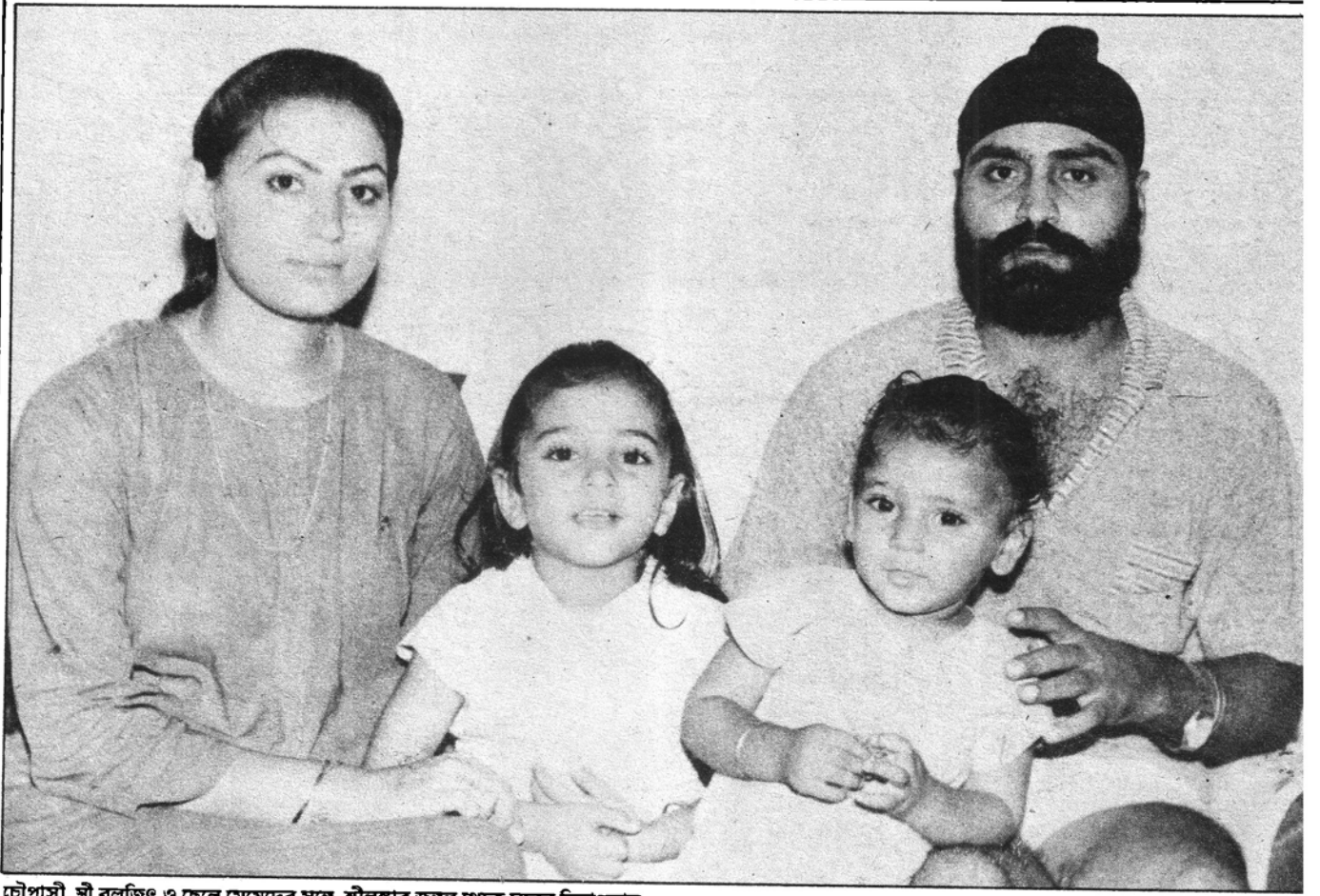
চৌপাসী, স্ত্রী বলজিৎ ও ছেলে মেয়েদের সঙ্গে, শ্রীলঙ্কার জঙ্গল থেকে ঘরের নিরাপত্তায়

ফেলে অনর্গল গুলি চালিয়ে যাচ্ছে।

জীপের সকলের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র। তাঁরাও ওরই মধ্যে পজিশন নিয়ে নিলেন। চৌপাসীর হাতে ৭.৬২ এস এল আর রাইফেল। তিনি হঠাৎ দেখলেন, ৩০-৪০ গজ দূরে একটি লোক তার হাতে এ কে ৪৭ চীনা অ্যাসল্ট রাইফেল, লোকটি শরের ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে গুলি চালাচ্ছে। স্পটার-এর ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র চৌপাসী লোকটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালালেন। সঙ্গে সঙ্গে সে খতম। ঠিক সেই মুহূর্তে কর্নেল সেখোঁ চীৎকার করে উঠলেন, চৌপাসী—তোমার বাঁ দিকে একজন...

নিজের কম্যান্ডিং অফিসারের গলার স্বর শোনামাত্র চৌপাসী বাঁদিক লক্ষ্য করে ছ রাউণ্ড গুলি ছুঁড়লেন—সেটাও খতম। আর এর পরই একটা গুলি এসে লাগল চৌপাসীর বাঁ গালে, সেটা ডানদিকে কয়েকটি দাঁত নিয়ে বেরিয়ে গেল। আবার এক ঝাঁক গুলি। এবার চৌপাসীর বুক ঘেঁষে সেগুলো বেরিয়ে গিয়ে তাঁর পেছনেই দাঁড়ানো এক জওয়ানকে বিদ্ধ করলো, সে বেচারা সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো। চৌপাসীর রাইফেলের গুলি তখন শেষ হয়ে গেছে, তিনি তখন এমনভাবে জখম যে নতুন করে গুলি ভরার ক্ষমতাও নেই। তাঁর পেছনের মৃত সৈনিকটির রাইফেলটি তিনি তুলে

নিজের কম্যান্ডিং অফিসারের গলার স্বর শোনামাত্র চৌপাসী বাঁদিক লক্ষ্য করে ছ রাউণ্ড গুলি ছুঁড়লেন-সেটাও খতম। আর এর পরই একটা গুলি এসে লাগল চৌপাসীর বাঁ গালে, সেটা ডানদিকে কয়েকটি দাঁত নিয়ে বেরিয়ে গেল। আবার এক ঝাঁক গুলি। এবার চৌপাসীর বুক ঘেঁষে সেগুলো বেরিয়ে গিয়ে তাঁর পেছনেই দাঁড়ানো এক জওয়ানকে বিদ্ধ করলো।

নিলেন। কর্নেল সেখোঁ-কে চীৎকার করে বলে স্যার, গাড়ি এগিয়ে নিয়ে চলুন। কিন্তু কো কর্নেল সেখোঁ। তাঁর প্রাণহীন দেহটি ত স্টিয়ারিং-এর ওপর লুটিয়ে।

তখনো জীপটি লক্ষ্য করে ফায়ারিং চলেছে। আহত চৌপাসী-র সামনেই স্পটার অন্যান্য সব জওয়ান গুলির আঘাতে হারালেন। একমাত্র চৌপাসীই বেঁচে রয়ে তখনো। কোনক্রমে তিনি কর্নেল সেখোঁ-র নিষ্ দেহটি একটু সরিয়ে ড্রাইভিং সীটে বসে গাড়ি দিলেন। জীপটি চলতে শুরু করতেই এক উগ্র ছুটে এসে জীপে ওঠার চেষ্টা করলো, হাতে বিদেশী স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। চৌপাসী সঙ্গে তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালালেন। সে লোকটি গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে চৌপাসীকে লক্ষ্য ব ফের গুলি ছুঁড়তে শুরু করে, কিছু গুলি চৌপাস পায়ে লেগে গেল। চৌপাসীও তার দিকে ফের গু ছুঁড়লেন, এবার লোকটি পড়ে গিয়ে আর উঠ পারল না। এসময় শরের জঙ্গল থেকে চার যুবক বেরিয়ে তাদের সঙ্গীটিকে টেনে নিয়ে যাব চেষ্টা করতে থাকে। ওদের মধ্যে একজ চৌপাসীকে লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড় লাগল। চৌপাসীর ডান হাতে লাগল সেগুলো, বি

আবার বাঁ দিকের কনুই-তে। ডান হাতের একটা আঙুল চামড়ার সাহায্যে ঝুলতে থাকে তাঁর। তিনি বুঝতে পারলেন, মৃত্যু অবধারিত। এসময় তাঁর মনে দেশভক্ত সৈনিকের প্রবল আবেগ জেগে উঠল, ঠিক আছে, দেশের জন্য বীরের মৃত্যু বরণ করাই ভাল।

দুই অকেজো হাত সম্বল করে চৌপাসী জীপের পেছনে মৃত ওয়ারলেস অপারেটরের কারবাইনটি তুলে নিয়ে জীপ থেকে গড়িয়ে নিচে নামলেন। কাটা আঙুলটি যাতে খুলে না পড়ে তাই সেটিকে মুঠোয় চেপে ধরে রাখলেন, বাঁ হাতে তুলে নিলেন

চৌপাসীর গর্বিত মাতাপিতা

কারবাইন, যে উগ্রপন্থীটি শেষবার তাঁকে লক্ষ্য করে ঝাঁক ঝাঁক গুলি চালিয়েছিল তাকে সঙ্গে সঙ্গে খতম করলেন।

হঠাৎ এরকম আক্রমণে ঘাবড়ে গিয়ে মৃত উগ্রপন্থী দু'জনের জীবিত সঙ্গীরা ছুটে শরের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে গুলি চালাতে থাকল। টলতে টলতে চৌপাসী বাঁ হাতে কারবাইন নিয়ে সেই জঙ্গল লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন। তাঁর দুটো জঙ্ঘাই এবার গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। এক উগ্রপন্থী সামনে এগিয়ে চৌপাসী-কে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে, পড়ে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে চৌপাসী তাকেও গুলি করলেন। লোকটির মৃত্যু হল তৎক্ষণাৎ।

চৌপাসীর আসল নাম রবীন্দ্র সিংহ, তাঁর জন্ম ৪ জানুয়ারি ১৯৫৫ পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার অন্তর্গত ফজিলকা গ্রামে। বাবার নাম ব্রিগেডিয়ার সুরজিৎ সিংহ চোপড়া, মা শ্রীমতী সুপ্রীত। রবীন্দ্রকে ছোটবেলায় আদর করে সকলে চৌপাসী বলে ডাকতেন। বি.এস.সি.পাশ করে চৌপাসী সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে চাইলেন। বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান বলে প্রথমে কেউ রাজী হননি, কিন্তু চৌপাসীর আন্তরিক ইচ্ছে ও জেদই শেষ অবধি জয়ী হয়।

১৯৮২ সালে চৌপাসীর বিয়ে হয় বলজিৎ কাউরের সঙ্গে। যাইহোক, ১৯৭৭ সালে মাদ্রাজ রেজিমেন্টের সপ্তম ব্যাটালিয়নে চৌপাসী সেকেন্ড লেফটেনান্ট হিসেবে যোগ দেন। তাঁর সহকর্মীদের কাছেও তিনি চৌপাসী নামেই পরিচিত হয়ে যান। প্রায় আটবছর বিভিন্ন ব্যাটালিয়নে কাজ করবার পর চৌপাসীকে পাঠানো হল নাগাল্যান্ডে। সেখান থেকে বেলগাঁও-এর ইনফ্যান্ট্রি স্কুলের কম্যান্ডো উইং-এ ট্রেনিং-এর জন্য দু'বছর কাটাতে হয় তাঁকে। এর মধ্যে তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়।

নাগাল্যান্ডে থাকার সময় পুরনো বন্ধুবান্ধবদের চিঠিপত্র লিখতেন চৌপাসী। চিঠিপত্রের মাধ্যমে জানতে পারেন, তার বহু সঙ্গীসাথী শ্রীলঙ্কায় চলে যাচ্ছেন ভারতীয় শান্তিসেনার হয়ে। চোপাসী তখন নিজেও কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানালেন, তামিল উগ্রপন্থীদের মোকাবিলার জন্য আমিও শ্রীলঙ্কায় সেনাবাহিনীর সেবায় নিয়োজিত [হতে] চাই। তার আবেদন মঞ্জুর করা হয়। ইতি[মধ্যে] তিনি ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হয়েছেন। ১৯ এ[প্রিল] ১৯৮৮ সকালে চৌপাসী শ্রীলঙ্কার মাটি [স্পর্শ] করেন। এবং ২১ এপ্রিলেই উগ্রপন্থীদের মুখে[মুখি] হতে হলো তাঁকে। তার বিস্তৃত বিবরণ [আগেই] দেওয়া হয়েছে।

চৌপাসীদের জীপের অন্য সঙ্গীরা [মারা] গিয়েছিলেন, চৌপাসীও মুমূর্ষু অবস্থায়। তত[ক্ষণে] অন্যান্য ভারতীয় সেনারা সেখানে পৌঁছে গে[ছেন]। উগ্রপন্থীদের তাড়া করে হঠিয়ে দিয়ে জওয়[ানরা]

হঠাৎ এরকম আক্রমণে ঘাবড়ে গিয়ে মৃত উগ্রপন্থী দু'জনে[র] জীবিত সঙ্গীরা ছুটে শরের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে গুলি চালাতে থাকল। টলতে টলতে চৌপাসী বাঁ হাতে কারবাইন নিয়ে সেই জঙ্গল লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন। তাঁর দুটো জঙ্ঘাই এবার গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। এক উগ্রপন্থী সামনে এগিয়ে চৌপাসী-কে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে, পড়ে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে চৌপাসী তাকেও গুলি করলেন। লোকটির মৃত্যু হল তৎক্ষণাৎ।

চৌপাসীর জ্ঞানহীন দেহ স্থানীয় সৈনি[ক] হাসপাতালে নিয়ে যান। ২২ এপ্রিল সক[ালে] চৌপাসীর জ্ঞান ফিরে আসে। পরে তাকে মাদ্রা[জে] নিয়ে আসা হয়। মাদ্রাজের কম্যান্ড হাসপাতালে ... দিন এবং পরে পুনের হাসপাতালেও ৩ দিন তাঁ[কে] ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়।

বর্তমানে তিনি বেরিলি-র মিলিটা[রি] হাসপাতালে রয়েছেন। সেখানে তাঁর চোয়ালে[র] সার্জারি এবং নকল দাঁত লাগানো হচ্ছে। আমাদে[র] প্রতিবেদক চৌপাসী-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উপরো[ক্ত] ঘটনার মৌখিক বর্ণনা শোনেন। আমরা দেশে[র] এরকম বীর সৈনিকের জন্য গর্ব অনুভব করি।

মনোহর শুক্ল

ঘর
আনন্দমুখর
ফিলিপ্‌স দিয়ে
ফিলিপ্‌স গৃহস্থালি-সরঞ্জাম
ফিলিপ্‌সের সরঞ্জাম আপনার আরাম আর সুবিধের কথা ভেবে বিশেষ স্টাইল আর ডিজাইনে তৈরী হয়েছে। ফলে, আপনি অনেক ভালোভাবে, অনেক চটপট ঘরের কাজ সেরে ফেলতে পারেন। অর্থাৎ, হাতে পান প্রচুর অবসর সময় — নিজের জন্যে তো বটেই, পরিবারের সকলের জন্যেই! ফিলিপ্‌স আয়রন দিয়ে ইস্তিরি ক'রে মজা! অ্যাটাচ্‌মেণ্ট সমেত ফিলিপ্‌স মিক্সার গ্রাইণ্ডারের সাহায্যে রান্না ক'রে আরাম! ফিলিপ্‌স সাইট্রাস প্রেস দিয়ে ফলের রস নিমেষে তৈরী হয়! এটি সুরুচি আর স্বাস্থ্যের সমন্বয়! ফিলিপ্‌স ওয়াল আর টেব্‌ল্‌ ক্লক সুন্দরভাবে সময় দেখায়।
PHILIPS

Godrej®

সওদা এক, লাভ অনেক

সত্যিই অতুলনীয়

HTA 2364

সরোজ: অকালে ঝরে যাওয়া একটি ফুল

কুমারী সরোজ পাণ্ডে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম·এ· পাশ করার পর রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জার্নালিজম–এ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা করেন, তারপর ১৯৭৫ সালে দিল্লী দূরদর্শনে প্রোডাকশান অ্যাসিস্ট্যান্ট–এর পদে চাকরি পেয়ে গেলেন। কাজে যোগদান করে সরোজ–কে নয় মাসের জন্য ট্রেনিং–এ পুনেতে পাঠানো হয়। ট্রেনিং শেষ হলে তাঁকে জয়পুর দূরদর্শন কেন্দ্রে পোস্টিং দেওয়া হয়। দেড়বছর তিনি জয়পুরে ছিলেন। এরপর সরোজকে বদলি করা হয় মাণ্ডি হাউস, দিল্লী–স্থিত দূরদর্শন মহানির্দেশালয়–এ। এখানেই ছিলেন তারপর থেকে। সরোজের বাবা মনোহরলাল পাণ্ডে রেলওয়েতে পাওয়ার কন্ট্রোলার পদে চাকরি করতেন। সরোজের দুই দাদা অনিল ও প্রবীণ দুজনেই চাকরি করেন ফরিদাবাদের নিকিতাশা কোম্পানিতে। দুজনেই বিবাহিত। মনোহরজীর বাড়ি ছিল দিল্লীর পীরাগড়ি অঞ্চলে অশোকা এনক্লেভে।

১৯৮৫ সালের মে মাসের কোন একদিন সরোজ জনৈক সি বি আই অফিসারের স্কুটারে তার বাড়িতে যাচ্ছিলেন, পথে একটি ছোট দুর্ঘটনায় সরোজ সামান্য চোট পান। কয়েকদিন তাঁকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাকতে হয়। সরোজকে পরিচিত লোক–জন, বন্ধুবান্ধব মাঝে মাঝে দেখতে আসত সে সময়। একদিন শিক্ষা বিভাগের জনৈক কর্মী ড: এম পি শ্রীবাস্তবও সরোজের খোঁজখবর নিতে এলেন। সরোজ বাবার সঙ্গে শ্রীবাস্তবজীর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কথায় কথায় শ্রীবাস্তবজী সরোজের বাবাকে নিভৃতে জানালেন, 'রবিকান্ত নামে আমার এক বন্ধু আছে, এম বি বি এস। খুব ভালো ছেলে, আপনি যদি চান সরোজের সঙ্গে ওর বিয়ের চেষ্টা করতে পারি।'

মনোহরলালজী সরোজের বিয়ের জন্য চিন্তিত ছিলেন এমনিতেই। আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'ঠিক আছে, ছেলেটিকে একদিন নিয়ে আসুন। ডাক্তার যখন, সরোজকে একবার দেখেও যাক।'

এভাবেই সরোজ ও রবিকান্তের আলাপ হয়। রবিকে সবারই পছন্দ হয়ে যায়। সরোজ ও রবিকান্ত, দু'জনেই পরস্পরকে পছন্দ করে ফেলেন। সরোজ অফিসে যেতে শুরু করেন। রবিকান্ত সেখানে গিয়ে সরোজের সঙ্গে দেখা করতে থাকে। এই মেলামেশা–র সময়টায় রবিকান্ত সরোজকে জানায়, ছোটবেলাতেই তার বাবা-মা মারা গেছেন। সৎমা'র কাছে সে মানুষ। সৎমা পুনাতে থাকেন। ওদের দেশ জম্মু–তে। রবি দিল্লীতে একা থাকে। বিয়েতে তার অভিভাবক বলতে কেউ থাকবেন না। সৎমা–কে রবি নাকি বিয়ের কথা আপাতত জানাবে না, তাঁর আবার পণ নেওয়ার খুব শখ–ইত্যাদি। সরোজ এসব কথা বিশ্বাস করেছিলেন।

সরোজের বাবা ও দাদাদের প্রশ্নের উত্তরে রবিকান্ত বলেছিলেন, সে নাকি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করে। রবি–র কাছে সরোজের দাদা অনিল অফিসের টেলিফোন

৫৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিয়ের পর: রবিকান্তের সঙ্গে সরোজ

সরোজ: ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে

দিল্লী দূরদর্শন মহানির্দেশালয়ের প্রোডাকশান অ্যাসিস্ট্যান্ট শ্রীমতী সরোজ পাণ্ডে গত 4 জুন আত্মহত্যার পথই বেছে নিলেন। ইকনমিকস-এর এম·এ·, জার্নালিজম-এর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা-হোল্ডার, রুচিসম্পন্না, সংস্কৃতিমনা সরোজের হৃদয়টিও ছিল কোমল-প্রকৃতির। তাঁর ডায়েরির ছত্রে ছত্রে হৃদয়-যন্ত্রণার লিপি। এই উচ্চশিক্ষিতা মেয়েটিকে চলে যেতে হলো কেন ?

জে পি দত্তর ক্রেজ

বাজার এখন ভি ডি ও আর দূরদর্শনে রমরমা। ছবির জগত তাই মার খাচ্ছে। কম সময়ে আর অনেক কম খরচে এইসব ছোট্ট মিডিয়াগুলিতে ছবি তৈরি করা যায়। এখন হুট করে কেউ আর বড় ব্যানারের ছবি করতে সাহস পান না। কিন্তু তাও নির্মাতারা ওভার বাজেট ছবি বানানর জন্যে জনপ্রিয় জে পি দত্তের পিছু ছাড়ছেন না। সবাই আশ্চর্য। এমনিতে যে কোন শিল্পী একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে নির্দেশকদের নানাভাবে হয়রান করেন। এ ব্যাপারে বম্বের শিল্পীদের যথেষ্ট বদনামই রয়েছে। কিন্তু অবাক ব্যাপার যে জে পি দত্তের সব রাগই তাঁরা সহ্য করে নেন। এমন কি তাঁকে কোন ফাই-ফরমাশ করেন না। প্রয়াত কে· আসিফ নিজের এই ধরনের বিশিষ্টতার জন্যে বিখ্যাত ছিলেন।

জে পি দত্তকে আর এক কে· আসিফ বলা হয়। আসিফ সাহেবের মত তাঁর টেকিং পদ্ধতিও ভিন্নরকম। শ্যুটিং—এর ব্যাপারেও তাঁর বেশই খুঁতখুঁতুনি রয়েছে। যতক্ষণ না শট ঠিক মনের মত হয় ততক্ষণ তিনি শ্যুটিং চালিয়ে যান। 'বাটওঁয়ারা'তে চারটি দীর্ঘ শ্যুটিং শিডিউলের পরও তিনি 'দি এণ্ড' দিতে পারেন নি। ঠিক একই অবস্থা 'ইয়েতীম' ও 'হাতিয়ার' ছবি দু'টির ক্ষেত্রেও।

ডিম্পল এবং 'বাচ্চার বাবা'

জুলাই আগস্ট পরপর এই দু'টি মাস ইউরোপে অবসর কাটিয়ে ফিরলেন ডিম্পল কাপাডিয়া। বাচ্চাদেরও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন তাঁকে একেবারেই অন্যরকম দেখাচ্ছে। সবসময়ই তাঁর মুখে মুচকি হাসি। এমন কি মাঝে মাঝে তাঁকে পুনম ধীলন, সঙ্গীতা বিজলানীর প্রশংসা করতেও দেখা যাচ্ছে। অবসরের সময়টুকুতে তিনি তাঁর 'বাচ্চার বাবা' রাজেশ খান্নার নির্মিত ছবি 'জয় শিব শংকর'–এও অভিনয় করেছিলেন। কারও কারও সামনে রাজেশ খান্নাকে তিনি 'বাচ্চার বাবা' বলেই সম্বোধন করে থাকেন। ছবিটিতে তাঁর সঙ্গে পুনম আর সঙ্গীতাও অভিনয় করেছিলেন। শুটিং হয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়াতে। শুটিং–এ বেশ কিছুটা সময় কাটানর পরে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন রাজেশ খান্নার সাংস্কৃতিক গ্রুপটিকে নিয়ে। লস এঞ্জেলস, সানফ্রান্সিসকো, মিয়ামি, ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে সেই সাংস্কৃতিক গ্রুপটি 'সঙ্গীত রাত্রি' নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে-ছিলেন। অনুষ্ঠানটিতে তিনি বাপী লাহিড়ীর সঙ্গে গান গেয়েছিলেন। আবার শত্রুঘ্ন সিনহার সঙ্গে নাচ ও অ্যাকটিং করেছিলেন।

দু'মাসের এই ছুটিতে থাকার পরে ডিম্পল এখন বেশ বদলে গেছেন। তাঁর হাবেভাবে মনে হচ্ছে যে রাজেশ খান্নার সঙ্গে ফাটল ধরা সম্পর্কে আবার জোড়া লাগতে পারে। 'জয় শিব শংকর'–এর শুটিং বেশ তাড়াতাড়িই শেষ করে ফেলেছেন। এখন রাজেশ খান্নাকে তিনি নির্দেশক হবার পরামর্শ দিচ্ছেন। আর ছবিটির নির্দেশক রাজেশ খান্না হলে নায়িকা হবেন নিশ্চয় ডিম্পল কাপাডিয়াই।

দেবানন্দের নতুন নায়িকা

একই পরিবারের লোকজনকে নিয়ে তৈরি ফিল্ম (যাতে ডিরেকটর থেকে শুরু করে নায়ক পর্যন্ত একই পরিবারের লোকজন) 'কয়ামৎ সে কয়ামৎ তক' শুধুমাত্র যে একশ দিনের মধ্যে দু কোটিরও বেশি টাকার ব্যবসা করেছে তাই নয়, নির্জলা কিশোর প্রেম নিয়ে তৈরি ছবিও যে বকস অফিসে হিট হতে পারে তারই নিদর্শন হিসেবে দাঁড়িয়ে আরও অজস্র পরিচালককে এধরনের থীমে তৈরি ছবি করতে উৎসাহী করে তুলেছে। এমনকি দেব আনন্দ যিনি মুখ্যত নিজেই হিরো হিসেবে আবির্ভূত হন বলে এধরনের ছবি করতে আগ্রহী নন, তিনিও এখন এধরনের থিমে ফিল্ম তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

'কয়ামৎ সে কয়ামৎ তক' ফিল্মের নায়ক আমীর খান আর 'কাতিল'–এর নায়ক আদিত্য পাঞ্চোলি–কে নিয়ে ত্রিকোণ প্রেমের ছবি 'অব্বল নম্বর' তৈরি করাও শুরু করে দিয়েছেন। এখন দেবআনন্দ তাঁর প্রতি ছবিতেই নতুন নতুন নায়িকার আবির্ভাব ঘটান। এবার তার ফিল্মের একেবারে আনকোরা নায়িকা ১৯ বছরের তরুণী আরতী শর্মা । এ ছবিতে তাঁর নাম বদলে রাখা হয় একতা।

গণদেবতা

'হমলোগ' ও 'আজুবে' টি ভি সিরিয়ালের পরিচালক বাসুদেব এবার হাত দিয়েছেন কথা সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণমুখী উপন্যাস 'গণদেবতা'র রূপায়ণে।

গণদেবতার একটি দৃশ্যে: দুর্গা আর অনিরুদ্ধ

জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে গণচেতনার প্রকাশ

জমিদারবাবুর লোকেরা সব পুড়িয়ে দিয়ে গেল। পোড়া ধানের ছাইয়ে হাত বোলাচ্ছে অরিন্দম। আগুন তো তার ফসল পোড়ায় নি, যেন পুড়িয়েছে তারই সন্তানকে। তরুণ চাষী সে। সন্তান বিয়োগের ব্যথায় যেন ভারাতুর। এই শোষণ আজকের নয়, যুগ পরম্পরায় চলছে। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'গণদেবতা' পি.বাসুদেবের শিল্প সচেতনতার স্পর্শে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আবেগপ্রবণ দৃশ্যগুলিতে বাসুদেবের পরিচালনা কৌশলের সূক্ষ্ম দিকগুলি চমকে দেয়। জাত পরিচালকের নিদর্শন।

সত্যিকথা বলতে কি, অরিন্দমের মত মানুষেরা আজ স্বাধীনতা থেকে অনেক, অনেক দূরে। বিকৃতভাবাপন্ন কায়েমী স্বার্থের রাজনীতিকেরা তাদের অহেতুক হয়রান করে। এক

৬০ পৃষ্ঠায় দেখুন

শোষণের কায়েমী হাতিয়ার শান্তিরক্ষকেরাও!

বাস্তবিকই, ঘটনা মাঝে মাঝে বানানো গল্পকেও হার মানায়। ঘটনার জটিলতায় পূর্ণ এই কৌতূহলোদ্দীপক প্রতিবেদনটিতে একটি মানবিক মূল্যবোধেরও প্রকাশ ঘটেছে। একটি কিশোরী মেয়ের প্রেম ও ভালোবাসাকে মর্যাদা দেবার জন্য এক পুলিশ ইন্সপেকটরের জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার কথা রয়েছে এতে।

একটি মানবিক সম্পর্কের স্বপক্ষে

সন্ধ্যেবেলা থানায় নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। দু'তিনজন লোক হঠাৎ দেখা করতে এল। একজনের নাম এনায়েৎ-উল্লা। তার অভিযোগ, তার মেয়ে নাজমাকে কেউ জোর করে নিয়ে পালিয়েছে। কাকে সন্দেহ হয় জিগ্যেস করলাম। এনায়েৎউল্লা জানালেন, শওকত নামের একটি যুবককে তাঁর সন্দেহ হয়। শওকত তাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। সম্প্রতি সে একটা চাকরিও পেয়েছে। শওকতের মা তাঁর ছেলের জন্য এনায়েৎউল্লার কাছে দু'একবার এসেছিলেন যাতে নাজমার সঙ্গে শওকতের একটা বিয়ের সম্বন্ধ করা যেতে পারে। কিন্তু নাজমা'র বাবা মা রাজী হননি।

নাজমা'র বয়স সতেরোর কম। স্থানীয় কলেজের ছাত্রী। যাইহোক, আমি থানার এ·এস·আই·–কে দুজন পুলিশ সহ শওকতের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। তার আগে রিপোর্টটা লিখে নিলাম। আধঘন্টার মধ্যে এ·এস·আই· ফিরে এলেন এবং তাদের সঙ্গে শওকতের বাবা এবং ভাই এসে ঢুকল। শওকতের বাবা, এসব ব্যাপারে যে শওকত জড়িত থাকতে পারে সেকথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলেন। থানার মধ্যেই ওদের দুইপক্ষে কথা কাটাকাটি হতে থাকল। আমি আরো কিছু কথাবার্তা জিগ্যেস করে নিয়ে ওদের সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।

ওরা চলে যাবার মিনিট খানেকের মধ্যে ডি·সি· সাহেবের ফোন পেলাম। তিনি ঠিক এই নাজমার কেসটার সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। নির্দেশ দিলেন, কয়েকঘন্টার মধ্যে নাজমাকে যেন খুঁজে বের করা হয়। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। ডেপুটি কমিশনার সাহেব কি এনায়েৎউল্লার আত্মীয়-টাত্মীয় নাকি? তাড়াতাড়ি ডি·এস·পি সাহেবকে ফোন করলাম। তিনি আমার

নিজস্ব বাড়ীর মালিক হয়ে যান...
স্টেট ব্যাংকের সহায়তা নিন!

স্টেট ব্যাংক সাধারণ মানুষের জন্যে সদাই সাহায্যের হাত বাড়ায়। এ এখন চালু করেছে এক ঋণ-যোজনা, যার সাহায্যে আপনি নিজস্ব বাড়ীর মালিক হতে পারবেন!

আপনি যেকোনো স্টেট ব্যাংক শাখায় এই যোজনার অন্তর্গত একটি আবর্তক আমানত (রেকারিং ডিপোজিট) অ্যাকাউণ্ট খুলুন। তারপর 36 মাস ধরে নিয়মিতভাবে, কোনো কিস্তি বাকি না ফেলে, টাকা জমা দিতে থাকুন।

মেয়াদের শেষে আপনার জমারাশির সমান রাশি ঋণ হিসাবে নিতে পারেন। এই ঋণের ঊর্ধ সীমা হল 1,00,000/- টাকা।

এবার, এই দুই রাশি মিলিয়ে নিজস্ব বাড়ীর মালিক হয়ে নিজের স্বপ্ন সাকার করুন!

'আপনার নিজস্ব বাড়ী' যোজনা!

CHAITRA-B SBI 1591 BEN

ফোন পেয়েই বললেন, 'নওয়াজ, আমিও এ ব্যাপারে একটু আগে ডি·সি· সাহেবের ফোন পেলাম। কাজ শুরু করে দাও।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে শওকতের বাড়ি চলে গেলাম। রাত তখন আটটা হবে। শওকতের বাবা ইয়াকুব আলি বাড়ি ছিলেন না। শওকতের ভাই আকবর আমাদের ড্রইংরুমে নিয়ে বসাল। সে জানাল, তারা কেউ শওকতের খবর জানে না। শওকতের মা বললেন, শওকত এ কাজ করতেই পারে না।

শওকতের মা'র সঙ্গে কথাবার্তা বলে কতকগুলো তথ্য পেলাম। নাজমা এনায়েৎউল্লা'র নিজের মেয়ে নয়। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর এনায়েৎ দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন, তখন দ্বিতীয় স্ত্রী মেয়ে নাজমাকে সঙ্গে নিয়েই স্বামীর ঘরে আসে। নাজমা এবং শওকত পরস্পরকে পছন্দ করত। নাজমার মা শওকতের মার খুড়তুতো বোন। নাজমাকে শওকতের বাড়ির সকলে খুব পছন্দ করত। বিয়ের সম্বন্ধ হবার পর অবশ্য নাজমার এ বাড়িতে আসা যাওয়া কমে গিয়েছিল। নাজমার বাবা যে কেন এই সম্বন্ধের ব্যাপারটা অস্বীকার করছে এটাই আমার মাথায় ঢুকছিল না।

আমি আকবরকে বললাম, 'কি আকবর, তুমি বললে শওকত রাত আটটার মধ্যে বাড়ি ফেরে, এতো নটা বেজে গেল!' আকবর কোন জবাব দিল না। আমার শওকতের ওপর সন্দেহ বাড়ছিল। এক সাব ইন্সপেকটরকে এনায়েৎউল্লার বাড়ি পাঠালাম।

কিছুক্ষণ পর এস·আই· ফিরে এসে জানালেন, নাজমা তার বাবা মা'র সঙ্গে লনে বসে ছিল সন্ধেবেলা। 'আসছি' বলে সে একবার কিছুক্ষণের জন্য নিজের কামরায় যায়। আর ফিরে আসে না। ওর মা ওকে খুঁজতে গিয়ে দেখেন নাজমার ঘরের সব জিনিস পত্র অগোছালো এবং পেছনের জানালা খোলা।

এস·আই বললেন, 'আমি স্যার মেয়েটার ঘরটা দেখলাম। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাকে যেন কেউ জোর করেই নিয়ে গেছে।' আমি কিছুতেই কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলাম না। এর মধ্যে থানা থেকে একটা টেলিফোন এল। আকবর ফোনটা ধরতে যাচ্ছিল, তার আগেই আমি তুললাম রিসিভারটা। এক সাব ইন্সপেকটর জানালেন, 'স্যার, আপনার কথামত এনায়েৎউল্লা এবং ইয়াকুব আলী দুজনেরই ঘনিষ্ঠ কিছু লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছি। তেমন কোন খবর নেই। তবে ৮।১০ দিন আগে নাজমা'র ভাইয়েরা একটা ছেলেকে খুব পিটিয়েছে, ছেলেটা কিন্তু শওকত নয়।'

ফোনটা রেখে দেওয়া মাত্র আবার বাজতে শুরু করল। ফের ধরলাম। একটা মেয়ের গলা। বললো, 'আকবর ভাইয়া?' বললাম, 'হ্যাঁ।'

মেয়েটি দ্রুতস্বরে বলে যেতে থাকে, 'ভাইজান, এক বদমাশ আমাকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছে। আমাকে একটা ঘরে বন্ধ করে রেখেছে। সে এখন এখানে নেই। পাশের ঘরে টেলিফোন রয়েছে দেখে বড় কষ্টে জানলার কাচ ভেঙে হাত বাড়িয়ে টেলিফোন করছি। আমি বেরুতে পারছি না।' কেঁদে ফেলল মেয়েটি।

'আসছি' বলে সে একবার কিছুক্ষণের জন্য নিজের কামরায় যায়। আর ফিরে আসে না। ওর মা ওকে খুঁজতে গিয়ে দেখেন নাজমার ঘরের সব জিনিস পত্র অগোছালো এবং পেছনের জানালা খোলা।

আমি বললাম, 'শুনুন, আমি আকবরের বন্ধু। আকবর বাড়িতে নেই। আপনি কোত্থেকে কথা বলছেন?'

'আমি বুঝতে পারছি না কোথায় আছি, আমাকে যখন নিয়ে আসা হয় আমি তখন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।'

'লোকটাকে চেনেন?'

'না। লম্বা চওড়া চেহারা। পায়জামা কামিজ পরা। আপনি দয়া করে শওকত কিংবা তার বাবাকে ডেকে দিন।'

আমি বললাম, 'শুনুন আপনাকে আমরা সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি অন্তত জায়গাটার একটু আভাস দিন, যেভাবে হোক'। মেয়েটি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমি ভীষণ কষ্টে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে রিসিভার ধরে আছি, আর পারছি না। বাইরে গাড়ির আওয়াজ পাচ্ছি, লোকটা বোধহয় এল। আমাকে বাঁচান—'

ব্যস, ফোনে আর কোন কথা শোনা গেল না। রিসিভারটা ওর হাত থেকে পড়ে গেছে। আমি সমস্ত মনোযোগ দিয়ে কান পেতে থাকলাম রিসিভারের মধ্য দিয়ে বাইরের রাস্তা দিয়ে নানারকম গাড়ির যাতায়াতের শব্দ ভেসে আসছিল। তার মানে, যে বাড়িটা থেকে ফোন করা হচ্ছিল সেটা কোন বড় রাস্তার পাশেই এবং সেই রাস্তাটা দিয়ে ভারি যানবাহন যাতায়াত করে। ইতিমধ্যে ডি.এস.পি. এবং এস·পি· সাহেব ঘরের মধ্যে এসে পড়েছেন। শওকতের বাড়ির লোকেরা সব উদ্বিগ্নভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। নাজমা–র মা এবং বাবাও উপস্থিত হয়েছেন। আমি কি করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ডি·এস·পি সাহেব বললেন, 'উপর থেকে কড়া হুকুম এসেছে যেভাবে হোক নাজমাকে কিছুক্ষণের মধ্যে উদ্ধার করতেই হবে। নওয়াজ খাঁ, যাহোক একটা কিছু করুন।'

আমার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। জিগ্যেস করলাম, 'স্যার, আপনার জীপে ওয়ারলেস আছে নিশ্চয়ই। একটা রিসিভারও দরকার।' এস·পি· সাহেব বললেন, 'আছে।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে জীপের ড্রাইভারকে বললাম, 'সাইলেন্সারটা খুলে ফেল।' সাইলেন্সার খুলে ফেলা হল। আমি ওয়ারলেস সেট উঠিয়ে ঘরের মধ্যে এনে রাখলাম।

ডি·এস·পি· সাহেবকে বললাম, 'স্যার। আমি আপনার জীপটা নিয়ে বেরুচ্ছি। কতকগুলো রাস্তায় ঘুরবো। আপনি এই ফোনের রিসিভারটায় কান রাখবেন। আমার জীপের আওয়াজ পেলেই ওয়ারলেসে যোগাযোগ করবেন।

ডি·এস·পি· এবং এস·পি· সাহেব মুহূর্তের মধ্যে পুরো ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন। আমি বেরিয়ে পড়লাম। এত বড় শহর, প্রচুর রাস্তা। আমি মনে মনে বেশ কয়েকটা রাস্তা বেছে নিয়ে দ্রুত ছুটে চললাম, সঙ্গে কয়েকজন সহকর্মীকেও নিলাম। কিন্তু কোন লাভ হল না। হতাশ হয়ে পড়েছি, হঠাৎ ওয়ারলেসে আমার সাব ইন্সপেকটরের গলা পেলাম, 'হ্যালো সাহেব, মনে হচ্ছে আপনার জীপের আওয়াজ পাচ্ছি। কিন্তু মিলিয়ে যাচ্ছে।'

আমি দ্রুত জীপটাকে ফের যে পথ দিয়ে আসছিলাম, সেদিকেই ঘোরালাম। কয়েক সেকেণ্ড চলার পরই আবার এস·আই·এর গলা পেলাম, 'হ্যাঁ সাহেব, এবার আবার পাচ্ছি, বেশ পরিষ্কার।' আমি সটান জীপ থামিয়ে নামলাম।

চারদিকে তাকিয়ে বাঁ–হাতি একটা বাড়ি বেছে নিলাম। বাড়িটা বেশ নীরব। বারান্দায় আলো জ্বলছিল। সামনে উঠোন। তার ডানদিকে সংলগ্ন কয়েকটি রুম। এ·এস·আই–কে বললাম, 'রেডি থাকবেন। আমি ঢুকছি।'

গেটে উঁকি মারলাম। না, দারোয়ান টারোয়ান

কিছু নেই। গ্যারেজে একটা লাল রঙের গাড়ি। আমি লাফিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। যেদিকে অন্ধকার, সেদিকটায় গা ঢাকা দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ কেউ আমার ওপর লাফিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড শক্তি তার গায়ে। লোকটাকে কাবু করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হল। থুতনিতে কায়দা করে জোর ঘুঁসি চালালাম একটা, লোকটা ছিটকে পড়ল। আমি উঠে দাঁড়াবার আগেই আরেক জনের আবির্ভাব। এই দ্বিতীয় লোকটা পেছন থেকে আমার কোমর দুহাতে চেপে ধরল। আমার হাত দুটো খালি, হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে ত্বরিৎগতিতে শূন্যে ফায়ার করলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমার এ·এস·আই দক্ষতার সঙ্গে সামলে নিল পুরো ব্যাপারটা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে এস·পি·, ডি·এস·পি· এবং শওকত ও নাজমা'র বাড়ির লোকজন এসে পড়ল। বাড়িটা তল্লাসি করে একটা ঘরে নাজমাকেও পাওয়া গেল। যুবক দু'জনের মধ্যে একজন শওকত, অন্যজন গোবিন্দ–শওকতের এক বন্ধু।

নাজমা, শওকত এবং গোবিন্দকে জেরা করে যা জানা গেল তা হচ্ছে, দুপুরের একটু পরে শওকত তার অফিসে একটা ফোন পায়। ফোনটা নাজমার। অবিলম্বে সে শওকতকে দেখা করতে বলে। শওকত অফিস থেকে ছুটি চেয়ে নিয়ে নাজমা'র সঙ্গে দেখা করে। নাজমা তাকে কাঁদতে কাঁদতে বলে, নাজমা'র বাবা নাকি নাজমাকে কয়েকঘন্টার মধ্যে অজানা অচেনা একটা লোকের সঙ্গে শাদী দিতে চলেছেন। তার বাবাকে একটা গাড়ি করে একজন লোক কোথায় নিয়ে যায়, ঘন্টাখানেক পর বাবা ফিরে এসে মা'র সঙ্গে নানারকম পরামর্শ করেন। মা খুব কাঁদতে থাকেন। বাবাকেও ভীষণ চঞ্চল আর উদভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। তিনি শুধু বলেছিলেন, 'কোনো উপায় নেই, আমার আর কোন উপায় নেই।' সব শুনে শওকত কিছুক্ষণ সময় চায়। বেরিয়ে গিয়ে সে বন্ধু গোবিন্দর সঙ্গে দেখা করে সব খুলে বলে। নাজমা'র সঙ্গে তার রিস্তা সব ঠিকঠাক, হঠাৎ কি হল, কে জানে। গোবিন্দ বন্ধুকে সাহায্য করবে কথা দেয় এবং সে গাড়ি নিয়ে সোজা চলে যায় নাজমা'র বাড়িতে। কিন্তু ঢুকতে গিয়ে দেখে, লনে নাজমা তার বাবা মা'র সঙ্গে বসে আছে। গোবিন্দ অপেক্ষা করে। একসময় নাজমা উঠে তার ঘরে যায়। গোবিন্দ একমুহূর্ত দেরি না করে পেছনের জানলা দিয়ে নাজমা'র ঘরে ঢোকে। তাকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে নিয়ে আসে সেই বাড়িটায়। নাজমাকে কামরায় বন্ধ করে গোবিন্দ চলে যায় শওকতকে ডাকতে। এই সময়ের মধ্যেই নাজমা শওকতের বাড়িতে টেলিফোন করেছিল। তারপর তো সে শওকতকে দেখে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারে। ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই গোবিন্দ'র গ্রামের বাড়িতে রওনা হয়ে যেত। তার আগেই তো আমি ধরে ফেললাম ওদের।

সবকিছুই ঠিকঠাক, কিন্তু আমার মাথায় কয়েকটা প্রশ্ন ঘুরছিল। প্রথমত, নাজমা'র বাবা হঠাৎ শওকতের ব্যাপারে মত বদলে কয়েকঘন্টার মধ্যে মেয়েকে একটা অজানা অচেনা লোকের হাতে তুলে দিতে রাজী হলেন কেন? দ্বিতীয়ত, একটা গাড়িতে ঘন্টাখানেকের জন্য এনায়েৎউল্লাকে কে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্য কি কথা হয়েছিল যে ফিরে এসেই এনায়েৎউল্লা নাজমা'র ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন! তৃতীয়ত, ডি·সি· সাহেব এই কেসটায় এত ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছেন কেন?

আমি নিশ্চিত যে এস·পি· এবং ডি·এস·পি· দুই সাহেবই আমার কাছে কিছু চেপে যাচ্ছেন, কিন্তু ওরা আমার উপরওয়ালা প্রশ্ন করার অধিকার আমার নেই। মধ্যরাতের সময় দু'জন ভদ্রলোক থানায় এলেন। তাঁরা কিছু অভিযোগ দায়ের করতে চান।

আমার কৌতূহল হল। তাঁরা দু'ভাই। বড় ভাইয়ের দুই মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কি ব্যাপার? প্রশ্ন করে জানা গেল, দুটি মেয়েই স্থানীয় কলেজের ছাত্রী। কলেজের বাসেই তারা বাড়ি ফেরে। তাদের ফেরার সময় পার হয়ে যাবার পরও

গোবিন্দ বন্ধুকে সাহায্য করবে কথা দেয় এবং সে গাড়ি নিয়ে সোজা চলে যায় নাজমা'র বাড়িতে। কিন্তু ঢুকতে গিয়ে দেখে, লনে নাজমা তার বাবা মা'র সঙ্গে বসে আছে। গোবিন্দ অপেক্ষা করে। একসময় নাজমা উঠে তার ঘরে যায়। গোবিন্দ একমুহূর্ত দেরি না করে পেছনের জানলা দিয়ে নাজমা'র ঘরে ঢোকে।

বাড়ি আসছে না দেখে বাবা কলেজে খোঁজ নিতে যান। কলেজে গিয়ে শোনেন যে বাস অনেকক্ষণ সব ছাত্রীদের নিয়ে চলে গেছে। তাহলে গেল কোথায় তারা? ইতিমধ্যে কলেজে আরো বেশকিছু অভিভাবক এসে হাজির। কারোরই মেয়ে বাড়িতে পৌছয়নি।

ধীরে ধীরে প্রকৃত খবর এসে পৌছাল। ছাত্রী ভর্তি বাসটিকে এক দুর্বৃত্ত হাইজ্যাক করে শহরের বাইরে এক নির্জন স্থানে নিয়ে গেছে। ভয়ের কিছু নেই। ওই বদমাশ লোকটা কি যেন দাবি করেছে, কমিশনার সাহেব তা মেনে নিয়েছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসটাকে দুর্বৃত্তটা ছেড়ে দেবে। কিন্তু ডি·এস·পি· সাহেবের হুকুম আছে যে কলেজে যে সব অভিভাবক খোঁজ নিতে এসেছেন, তাদের কাউকে এখন কলেজের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না।

কেন? এই আশ্চর্য হুকুম কেন? এই অভিযোগকারী দু'জন ভদ্রলোক তা জানেন না। তারা কৌশলে সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা থানায় চলে এসেছেন। সব শুনে আমার কৌতূহল উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে থাকে। অভিযোগকারী ভদ্রলোক হলেন একজন অ্যাডভোকেট, অরুণলাল তাঁর নাম। সঙ্গে এসেছেন তাঁর ভাই। প্রশ্ন করে জানা গেল, ঐ বাস থেকে দু'জনকে নাকি হাসপাতালে আনা হয়েছে, একজন লেকচারার ও একজন ছাত্রীকে দুর্বৃত্তটা নাকি গুলি করেছে, তারা পালাবার চেষ্টা করছিল।

ওরা চলে যাবার পর আমি কেসটা নিয়ে ভাবছিলাম। হঠাৎ ডি·এস·পি· সাহেবের তলব। আমি দেখা করতেই বললেন, 'অরুণলাল নামে জনৈক অ্যাডভোকেটকে গ্রেপ্তার করতে হবে, যত শীঘ্র সম্ভব।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই ভদ্রলোক একটু আগে থানায় এসে অভিযোগ জানিয়ে গেছেন। ডি·এস·পি· সাহেবকে সব খুলে বললাম। তিনি চুপ করে থাকলেন।

আমি বললাম, 'স্যার, আজ সন্ধ্যেবেলা থেকে যাসব ঘটছে, সব কিছুর পেছনে একটা রহস্য আছে। আপনি সবই জানেন, আমাকে কিছু বলতে চাইছেন না, কেন বলতে পারেন?'

ডি·এস·পি· সাহেব এবার মুখ খুললেন। বললেন, 'নওয়াজ, তোমাকে সব বলছি, শোনো। বাস হাইজ্যাকের ব্যাপারটা যা জেনেছো সবটাই সত্যি। দুর্বৃত্তটা'র দাবি তুমি জানো না। সে নাকি নাজমা বলে মেয়েটাকে শাদী করতে চায়। শুধু ওকে তুলে নিয়ে যাবে বলে বাসটাকে হাইজ্যাক করে। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই হোক, নাজমা কলেজে যায়নি ফলে বাসে মেয়েটাকে না পেয়ে সে উন্মাদ হয়ে ওঠে। লোকটার নাম বদরু। নাজমা'র পেছনে লাগতে গিয়ে দিনকয়েক আগে সে নাজমা'র ভাইদের হাতে খুব মার খায়। লোকটা ভয়ানক বদমাইশ। বিপজ্জনকও। ও চাইছে, ওর হাতে নাজমাকে না তুলে দিলে বাসের সবাইকে খুন

করবে। আমি ওর হাতের বোমাটা নিজে দেখেছি, ও দূর থেকে দেখিয়েছে। আর, রিভলভার যে আছে, সেটা তো দু'জনকে গুলি করে প্রমাণ করে দিয়েছে।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'কিন্তু স্যর, আপনারা ওর দাবি কি মেনে নেবেন নাকি? একটা পাগল যা খুশী করে যাবে?'

এস.পি.সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'নওয়াজ খাঁ, বাসের মধ্যে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আমাদের ডি.সি.সাহেবের মেয়ে, যিনি ঐ কলেজেরই লেকচারার আর দুর্ভাগ্যবশত ঐ ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর দু'বছরের ছোট্ট মেয়েটিও রয়েছে। কয়েকমাস আগে একটা দুর্ঘটনায় ডি.সি.সাহেবের স্ত্রী মারা গেছেন, ওঁর মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই। ডেপুটি কমিশনার সাহেব চাইছেন তাঁর মেয়ে এবং নাতনীর যাতে কোন ক্ষতি না হয়, তারজন্য মস্তান বদরু যা চাইছে দেওয়া হোক। ডি.সি.সাহেবের উদ্যোগেই নাজমা'র বাবাকে গাড়ি করে বাড়ি থেকে নিয়ে সবকথা বলে বোঝানো হয়েছে, বহুকষ্টে ওনাকে রাজী করানো হয়েছে। নাজমা যে বলছিল ওর বাবাকে একটা গাড়ি এসে নিয়ে গিয়েছিল, তারপরই ফিরে এসে বাবার মত বদলে যায়, এটা সেই গাড়ি-ডেপুটি কমিশনার সাহেব পাঠিয়েছিলেন। সাহেব চাইছেন এই পুরো খবরটা যেন একবিন্দুও বাইরে না প্রচার হয়, যার জন্য অভিভাবকদেরও কলেজে আটকে রাখা হয়েছে।

আমি বললাম, 'তাহলে কি করবেন এখন?'

'রাত ১-২৫ এখন। দেড়টার পরই আমি ডি.সি.সাহেবের সঙ্গে দেখা করব। তারপরই তোমাকে বলতে পারব, কি করা হবে, বা কি ঘটতে চলেছে'? আমি এবার বললাম, 'স্যর আমি একটা কথা বলতে চাই। ডি.সি.সাহেবের দিকটা নিশ্চয়ই দেখতে হবে, কিন্তু তাই বলে একটা নিরপরাধ মেয়েকে তার প্রেমিকের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে একটা গুন্ডার হাতে তুলে দিতে হবে এতো আর হয় না। এর কোন বিকল্প উপায় ভাবতে হবে।'

'কি করতে চাও নওয়াজ?'

'আমাকে একটা সুযোগ দিন।'

'ঠিক আছে, দেখি' বলে এস.পি.চলে গেলেন।

ইতিমধ্যে বদরু সম্পর্কে ফাইলটা আনিয়ে ওর সবকিছু খুঁটিয়ে পড়ে নিলাম। তারপর যে দু'জন বাসযাত্রীকে বদরু গুলি করেছিল তাদের সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করলাম। রাতের ডিউটিতে যে ডাক্তার ছিলেন, তার ওপর ডি.সি., ডি.এস.পি.প্রত্যেকের নির্দেশ ছিল আহত দুজনের সঙ্গে যেন কারুকে দেখা না করতে দেওয়া হয়। লেকচারার ভদ্রমহিলা তখনো অচেতন। ছাত্রীটির অবস্থা একটু ভাল'র দিকে, একটা ছোট অপারেশনের পর সে নাকি কথাও বলছে। ডাক্তারকে নানারকম বুঝিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললাম! বোঝা গেল, বদরুর হাতে সত্যি একটা হাতবোমা আছে। বাসের

জানলার কাচ ভেঙে পড়ল ঝনঝন করে। বদরুর দেহ প্রায় অর্দ্ধেক বেরিয়ে এল। গাঁজা চরস খেয়ে খেয়ে ওর অবস্থা এমনিতেই তখন ঢিলে, তার ওপর ষোলো ঘন্টা কিছু খায়নি। এর মধ্যেই সে তার মুখ দিয়ে ডান হাতে ধরে রাখা ছোট বোমাটার পিন খুলতে চেষ্টা করছিল। আমিও দ্রুত ওর ডানহাতের কনুই চেপে ধরলাম।

কণ্ডাকটর পালাতে সক্ষম হয়েছে। বদরু নাকি সারাক্ষণ বাসের মধ্যে গাঁজা চরস খাচ্ছে, বাসের সব জানালা বন্ধ, দরজাও ভেতর থেকে সে বন্ধ করে দিয়েছে। সে নিজেও কিছু খায়নি, কাউকে খেতেও দেয়নি।

হাসপাতালেই এস.পি.সাহেবের ফোন পেলাম। তিনি বললেন, 'ডেপুটি কমিশনার সাহেব তোমাকে একটা সুযোগ দিতে অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু কোন মেয়ের গায়ে যেন একটুও আঁচড় না লাগে'।

আমি দ্রুত ফিরে এলাম থানায়। তখন ভোর সাড়ে চারটে। শীতের রাত। বেশ অন্ধকার। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাতপা যেন জমে যাচ্ছে, তার ওপর কনকনে হাওয়াও বইছিল। আমি একটা পেতলের পাত্রে খাবার নিয়ে রওনা হলাম। ঘটনাস্থলে পৌঁছে বেশ কিছুটা দূরে জীপ থেকে নেমে হাতে খাবারের পাত্র নিয়ে আবছা অন্ধকারে বাসটার দিকে এগোলাম। হেঁকে বললাম, 'বদরু খাবার এনেছি।'

আমি হতাশ হলাম। একটা জানালা খুলে একটা মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে পাত্রটা নিয়ে নিল। ষোলো ঘন্টা ধরে এই বাসটা এক পাগল আটকে রেখেছে। ওর মধ্যে কুড়িজন ছাত্রী, একজন লেকচারার, আর একটি দু'বছরের বাচ্চা মেয়ে বন্ধ সময় কাটাচ্ছে, ষোলো ঘন্টা তারা কিছু খায়নি। আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। একবার ভেবেছিলাম বদরুর খাবারে বিষ মিশিয়ে দিই, তারপর সে পরিকল্পনা বাতিল হয়। বদরু যদি কোন মেয়েকে খাবারটা খাইয়ে পরীক্ষা করে নেয়।

খাবারের পাত্র ভেতরে ঢুকিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দেওয়া হলো। আমি ভাবলাম, চাকরি থাক আর না থাক একটা কিছু করি। বেশ কিছু সময় চুপ করে পড়ে থাকলাম। তারপর নিঃশব্দে বাসটার অন্য দিকে গুঁড়ি মেরে চলে গেলাম। বদরু তো সামনের দিকে, আমি তাই পেছনের দিকটাই বেছে নিলাম। তারপর দু'চাকার মাঝখান দিয়ে বাসের তলা ঘেঁষে ড্রাইভারের আসনের নিচে পৌঁছে গেলাম। হাত দিয়ে বাসের গায়ে আওয়াজ করে লুকিয়ে পড়লাম, কিন্তু দৃষ্টি স্থির রাখলাম ড্রাইভারের জানালায়। আমার অনুমান ঠিক, জানালাটা খুলে বদরু মাথা বের করে দেখতে চেষ্টা করছে, কিসের শব্দ। আমি অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাফ মেরে তাঁর মাথার চুল আঁকড়ে ধরলাম। প্রচণ্ড ক্রোধে আর ঘৃণায় আমি তখন উন্মাদ। নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পুরো মাথাটা ধরে টানতে থাকলাম ওকে।

জানালার কাচ ভেঙে পড়ল ঝনঝন করে। বদরুর দেহ প্রায় অর্দ্ধেক বেরিয়ে এল। গাঁজা চরস খেয়ে খেয়ে ওর অবস্থা এমনিতেই তখন ঢিলে, তার ওপর ষোলো ঘন্টা কিছু খায়নি। এর মধ্যেই সে তার মুখ দিয়ে ডান হাতে ধরে রাখা ছোট বোমাটার পিন খুলতে চেষ্টা করছিল। আমিও দ্রুত ওর ডানহাতের কনুই চেপে ধরলাম। বাসের মধ্যে তখন হৈ চৈ, ভীত সন্ত্রস্ত চেঁচামেচি, কান্না সব মিলিয়ে আতঙ্কজনক পরিস্থিতি। আমি চেঁচিয়ে মেয়েদের উদ্দেশ্যে বললাম, 'দরজা খুলে শীগগির পালান আপনারা।'

ভয় পাচ্ছিলাম, বোমাটা যদি সত্যি ফেটে যায়—আমি মারা পড়লে পড়বো, বদরুটাও শেষ হবে। মেয়েরা ততক্ষণে দরজা খুলে ছুটতে শুরু করেছে। আমি শরীরের সব শক্তি দিয়ে বদরুকে টানতে থাকলাম, আর ডান হাতের কনুইটা মুচড়ে দিলাম, তারপর পুরো ধড়টা জানলা দিয়ে টেনে নিয়ে মাথাটা এমনভাবে ঘুরিয়ে দিলাম, যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে তার জ্ঞান ফেরাতে ডাক্তারদের বহু পরিশ্রম করতে হবে।

এরই মধ্যে আমার সহকর্মীরা বুটের আওয়াজ তুলে পৌঁছে গেছে দলে দলে। কয়েকমিনিটের মধ্যে অবস্থা আমাদের আয়ত্তে চলে এল।

এর দিনকয়েক পরে আমি একটা বিয়ের নেমন্তন্ন পেলাম। বিয়েটা ছিল নাজমার সঙ্গে শওকতের। সে বিয়ের অনুষ্ঠানে এস.পি.এবং ডি.এস.পি.সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। দুই পরিবারে তখনকার সৌহার্দ্য দেখবার মতো। ●

সারা দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ লোক গুড নাইট দিয়ে মশাদের শুভরাত্রি জানাচ্ছেন!

আর আপনি ?

মশা প্রতিরোধ করার নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য উপায়

সারা দেশের লক্ষ লক্ষ লোক গুড নাইট ব্যবহার ক'রে পরখ করেছেন। আজ পর্য্যন্ত যতগুলি মশা প্রতিরোধকারক আছে, তার মধ্যে এটিই হ'ল সবচেয়ে বেশী নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য।

স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক নয়, আর না কোনো ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়

না এ দিয়ে হয় গলা বন্ধ করা ধোঁওয়ার রাশি, না কোনো ছাই ঝরে, আর না থাকে চিটচিটানি-ভাব। শুধু একটি মৃদু সুগন্ধ থাকে, যা মশাদের দূরে রাখে — রাতের পর রাত, বছরের পর বছর ধরে।

ব্যবহার করাও অতি সহজ

গুড নাইট ব্যবহার করা খুব সহজ।

গুডনাইট-টি শুধু হিটার প্লেটের ওপর বসিয়ে দিয়ে প্লাগ লাগান, আর স্যুইচ জ্বালান...ব্যস্, তারপর মশার হাত থেকে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

আরও ভাল ফল পেতে হলে, কিছুক্ষণের জন্যে ঘরের দরজা, জানলা বন্ধ রাখুন।

বিশেষ ভাবে তৈরী গুড নাইট ম্যাট্স

সবচেয়ে সেরা ফল পেতে হলে, আপনার ইউনিটটিতে শুধু গুড নাইট ম্যাট-ই ব্যবহার করুন। এটি যাতে রাত-ভর এর প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে পারে সেজন্যে আমাদের আমদানী করা জাপানী রসায়ন দিয়ে আমাদের নিজস্ব গবেষণাগারে অতি সযত্নে এর ক্রমোন্নয়ন সাধন ক'রে থাকি।

Good Knight

"Switch-on" Freedom from Mosquitoes

30 MATS

সুমিটোমো-র জাপানী প্রয়োগ কৌশল

গুড নাইট্ হ'ল এমন এক মশা প্রতিরোধকারক যা, তৈরী করা হয়, জাপানের সুমিটোমো কেমিক্যাল্‌স লিমিটেডের বিশ্ববিখ্যাত জাপানী প্রয়োগ কৌশল ও অতি উৎকৃষ্ট আমদানী করা সব উপাদান দিয়ে।

তাই, এটিই যে দেশের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর ইলেকৃট্রিকে মশা প্রতিরোধকারক তা জেনে, আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। এর এই এতসব সুবিধের কথা শুনে, নিজের কাছেও একটি রাখতে কে না চাইবে, তা বলুন না।

"স্যুইচটি জ্বালান", আর মশার হাত থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

'স্বপ্ন-মধুর' গুড নাইট-এর ঘুমে বিভোর থাকুন

প্রস্তুতকারক: ট্রান্সলেক্টা ১২৬, ক্রিয়েটিভ ইণ্ডাস্ট্রীয়াল বিল্ডিং, সুন্দরনগর, কালিনা, বম্বে ৪০০ ০৯৮ ফোন: ৬১৪৪৬৬১, ৬১৪০৬২৭

Creative Unit 6547 Ben.

৪৭ পৃষ্ঠার পর

নম্বর চেয়েছিলেন। তাতে রবিকান্ত বলেছিল, প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির ফোন নম্বর বড় সিক্রেট ব্যাপার, দেওয়া যাবে না।

যাইহোক, শেষপর্যন্ত বিয়েটা হয়ে গেল। রবিকান্তের কোনো আত্মীয় সে বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন না। বিয়ে হয় ১৯৮৬–র ৮ জুন। বরযাত্রী এসেছিলেন ৮-১০ জন। বিয়েটা হয়েছিল রবিকান্ত–এর প্রতিবেশী গুরুবকস সিংহের বাড়ি থেকে। গুরুবকস সিংহ ও তাঁর স্ত্রী, পুত্রও এসেছিলেন বরযাত্রী হিসেবে। গুরুবকস সিংহ রবিকান্তের অভিভাবকরূপে দায়িত্ব পালন করেন।

সরোজ বরকে নিয়ে হানিমুনে গেলেন উটি–তে। পরে জানা যায়, পুরো খরচখরচা ছিল সরোজেরই। সরোজের অনুরোধে রবি শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি রক্ষাকুঞ্জ অঞ্চলে একটি বাসা ভাড়া করে থাকতে শুরু করে। মাসখানেক বেশ আনন্দেই কাটে। এরপর দু'জনেই অফিসে জয়েন করে। মাস ফুরোলে সরোজ মাইনে পায়। কিন্তু রবিকান্ত কোনো মাইনেপত্র পেল না। ব্যাপার কি? রবি গতমাসটা বিয়েশাদির জন্য ছুটিতে ছিল, ওঁর তো ছুটিছাটা পাওনা নেই, তাই ও 'উইদাউট পে' হয়েছে। সরোজ সরলমনে সে কথাও বিশ্বাস করেন। পরের মাসেও রবিকান্ত মাইনে পেল না। এবার তার অজুহাত, এক অসুস্থ সহকর্মীর সাহায্যার্থে অফিসের সকলে মিলে প্রত্যেকে পুরো বেতন দান করেছে। সরোজের এবার সন্দেহ হল, কিন্তু সে মুহূর্তে আর কিছু না বলে তিনি চুপ করে থাকলেন। পরের দিন তিনি রবি–কে বললেন, 'তোমার এম বি বি এস সার্টিফিকেটটা দেখি একবার।'

রবিকান্ত স্ত্রীকে ধমকে উঠল। ধীরে ধীরে সরোজের কাছে সব ফাঁকি ধরা পড়ে গেল। রবিকান্তের কোনো ডিগ্রি তো নেই, উপরন্তু একপয়সাও রোজগার নেই তার। সরোজের সব স্বপ্ন ও আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল, এক অন্তহীন বিষাদ যেন গ্রাস করল তাকে। তবু সে চেষ্টা করেছিল যেভাবে হোক মানিয়ে নিতে। কিন্তু মানিয়ে নেবারও একটা সীমা আছে। মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে, রবি সরোজের গায়ে হাত তুলতে শুরু করে। সরোজ বাবা মাকে সব খুলে বলেন। তাঁরা তো সব জানতে পেরে হতবাক। আদরের মেয়ে, এত উচ্চশিক্ষিত মেয়ে–তার সঙ্গে এত বড় প্রতারণা–কিভাবে হলো, তাঁরা ভেবে পেলেন না। সকলেরই মন ভেঙে গেল।

যাইহোক, মা'র পরামর্শে সরোজ ফের রবিকান্তের সঙ্গে ঘর করতে চেষ্টা করলেন। এরমধ্যে রবিকান্ত আসফ আলি রোডের ইনট্রেডস প্রাইভেট লিঃ নামে একটা প্রাইভেট ফার্মে মোটামুটি চাকরি যোগাড় করে। চাকরি পাওয়ার পর থেকে তার মেজাজ আরো রুক্ষ হয়ে ওঠে। অহংকার বেড়ে যায়। সরোজ মুখ বুজে সব সহ্য করে যেতে থাকেন। এছাড়া তার আর কোনো উপায়ও ছিল না।

১৯৮১ সালে সরোজ এন·ডি·এ–র অধীনে নির্মিত একটি ফ্ল্যাট বুক করেছিলেন। কিস্তির টাকা কখনো কখনো তাঁর বাবাও দিয়ে দিতেন। ১৯৮৬ সালে ফ্ল্যাটটি সরোজের নামে অ্যালটেড হয়। রবিকান্ত শাশুড়ীর কাছে গিয়ে ফ্ল্যাটের চাবি চেয়ে নেয়।

রক্ষাকুঞ্জের বাড়ি ছেড়ে সরোজ স্বামীকে নিয়ে নিজেদের নতুন ফ্ল্যাটে উঠে আসেন। রবিকান্ত ফ্ল্যাটের বাইরের গেটে নিজের নামের পাশে এম বি বি এস লিখে নেমপ্লেট লাগিয়ে নেয়, সরোজের আপত্তিতে সে কান দেয় না। উপরন্ত শ্বশুরবাড়ি থেকে দূরে চলে আসায় তার সাহসও বেড়ে যায়। বাড়িতে সমপর্যায়ের বন্ধুবান্ধব নিয়ে, হৈহল্লোড়, নিম্নস্তরের আলোচনা চলতে থাকে নিয়মিত। শরীর ও মন দুইই বিপর্যস্ত হতে থাকে সরোজের। এসময় সরোজ নিজের ডায়েরিতে লিখেছিলেন, 'বিয়ের আগে জীবনটা ছিল এক রঙীন স্বপ্ন। বিয়ের পর হয়ে উঠেছে দুঃস্বপ্ন। শুধুই ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতার আসল কারণ ভুল লোকের সঙ্গে বিয়ে। দুর্বল, মানসিকভাবে অসুস্থ, অলস, কুঅভ্যাস ভরা, স্টুপিড একটা লোক আমার স্বামী। কথায় কথায় চেঁচামেচি, ভাঙচুর, মারপিট করায় জুড়ি নেই।'

সরোজের ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল। রবিকান্ত এটা লক্ষ্যই করেনি। বিয়ের পর সরোজ ডায়েরিতে এমন একটা কথাও লেখেননি যাতে মনে হতে পারে যে তাঁর একটা দিন অন্তত আনন্দে কেটেছে। একজায়গায় তিনি লিখেছেন, '···স্বামীর অসম্মানজনক ব্যবহারে আমি টিকতে পারছি না, বাপের বাড়িতেও সেভাবে স্থান পাই না, কোথায় যাই? আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পরও একটি মেয়েকে অপরের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাটাই ঠিক না···।'

অন্যত্র সরোজ লিখেছেন, '···কোথাও পড়লাম, ছোটবেলায় যেসব লোকেরা স্নেহমমতা পায়·না, বড় হয়ে তারা বদমেজাজী, রুক্ষ হয়ে ওঠে। এসব ভেবে আমি মনোবিজ্ঞানীর মতন করে ওর সমস্যাটা ভাবতে শুরু করি, চেষ্টা করি ওকে শুধরে তুলতে। কিন্তু ওর ব্যাপারটা ছিল সবকিছুর বাইরে...।'

সরদার গুরুবকস সিংহের মেয়ে জগজিৎ কাউর সরোজের প্রিয় বান্ধবী হয়ে উঠেছিলেন। 'নিউজ টাইমস'–এ কর্মরতা হরমিন্দর কাউর নামে আরেকটি মেয়েও সরোজের খুব বন্ধু ছিলেন। ওঁরা পরামর্শ দিলেন, 'যদি দেখ, কোনোমতেই আর মানিয়ে চলা সম্ভব হচ্ছে না, নিজের পথ খুঁজে নিও–তোমার চাকরি আছে, ভয় কি।'

সরোজ ডিভোর্সের কথা ভাবলেন। কিন্তু মা'র কাছ থেকে সমর্থন তো দূরের কথা, ঘোর বিরোধিতা আসায় তিনি চেপে গেলেন। এদিকে রবিকান্ত প্রতিদিন মদ্যপান করে আসে, অকথ্য গালিগালাজ করে সরোজকে। সরোজ চেষ্টা করেছিলেন রবির বন্ধুরা যাতে অন্তত কিছুটা সাহায্য করতে পারে। তারাও সব এক পদের। ওদের বক্তব্য ছিল, 'ওর সঙ্গে না পোষায়, আমাদের সঙ্গে থাকো। ওকে বোঝানো যাবে না। আমরা পারবো না।'

সরোজের এক বন্ধু ছিলেন খলিল জাহিদ খান। ছ'সাত বছর আগে জাহিদ আকাশবাণী দিল্লিতে নিউজ এডিটরের চাকরি করতেন। জাহিদ বিবাহিত, দুটি সন্তানের পিতা। তিনি বর্তমানে বোম্বাইতে কৌমী একতা প্রেসে কাজ করেন। ওদিকে '৮৮ সালের জানুয়ারিতে রবিকান্ত কম্যুনিস্ট সেন্টার, নিউ ফ্রেন্ডস কলোনি–স্থিত মোদি সিমেন্ট অফিসের প্রচার-অধিকারীর কাজে জয়েন করে। সে নাকি এসময় সাধুরাম নামে এক তান্ত্রিককে দিয়ে বাড়ি মন্ত্রপূত করায়, কারণ, বাড়িতে ভীষণ অশান্তি হচ্ছে, শান্তির প্রয়োজন।

২৩ মে '৮৮ তারিখে রবিকান্ত সরোজকে বাপের বাড়িতে রেখে আসে। কোম্পানির কাজে সে কয়েকদিনের জন্য রায়পুর যাচ্ছে, সেই ক'দিন সরোজ বাপের বাড়ি থেকেই অফিসে যাতায়াত

বিয়ের পর সরোজ ডায়েরিতে এমন একটা কথাও লেখেননি যাতে মনে হতে পারে যে তাঁর একটা দিন অন্তত আনন্দে কেটেছে। একজায়গায় তিনি লিখেছেন, '...স্বামীর অসম্মানজনক ব্যবহারে আমি টিকতে পারছি না, বাপের বাড়িতেও সেভাবে স্থান পাই না, কোথায় যাই? আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পরও একটি মেয়েকে অপরের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাটাই ঠিক না...।'

করবে, এরকম কথাবার্তা হয়। ২৭ মে রবিকান্ত –এর বন্ধু অনিল যোশী সরোজের দাদাকে টেলিফোন করে জানায়, ২৮ তারিখ রবি দিল্লী ফিরবে, সরোজ যেন নোওএডা–য় ফ্ল্যাটে চলে আসে। ৩০ মে অফিস থেকে সরোজ বাপের বাড়িতে না ফিরে সোজা নিজের ফ্ল্যাটে চলে আসে। রবিকান্ত বাড়িতেই ছিল।

৪ জুন রবিকান্ত নোএডার সেকটর ২০ থানায় লিখিত বিবৃতি দিয়ে আসে যে, সেদিন সন্ধে ছ'টায় বাড়ি ফিরে সে দেখে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ এবং বারবার ডাকাডাকি ও ধাক্কা দেওয়া সত্ত্বেও দরজা খুলছে না। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে সে দেখে, তার স্ত্রী সরোজ শোবার ঘরে ফ্যানের হুকে দড়ি ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সে দ্রুত দড়িটা কেটে স্ত্রীকে বিছানায় শুইয়ে প্রতিবেশী ডাক্তার শ্রী ভারতভূষণকে ডেকে নিয়ে আসে। ডাক্তার এসে সরোজকে মৃত ঘোষণা করেন।

থানা থেকে এস আই মি: আর পি শুক্ল এবং শ্যাম সিংহ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে গেলেন। তাঁরা সরোজের মৃতদেহের কাছে একটা টুলের ওপর একটি ডায়েরি এবং একটি আত্মহত্যার নোট আবিষ্কার করেন। ডায়েরির পাতায় সরোজ তার দুঃখের কথা লিখে রেখেছিলেন, আর আত্মহত্যার নোট হিসেবে একটুকরো কাগজে লিখে রেখে গিয়েছিলেন: 'আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি। এরজন্য কেউ দায়ী নয়। সরোজ পাণ্ডে, ৪·৬·৮৮ দুপুর ২–১৫ সময়।' ডায়েরি ও আত্মহত্যার নোট পুলিশ নিজের হেফাজতে রাখে। রাত পৌনে এগারোটা নাগাদ সরোজের বাপের বাড়িতে ওঁর মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে দেওয়া হয়। সরোজের বাবা-মা, দাদারা সঙ্গে সঙ্গে নোএডা চলে এলেন। পুলিশ কিন্তু সরোজের মৃতদেহ তাঁদেরকে দেখাতে চাইল না। পরের দিন সকাল সাতটায় মৃতদেহ দেখানো হল। আশ্চর্যের বিষয়, ফ্ল্যাটে রবিকান্তকে পাওয়া যায়নি।

আশ্চর্যের আরো কিছু ছিল–সরোজ যে টুলের ওপর দাড়িয়ে গলায় ফাঁস লাগান, সেই টুলটি দাঁড়ানো অবস্থাতেই ছিল, অথচ ওটাকে পা দিয়ে উল্টে না দিলে তো সরোজের পক্ষে মরা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, কারো সহায়তা ছাড়া রবিকান্ত গলার দড়ি কেটে মৃতদেহটিকে বিছানায় শুইয়ে রেখেছিল, একটু অস্বাভাবিক নয় কি? প্রতিবেশীরাও কিছু জানতে পারেনি। তৃতীয়ত, দড়িটা দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সরোজের দেহের ভার ওটার পক্ষে ঝুলিয়ে রাখা বেশ কঠিন।

কিন্তু, সরোজের ডায়েরি এবং আত্মহত্যার স্বীকারোক্তি উপরোক্ত সন্দেহগুলিকে দুর্বল করে তোলে। ডায়েরির মধ্যে সরোজ উইল–এর মতো করে লিখে রেখে গিয়েছেন, 'সেকটর–২০, নোএডা–স্থিত ই–১১১ নম্বর আমার ফ্ল্যাটটি আমার ভাই অনিল পাণ্ডেকে যেন দেওয়া হয়, তিনি কিন্তু এটি বেচতে পারবেন না। ফরিদাবাদে আমার নামে এক একরের একটি প্লট আছে, আমার

সরোজ যে টুলের ওপর দাড়িয়ে গলায় ফাঁস লাগান, সেই টুলটি দাঁড়ানো অবস্থাতেই ছিল, অথচ ওটাকে পা দিয়ে উল্টে না দিলে তো সরোজের পক্ষে মরা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, কারো সহায়তা ছাড়া রবিকান্ত গলার দড়ি কেটে মৃতদেহটিকে বিছানায় শুইয়ে রেখেছিল, একটু অস্বাভাবিক নয় কি? প্রতিবেশীরাও কিছু জানতে পারেনি। তৃতীয়ত, দড়িটা দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সরোজের দেহের ভার ওটার পক্ষে ঝুলিয়ে রাখা বেশ কঠিন।

সুটকেশে তার দলিলপত্র, রয়েছে–ওটি পাবেন বোম্বাই–এর খলিল জাহিদ খান। তিনিও ঐ সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবেন না। তিনি ইচ্ছে করলে ঐ জমি আমার ভাইঝি মিশা ও তাশা এবং জাহিদের মেয়ে সীমা ও লুবনার মধ্যে ভাগ করে দিতে পারেন অথবা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করতে পারেন। প্রেসও বসাতে পারেন, সেই প্রেসের আয় থেকে সঞ্চিত অর্থ আমার উপরোক্ত দুই ভাইঝির বিয়ে–তে খরচ করা যেতে পারে।'

'আমার কানের দুল, হার, চুড়ি আমার মাকে যেন দেওয়া হয়। তিনি সেসব অনীতা কিংবা মিশা–কে দান করতে পারেন। (অনীতা হচ্ছেন অনিল পাণ্ডের স্ত্রী, মিশা তাঁর মেয়ে)। কণ্ঠীহার সেট ও ছোট টপস খলিল জাহিদ খানের মেয়ে সীমাকে দিলাম। বিয়ের আংটি আমি রবিকান্তকে ফেরৎ দিয়েছিলাম, ওটা তার কাছেই থাকুক। আমার সব শাড়ি মা এবং অনীতাকে দিচ্ছি। ওগুলোর মধ্যে একটা করে নতুন শাড়ি অঞ্জু ও সুধা–র বিয়েতে যেন উপহার দেওয়া হয়। তাদের বিয়েতে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে পাঁচশো পাঁচশো করে টাকাও আমি দিয়ে যাচ্ছি। (অঞ্জু ও সুধা আকাশবাণী দিল্লীর কর্মী, দর্শন সিংহ সিধু'র দুই মেয়ে)। আমার সমস্ত স্যুট অঞ্জনা তেওয়ারি ও সঙ্গীতা তেওয়ারির জন্য থাকল। ওদের বিয়েতেও আমার অ্যাকাউন্ট থেকে দু'হাজার করে টাকা যেন দু'জনকে দেওয়া হয়। (অঞ্জনা ও সঙ্গীতা হচ্ছে সরোজের মামাতো বোন)।

একটা চেন, আংটি দুটো, লুজার টপস–মিশা ও অনীতার। নকল গয়নাগুলো ও রূপোর সেট অনীতার। আমার কলমগুলি অনিল পাণ্ডে পাবেন। উনি সেগুলি পরিবারের অন্যান্যদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারেন। গ্যাসস্টোভটা রবিকান্ত নিতে পারে। আমার অন্ত্যেষ্টি–ক্রিয়ার জন্য আমার লকারে রাখা ১২০০ টাকা এবং পার্সের ৩৬০ টাকা খরচ করা যেতে পারে। আমার সঞ্চিত সব অর্থ মা রাখবেন। বাবা ও মিশা'র পেছনে সেসব তিনি খরচ করতে পারেন। ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা আমার মা বাবা দাদা ভাইয়েরা বেড়ানো ইত্যাদির জন্য খরচ করতে পারবেন। আমার জি পি এফ এবং অন্যান্য ফাণ্ডের টাকাপয়সা সব মার। আমার বান্ধবী ভক্তিপ্রভার বিয়েতে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে যেন এক হাজার টাকা দেওয়া হয়। জগজিৎ কাউর–কে এক হাজার টাকা দিতে হবে, সে ওর মেয়ে দীপার নামে ঐ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করিয়ে নেবে। আমার ডায়েরিগুলি এবং বইপত্র আমার সাংবাদিক বান্ধবী হরমিন্দার কাউরের জন্য রইল। ইচ্ছে করলে সে বইগুলো দিল্লী দূরদর্শনের লাইব্রেরিতে দান করেও দিতে পারে। আমার রিস্টওয়াচটা ভাই প্রবীণের স্ত্রী সবিতার জন্য রেখে গেলাম। আমার নগদ জমা ২০ হাজার টাকা আমার মা'র জন্য। এই ফ্ল্যাটের বাক্স ইত্যাদি রবিকান্ত নেবে।'

রবিকান্ত–কে সরোজ একটাও ভালো দামী কিছু দিয়ে যাননি। মোহননগর হাসপাতালে সরোজের পোস্টমর্টেম হয়। রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ শ্বাসরোধ বলে উল্লেখ করা হয়। সরোজের মা বাবা ভাইদের হাতে মৃতদেহ তুলে দেবার পর নিগমবোধঘাটে তা সৎকার করা হয়। এরমধ্যে কিন্তু রবিকান্ত একবারও আসেনি, সে তার বন্ধু অনিল যোশীর ফ্ল্যাটে ছিল।

এরপর অনিল পাণ্ডে বোন সরোজের মৃত্যুর ব্যাপারে রবিকান্তকে সন্দেহ করে সেকটর–২০ থানায় ৭ জুন অভিযোগ দায়ের করেন। ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩০৬।৪৯৮।এ।৪৬৮ এবং ৪২০ ধারায় অভিযোগ গৃহীত হয়। এস আই শ্যাম সিংহ তদন্তের ভার নেন। রবিকান্তের এম বি বি এস লেখা নামের প্লেট, ফ্ল্যাটের মধ্যে রাখা ওষুধপত্রের বাক্স সব পুলিশ সীজ করে। ৯ জুন রবিকান্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদের পর রবিকান্তকে মীরাট জেলে পাঠানো হয়। এক সপ্তাহ পর তার জামিন মঞ্জুর হয়। সরোজ এক জায়গায় তার ডায়েরিতে লিখে গিয়েছিলেন, 'আমি মরতে চাই না। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পড়ে আমাকে এইকাজ করতে হচ্ছে। মৃত্যুই এখন সহজ পথ।'

–পুষ্কর পুষ্প

ফটো তোলার সঙ্গে প্রথম হয় একশ বছর আগে পরিচয়!

হায়দ্রাবাদের লালা দীন দয়ালের সংগ্রহ শালা থেকে : এক শত বছরেরও আগের ফটোগ্রাফ।

পরিবার জনের ফটোর অ্যালবাম খুলে ধরে, মন যেন আনন্দে যায় ভরে।

পুরানোকালের চমৎকার সব ছবি ··· নানা রঙের দিনগুলি ভাসে মানসপটে ···

··· শুধু ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটে। ষাট, সত্তর বা একশ বছর আগে তোলা, আজও স্পষ্ট, জীবন্ত রূপের ছবি, যায় নাকো ভোলা।

সেকালের বা একালে এটা চিরপছন্দের, চিরকালের।

সুতরাং, ছবি তুলে অ্যালবামে রাখতে ভরে, শুধু ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট ফিল্মে রাখুন ধরে।

দেখবেন, আনন্দে মন উঠবে ভরে···যুগ যুগ ধরে।

স্মৃতি যদি কভু হয় ম্লান ···
ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটে ছবি থাকে অম্লান!

ইন্দু ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট রোল ফিল্ম আর ব্রোমাইড পেপার।

Sista's – HPF.956.88 BEN

পরিচালক পি কুমার বাসুদেব (বাঁয়ে), একটি দৃশ্য পরিচালনার আগে

৫০ পৃষ্ঠার পর

ধরনের উৎসাহ নিয়ে বাসুদেব বললেন, 'এই দূরদর্শন ধারাবাহিকটিতে আমি মানুষের নৈতিক ও আদর্শগত মূল্যকে আঘাত করতে চেয়েছি। যাতে সাধারণ মানুষের মনে একটি বিশেষ ছাপ পড়ে।' 'ভোর একদিন হবেই'—এই আশা নিয়ে তারাশংকর কাহিনীটি শেষ করেন। আমরা তো তাঁর সেই উপলব্ধিকে বদলাতে পারি না। আমরা এই আশা নিয়েই থাকব, সুদিন একদিন আসবেই—বাসুদেবের এই প্রচেষ্টার পেছনে যে সাহস লুকিয়ে আছে তা নিশ্চয়ই আশার উদ্রেক করে।

দূরদর্শনের বদ্ধ আবহাওয়ায় ঘূর্ণিঝড় এনেছিল পি.কুমার বাসুদেবের 'হমলোগ'। ১৫৬ টি এপিসোডে ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিফলন ঘটেছিল এই ধারাবাহিকে। ভারতীয় দূরদর্শনে এ যেন এক ইতিহাস সৃষ্টি। গতানুগতিকতার বাইরে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছিল 'হমলোগ'।

সত্যিকথা বলতে কি, তার নামের শুরুর 'পি' অক্ষরটি সহ বাসুদেবকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিখ্যাত করে তুলেছে। তাঁর পরিচালিত ইংরেজি এই কাহিনী চিত্রটির নাম 'অ্যাট ফাইভ পাস্ট ফাইভ'। ১৯৬৯—এর শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্র হিসেবে এটি গান্ধী পুরস্কার পায়। বাসুদেব বললেন, 'যৌবনই জাতির মেরুদণ্ড। আমি সেই যুব সমাজকেই বেশি ভালবাসি।' 'হমলোগ'—এর পাইলট (প্রাথমিক রূপ রেখা) দেখে 'দূরদর্শন'—এর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নাকি তাঁকে বলেছিলেন—সিরিয়ালটির সাফল্যের কোনও সম্ভাবনা নেই। স্টোরি লাইনে এমন কিছু ফ্যান্টাসি নেই, শিল্পীরাও তো খুবই সাধারণ মানের আর অপরিচিত। তাঁর কথায় বাসুদেবের জবাব ছিল 'হমলোগ ক্লিক করবেই'। এই ধারাবাহিকে বশেশ্বররাম ও তাঁর পরিবারকে দেখার জন্য, তাদের দৈনন্দিন জীবনকে, মধ্যবিত্ত জীবনের গতানুগতিকতার মধ্যেই আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নকে দেখার জন্য দর্শকেরা উদগ্রীব হয়ে থাকতেন সপ্তাহের পর সপ্তাহ। বড়কি, মজলি, লাজবন্তী, নন্নেকে দেখার জন্য সেই সাপ্তাহিক অপেক্ষা ভারতীয় দূরদর্শনের ইতিহাসে একেবারে নতুন ব্যাপার।

অন্যদিকে সেই একই সময়ে 'খানদান'—ও টেলিকাস্ট হত। একটি সাবান প্রস্তুতকারক সংস্থা এটি স্পনসর করেছিল। কিন্তু 'হমলোগ'—এর মত 'খানদান' এত জনপ্রিয় হয় নি। বশেশ্বররামের পরিবারের প্রতি একাত্ম তাঁরাই বোধ করত যাঁরা একেবারেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, বিশেষ কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে যাদের চিহ্নিত করা যায়। দূরদর্শনে 'হমলোগ' কেই বাণিজ্যিকভাবে সফল প্রথম সিরিয়াল বলা চলে। এ প্রসঙ্গে যখন প্রশ্ন তোলা হয় তখন তিনি বলেন, 'যে কোন সিরিয়ালকে কমার্শিয়াল করার জন্য উদ্দেশ্য হল—বিভিন্ন উদ্যোক্তার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া, ছবি পরিচালনায় আর্থিক অসুবিধে হয়ত থাকে না কিন্তু জানেন এতে করে ধারাবাহিকগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ তো অর্থের দিকটা ভাবে না। তাঁরা ভাবেন নান্দনিক দিকটি। তাই এক এক সময়ে মনে হয় 'হমলোগ' না করলেই পারতাম।'

মনে হ'ল বাসুদেব যেন খানিকটা বিষণ্ণ। তিনি বললেন, 'হমলোগ'—এর জনপ্রিয়তা মানুষকে এতখানি আবেগপ্রবণ করে তুলেছে যে এক একসময়ে নিজেকে ভীষণ দোষী মনে হয়।' তবু ভারতীয় এই সোপ অপেরাটিকে বি·বি·সি—টেলিভিশন পর্যন্ত অফার দেয়। বাসুদেবের এর পরের সিরিয়াল আজুবে ছিল ব্যয়বহুল। এটি কিন্তু খেটে খাওয়া মানুষদের নিয়ে নয়। তাছাড়া নতুন কোন মুখও ছিল না এই ছবিতে। ফরাসী নাট্যকার মলিয়ের—এর কাহিনী অবলম্বনে 'আজুবে' টি·ভি· সিরিয়ালটি জাঁকজমকপূর্ণ করেই তৈরি করেছিলেন তিনি। শাম্মী কাপুর, ইন্দ্রাণী মুখার্জি থেকে শুরু করে অনেক পরিচিত মুখের ভিড় ছিল
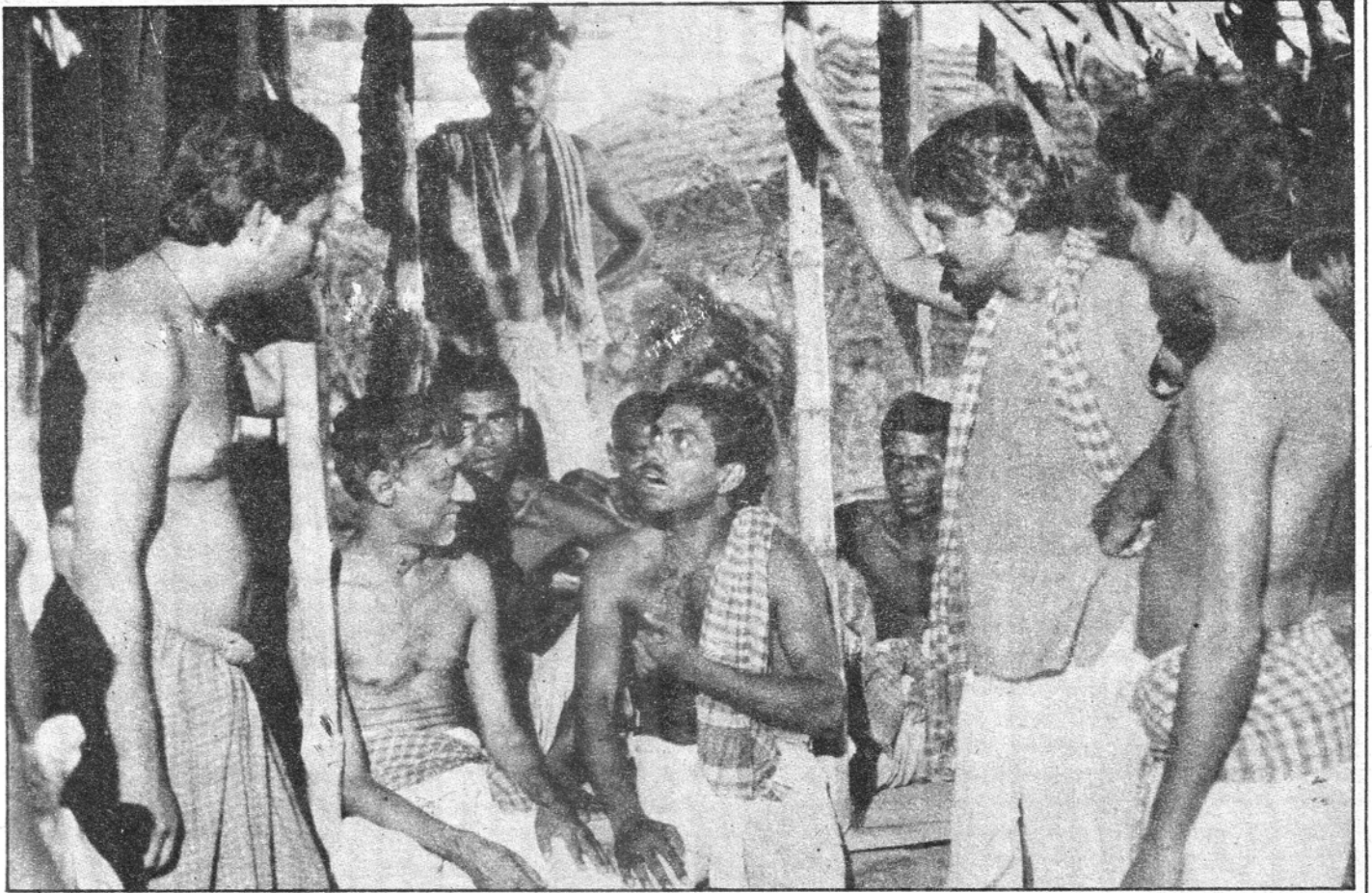
গণজাগরণের প্রস্তুতিতে!

এই সিরিয়ালে। কিন্তু এটি শেষপযন্ত ফ্লপ করে। বাসুদেব হতাশ কিছুটা নিশ্চয়ই হন কিন্তু তাঁর প্রয়াস থেকে সরে আসেননি। তবে তিনি শিক্ষা পেয়েছেন–এর থেকে। তিনি নিজেই বলেছেন 'হমলোগ' আমাকে একেবারে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যায় কিন্তু 'আজুবে'তে আমি একেবারেই কুপোকাত। একদিক দিয়ে আমার পক্ষে এ ভালই হল। না হলে আমার শিক্ষা হত না।' তিনি এটুকু বুঝেছিলেন যে, যখনই একজন শিল্পী মনে করতে থাকেন যে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের চরমসীমায় পৌঁছেছেন তখনই তিনি চরম ভুল করেন। 'অজুবে'র পরে আমার মনে হয়েছে কোন শিল্পীরই নিজেকে বড় মনে করা ঠিক নয়। মানুষ সব সময়ই শিক্ষার্থী। তার এই শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি কখনই হয় না। নিজেকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা, অন্তর্দর্শন–এ সব কিছুই চলছে, চলবে।' অনেক দিন ধরে তাঁর মনে এই বাসনা ছিল যে, সারা দেশের লোকের কাছে তিনি এই ধ্যানধারণা তুলে ধরবেন। সময়ের আবর্তে 'গণদেবতা' এখন মানুষের মনের গহীনে। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪১–৪২ সালে এই উপন্যাসটি লেখেন। ১৯৬৬ সালে এটি সর্বভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পায়। ১৯২৫ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত সময়সীমা, অর্থাৎ পঁচিশ বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় সাহিত্যফসল বলে অভিহিত করা হয় এটিকে। পি বাসুদেব অনেকদিন ধরেই এই ভারতীয় ধ্রুপদী উপন্যাসটি চিত্রায়ণের স্বপ্ন দেখে আসছিলেন, অবশেষে তাঁর স্বপ্ন সফল।

ধারাবাহিকটির পশ্চাদপট একদিকে প্রাচুর্যের পাহাড়। অন্যদিকে দারিদ্রের গহ্বর। এই দুয়ের মধ্যেকার মানুষজনের সংঘাত। পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রামের দরিদ্র, নিপীড়িত অধিবাসীদের জীবনের টানাপোড়েনকে তুলে ধরা হয়েছে এ ছবিতে। কাহিনীতে যে বিশেষ যুগটিকে তুলে ধরা হয়েছে সে যুগে গরীব লোকেরা জমিদারী প্রথার চরম অত্যাচারের শিকার হত। বাসুদেবের মতে সেই সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচটি এখনও অপরিবর্তিত। 'গণদেবতা' কতটা সফল হবে সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা হলে বাসুদেব বলেন, তিনি যে জীবন যে আশার উন্মেষকে তুলে ধরছেন ছবিতে তা দর্শকরা গ্রহণ করবেনই। বাসুদেবের নিজের উপরে বিশ্বাস অটুট।

বাসুদেব বলেন, 'বলবেন হয়তো জমিদারী-প্রথার বিলোপ তো ঘটেছে অনেক আগেই তা নিয়ে ছবি করে লাভ কি? কিন্তু সত্যজিৎ রায় কি 'জলসাঘর' 'অশনি সংকেত'–এর মত ছবি করেননি?' বাসুদেব জানেন পরিচালক তরুণ মজুমদারও বাংলায় এটিকে চিত্রায়িত করেছেন।

হ্যাঁ, যেখানে কিছুদিন আগে ছিলেন জমিদারেরা, এখন তাঁদের জায়গা নিয়েছেন রাজনীতিকেরা। তাই তফাতটা আর কোথায়? 'যে গ্রামে আমরা 'গণদেবতা'–র শুটিং করতে গিয়েছিলাম সেখানে সেই ১৯২০–২৫ সালের মতই অবস্থা। কলকাতার কাছেই গ্রামটি, অথচ এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। এখনও সেখানকার লোকেরা শুধু নুন আর কাঁচা লংকা দিয়ে ভাত খায়। কোন কিছুই বদলায় নি।' রামকৃষ্ণ মিশনের নামে যে জায়গাটির খ্যাতি, সেই নরেন্দ্রপুরের কাছেই একটি গ্রামে 'গণদেবতা'র স্যুটিং হয়। কলকাতা থেকে গাড়িতে ৩০ মিনিটের পথ হলেও গ্রামবাসীদের জীবনে গত পঞ্চাশ বছরেও কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু তাঁরা আশা করে আছে। বাংলার চলচ্চিত্র ও নাট্যজগত থেকেই চয়িত অধিকাংশ চরিত্রগুলি। পি বাসুদেব তাঁদের কাজকর্মে যথেষ্ট খুশি। তাঁর 'গণদেবতা'–র বাণী অন্ধকারের ওপারে সূর্যোদয় ঘটাবেই। গ্রামবাসীরা ও আমরা দর্শকেরা সেই আশাতেই থাকব।

ছবি: শৈলেন্দ্র সিং

ডঃ জয় দুবাসী

জয় দুবাসীর কলম

ক্ষমতা দখলের খেলা : অর্থনৈতিক ক্ষমতার একত্রীকরণ?

এস.কে.বিড়লা-অনাবাসী ভারতীয়দের অনুপ্রবেশে শঙ্কিত? ছবি: অনিল শর্মা

ইদানীং ভারতীয় কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে পরিবর্তন ঘটছে খুব দ্রুত। চটপট হাতবদল হয়ে যাচ্ছে কোম্পানিগুলোর, এত দ্রুত যে কর্মচারীরা পর্যন্ত জানার অবকাশ পাচ্ছেনা! অনাবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ীর আগমন বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

আমার এক বন্ধু যিনি বোম্বাই–এ চাকরি করেন তিনি আমাকে একটা মজার কথা বলেছেন। তিনি মাসের পর মাস এমন কি কোনদিনই তিনি জানতে পারেন না তিনি কোন বসের অধীনে চাকরি করছেন। তাঁর অফিস একই থাকে কিন্তু এত ঘন ঘন কর্মকর্তা বদলানো হয় যে তিনি কেবলমাত্র খবরের কাগজ পড়ে ব্যাপারটা জানতে পারেন। তবে আমার বন্ধুর একার কপালে তা ঘটেনি। সংস্থাগুলি বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কলকাতার লোকজনদের এত দ্রুত বদলান যে দিল্লির মন্ত্রীসভার রদবদলও এত ঘন ঘন হয় না। তবে বোম্বাইতে সাকুল্যে একটি মাত্র কোম্পানি রয়েছে, যেটি বোম্বাই–এর একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে গত দুবছর ধরে যুক্ত। গত বারো মাস অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে একই গোষ্ঠীর মধ্যে রয়ে গেছে এই সংস্থাটি।

এই মেরি গো রাউণ্ড–এর মজাদার খেলা শুরু হয়েছে অনাবাসী ভারতীয়দের মাধ্যমে, যারা স্বরাজ পালের ভারতে আবির্ভাবের সাথে সাথেই এদেশের বাণিজ্যখনিতে উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছিলেন। যাদের তেমন সঙ্গতি ছিল না তারা সরে গেছে, জায়গা পেয়েছে হুইলারের ডিলাররা যারা পলের কর্মপদ্ধতি, স্টাইল অনুসরণ করে ছিল। যখন মনোহর ছাবরিয়া এক জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে শ' ওয়ালেসকে কব্জা করে

নিতে সক্ষম হয়েছিলেন শার্লক হোমসের থেকেও সুকৌশলী প্যাঁচে, কেউই ভাবতে পারেন নি যে ছাবরিয়া এই বিশাল কাজটা এত সহজে সমাধা করতে পারবেন, একেবারেই অক্ষত অবস্থায়। ছাবরিয়ার এই সাফল্য অন্যান্য অধীর আগ্রহীদের সামনে নতুন রাস্তা খুলে দিল, সন্দেহ নেই। তবে এদের সকলেই যে অনাবাসী, এটা ঠিক নয়। অনেক এদেশীয় শিল্পপতি রয়েছেন যারা কর্পোরেট সেকটরে কাজ করছেন। এদের একজন 'বাজার'–এ কাজ করছেন, আবার আরেকজন দরকষাকষিতে ব্যস্ত। এ ব্যাপারে অবশ্য কেউ কেউ রিয়েল এস্টেটের কারবারে দর কষাকষি হাঁকছেন, আবার কেউ কেউ রাজনৈতিক যোগাযোগ তৈরি করে বেড়াচ্ছেন আখেরে লাভ হবে, এই আশায়।

এক চতুর্থাংশ, তাদের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব অধিগ্রহণ নিতান্তই শিশুসুলভ বিচার বুদ্ধির পরিচায়ক। আপনি শুধু বিগত কয়েকমাস ধরে এই ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি লক্ষ্য রাখুন, তাহলে দেখতে পাবেন ব্যাপারটা কত সহজসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের অধিকাংশ, যাদের ইক্যুয়িটি শেয়ার ৪০ শতাংশ বা তার বেশি তাদের 'ফেরা'র অন্তর্গত সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এইসব সংস্থাগুলি ক্রমাগত হাত বদল করে চলেছে। এছাড়া বেশ কিছু কোম্পানি রয়েছে, যারা আবার এই ফেরার আওতায় পড়ে না। তবে বিদেশের সঙ্গে ইক্যুয়িটি শেয়ারের ব্যাপারে ভাল লেনদেন রয়েছে। মজার ব্যাপার, বিদেশি ইক্যুয়িটি শেয়ারের হস্তান্তরের বিষয়ে যখন সরকার একটি কথাও জিগ্যেস করে

মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা অল উইন নিশানের শতকরা ২৬ শতাংশ দখল করে বসেছে। আর স্পারটেক কেমিকেলস নেভেলি সেরামিকসের নিয়ন্ত্রণগত ক্ষমতা কব্জা করে নিয়েছে। স্পেশাল স্টিল, বোম্বাই নির্ভর স্টীল মেটেরিয়ালের সংস্থা এখন টাটা স্টিলের বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে। অন্যদিকে মাদ্রাজের মেটার কেমিকেলস চেমপ্লাস্ট সংস্থাকে টেক্কা দিয়ে দিয়েছে। গুজব শোনা যাচ্ছে, বেস্ট অ্যান্ড ক্রম্পটন সংস্থা হিন্দুজারা নিয়ে নিয়েছেন। তবে চূড়ান্ত হস্তান্তর এখনো হয়নি। কিছুদিনের জন্য এ গুজবও ছড়িয়ে ছিল তাহলো লারসেন অ্যান্ড টুবরোর কোম্পানির দু শতাংশ শেয়ার কেনার সুবাদে ছাবরিয়ারা এটি কিনে নিয়েছেন। সর্বত্রই শুধু ছাবরিয়া। ঠিক আম্বানির রিলায়েন্সের মত।

ছবি: সুনীল সাক্সেনা

স্বরাজ পাল: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রাঙ্গন থেকে ভারতে!

ধাঁধাঁ রয়ে গিয়েছে একটি ব্যাপারে। সেটি হলো ছাবরিয়া এবং আম্বানি কী সরাসরি লারসেনের কাছ থেকে দুই শতাংশ শেয়ার কিনেছেন, না বোম্বাই-এর খোলা বাজার থেকে? তাঁরা যে ইক্যুয়িটি শেয়ার কিনেছেন তা নেহাৎ কম নয়।

মনু ছাবারিয়া: শ'ওয়ালেস নিয়ে ক্ষমতা প্রদর্শন

কিছুদিন আগে আমি আমার এই কলমে বলেছিলাম যে যদি অনাবাসীরা সত্যিই উৎসাহী হন, আমি জানিনা এই সময়ে তারা কীভাবে উৎসাহী হয়েছেন বা হতে পারেন–তাহলে তারা যে কোন সংস্থার সঙ্গে চোখ বুজে হাত মেলাতে পারেন। মূলধনের তুলনায় ভারতীয় সংস্থাগুলির ইক্যুয়িটি শেয়ার নেহাৎই কম। আমাদের দেশের সব থেকে বড় সংস্থা টাটার সামগ্রিক ইক্যুয়িটির পরিমাণ মাত্র ১৩৬ কোটি অথবা দশলাখের কম। বর্তমান সময়ে চালু শেয়ারের মূল্য প্রায় আটগুণ বা বলা যায় ৮০০ মিলিয়ান ডলারের মত। আপনি ৮০ মিলিয়ান ইউ এস ডলারের ১০ শতাংশ কিনতে পারেন। যা ছাবরিয়া বা হিন্দুজাদের মত মানুষদের কাছে বাদামের মতই এক টুকরো। এদের তো নিউ ইয়র্ক এবং জুরিখে অজস্র অ্যাকাউন্ট রয়েছে। টাটাদের নিজেদের সংস্থায় যে ক্ষেত্রে ৫ বা ৬ শতাংশ ইক্যুয়িটি নেই, সেক্ষেত্রে যে কেউ তাদের ১০ শতাংশ শেয়ার কিনে টাটা গ্রুপে বেশ হামবড়া ভাব দেখাতে পারেন।

অন্যান্য সংস্থাগুলি, যাদের অধিকাংশই টাটার

না তখন আপনি ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজও ভালভাবে চালিয়ে যেতে পারেন। যেন আপনি কোন একটি দোকানে গিয়ে একটি টিভি তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন, কেউ কোন কথা জিগ্যেস করল না। এ রকম ব্যাপারটা ঘটেছিল মনোহর ছাবরিয়ার শ ওয়ালেস–এর কর্তৃত্ব গ্রহণের প্রাথমিক পর্বে। ছাবরিয়া অবশ্যই অনাবাসী, কিন্তু অন্যান্যরা যেমন আর পি গোয়েঙ্কা এবং এস·কে বিড়লা তাকে অনুসরণ করেছিলেন। ব্যাপারটা অনেকটা গিমিকের পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছিল। অশোক লেল্যান্ড, হিন্দুস্থান ডর অলিভার, মাথার অ্যান্ড প্ল্যান্ট এরকমভাবেই হিন্দুজা এবং ছাবরিয়া নিজেদের অধীনে রেখেছিলেন। ম্যাকলয়েড রাসেল, জর্জ উইলিয়ামসন এবং আসাম ফ্রন্টিয়ার সহ অনেক চায়ের কোম্পানি একইভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে।

এই হাত বদলের স্বর খাঁটি ভারতীয় সংস্থাগুলির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। এই হাত বদলির জন্য বেশ অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে।

রিলায়েন্স লারসেন অ্যান্ড টুবরোকে লোভনীয় কন্ট্রাকসানের অর্ডার ধরিয়ে দিয়েছিল। লারসেন টুবরো সংস্থা শুধুমাত্র প্রস্তুতকারক নয়, সেইসঙ্গে কন্ট্রাকটরও। দুটি কাজেই তারা প্রভূত সুনাম অর্জন করেছেন। পঞ্চাশ বছর আগে এই সংস্থার গোড়াপত্তন করেন দুজন ডেনিস প্রযুক্তিবিদ। ফিটার টুবরো মারা গিয়েছেন, লারসেন জীবিত রয়েছেন–তাঁর সংস্থার মূলধন ৫০০ কোটি টাকা। বর্তমানে তিনি কোপেনহেগেন এ বসবাস করছেন। ধাঁধাঁ রয়ে গিয়েছে একটি ব্যাপারে। সেটি হলো ছাবরিয়া এবং আম্বানি কী সরাসরি লারসেনের কাছ থেকে দুই শতাংশ শেয়ার কিনেছেন, না বোম্বাই–এর খোলা বাজার থেকে? তাঁরা যে ইক্যুয়িটি শেয়ার কিনেছেন তা নেহাৎ কম নয়। লারসেন অ্যান্ড টুবরোর স্টক মারকেটে ছড়ানো মূলধনের পরিমাণ ৬০০ কোটি টাকা। টাটা স্টীল থেকে এর পরিমাণ কিছুটা কম। এই দুই শতাংশর পরিমাণ তুচ্ছ নয়। ১২ কোটি টাকা বেরিয়ে গেছে ক্রেতার পকেট থেকে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো যখন ভারত সরকার বিদেশি মালটি ন্যাশনাল সংস্থাগুলির ব্যাপারে যারপর নাই উদগ্রীব, তখন কেন তারা এদেশ থেকে একে একে চলে যেতে চাইছেন? যখন নতুন মালটি ন্যাশনাল সংস্থাগুলি এদেশে লগ্নী করতে আসছেন তখন তারা আবিষ্কার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে বর্তমান সংস্থাগুলি (বিদেশি মালটি ন্যাশনাল) নিজেদের কারণেই দেশত্যাগ করছেন। দ্বিতীয়ত এরা যে গণহারে এদেশ ছাড়ছে তার কারণ সম্ভবত উন্মাদপ্রায় কর্পোরেট কার্যকলাপ।

প্রথমত ব্যাপারটা একটু খোলশা করা যাক। বিদেশে এই রকম ব্যাপার স্যাপার মোটেই নতুন নয়। বাস্তবিক, এই ধরনের ঘটনা ঘটে ক্রমাগত শিল্পায়নের পর। সংস্থা পুরনো হয়ে যায়, পুরনো হয়ে যায় তাদের মেশিনপত্র ও ম্যানেজমেন্ট। তারা নতুন কোম্পানির সঙ্গে পাঞ্জা কষতে অক্ষম বোধ করে। এবং ধীরে ধীরে শ্রমিক ও ম্যানেজমেন্টের ঝামেলাতে অকেজো হয়ে পড়ে। মার্গারেট থ্যাচার ক্ষমতাতে আসার পর বৃটেনে এরকম অবস্থা দেখা দিয়েছিল। আর ভারতে এধরনের ঘটনা অহরহই ঘটছে। বিশেষ করে কলকাতাতে। অধিকাংশ সংস্থা গণ্ডগোলে ভোগে। কিছু কিছু চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড মার্টিন বার্নের কী হাল হয়েছে, বলতে পারেন? মেটাল বক্স এবং গেস্টকীন উইলিয়ামস এর অবস্থাই বা কী রকম? ব্রুক ব্রণ্ড এবং ফিলিপস পশ্চিমে পাড়ি দিয়েছে। আই·সি·আই চলে এসেছে দিল্লীতে। এদের বিপর্যয়ের দিনে যদি কঠোর কর্তৃপক্ষের হাতে এরা পড়তো, তবে নিশ্চয়ই এদের এমন হাল হতো না।

শ্রীমতী থ্যাচার যদি সেসময় আবির্ভূত না হতেন তাহলে হয়তো বৃটেনে অনেক কোম্পানি তলিয়ে যেত। একশো কোম্পানির রাতারাতি হাত বদল হয়েছে। বহু লোক বেকার হয়েছে, তা প্রায় দশলক্ষের কাছাকাছি। তবে এসব ঝড়ঝাপটা সামলিয়ে বৃটেন আবার মুখ তুলে তাকিয়েছে। ওই মন্থনপদ্ধতিই এদেশকেও সাহায্য করেছে, সন্দেহ নেই। এবং তা আধুনিকীকরণ করতেই। ঠিক এভাবেই জাপান যখন গাড়ি তৈরির ব্যাপারে রমরমা বাজার করে নিয়েছিল। তখন আমেরিকা ঠিক এই কায়দাতেই নিজেদের জায়গা করে নিয়েছিল।

তবে আমাদের দেশে ঠিক এধরনের ব্যাপার সম্ভবপর নয়। কারণ এখানে শ্রমিক-সংক্রান্ত বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। প্রাইভেট সেকটরের প্রস্তুতকাররা একটি বাড়তি কাজের অবকাশ সৃষ্টি করেনি, ১৯৮১ থেকে যখন ৪.৫৩ মিলিয়ান কর্মী কর্মে নিযুক্ত রয়েছে। সাত বছর পরে, সংখ্যাটি ৪·৪৪ মিলিয়ানে নেমে এসেছে। এই সংখ্যা ১৯৮১ থেকে ১ লাখ কমে গিয়েছে। যদিও ২৫ শতাংশ বাড়তি রয়েছেন যাদেরকে ছাটাই করা হয়নি। হিসেব মোতাবেক, বৃটেনের থ্যাচার সরকারের শ্রমিক ছাঁটাইএর কৌশল যেভাবে সফল করে তুলেছিল, তেমনই ভাবে আমাদের সংস্থাগুলি ৯০ শতাংশ টেকসটাইল মিল সমেত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যদিও ক্ষতি পূরণের জন্য সাইরাস ইণ্ডাস্ট্রিস এ কর্ম বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

আর পি গোয়েঙ্কা: হিন্দুজা, স্বরাজ পাল, ছাবরিয়াদের আবির্ভাবে নতুন করে ভাবনা চিন্তা?

শ্রীমতী থ্যাচার যদি সেসময় আবির্ভূত না হতেন তাহলে হয়তো বৃটেনে অনেক কোম্পানি তলিয়ে যেত। একশো কোম্পানির রাতারাতি হাত বদল হয়েছে। বহু লোক বেকার হয়েছে, তা প্রায় দশলক্ষের কাছাকাছি।

প্রশ্ন উঠেছে—নতুন মালিকেরা তাহলে অধিগৃহীত কোম্পানিগুলি নিয়ে কি করছেন? এগুলি কি তারা বন্ধ করে দেবেন—যা তারা সহজে করবেন বলে মনে হয়না। হয়তো সরকারের সঙ্গে তাদের গোপন বোঝাপড়া রয়েছে। নাকি কোম্পানিগুলি মূলধন বেচে দেবেন। যেমনটা করছেন বোম্বাই ও দিল্লির কিছু কোম্পানি বা করার কথা ভাবছেন। অথবা তারা আরো টাকা ঢালবেন সংস্থাগুলিকে আধুনিকীকরণ করতে? যদিও এই আশা দূরাশারই নামান্তর, বিশেষত মেটাল বকস কিংবা কটন টেকসটাইলগুলির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একরকম অবাস্তবই।

সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, সরকার কিন্তু এসব ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। যদিও উপরোক্ত প্রশ্নগুলি রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ। এই কোম্পানি আপনি কিভাবে করায়ত্ত করলেন সেটা জরুরি নয়, জরুরি হলো এদের নিয়ে আপনি কী করবেন। অন্যান্য কোম্পানির সঙ্গে সঙ্গে ডানলপে, অটো ইণ্ডাস্ট্রির রমরমার যুগে যখন রাবারের চাহিদা চড়্ চড় করে বাড়ছে তখন সেরকম কোন অসুবিধেও নেই। এই সম্পূর্ণ উদার পরিস্থিতিতে সরকারের বদান্যতা ছাড়াই কর্পোরেট সেকটরে ব্যবসা করা সম্ভবপর। টেসকটাইল শিল্পগুলিকে বর্তমানে নতুন ছাঁচে ফেলা হয়েছে। তবে সরকার ঠিক জানে না এগুলিকে নিয়ে কি করতে হবে।

আধুনিকীকরণের সমস্যা ছাড়াও আরেকটি জিজ্ঞাস্য রয়েছে। আমরা যেমন দেখেছি এই কর্তৃত্ব হস্তান্তরের বিষয়টি দুএকজন বিগবসের আওতাভুক্ত, যারা বিদেশে টাকা জমিয়ে থাকেন, তেমনই তারা তাদের আর্থিক দাপট দেখিয়ে সস্তায় কোম্পানি কিনতে বদ্ধ পরিকর। ছাবরিয়ারা হঠাৎই কর্পোরেট সেকটরের হোমড়া চোমড়া হয়ে বসেছেন। সেইসঙ্গে হিন্দুজাগ্রুপ সমেত অন্যান্যরা। বাস্তবিক এই কর্তৃত্ব দখলের খেলা আর পি গোয়েঙ্কাকে আজকের আর পি গোয়েঙ্কাতে রূপান্তরিত করেছে। এই ক্ষমতার একত্রীকরণ কী দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক? হাফডজন সংস্থার মালিক হাফ ডজন শিল্পপতি হওয়া সত্ত্বেও আমরা অচিরেই দেখতে পাব যে হাফ ডজন সংস্থার মালিক হয়ে বসেছেন কোন একজন ব্যক্তি বা একটি গ্রুপ। এই ঘটনাটি অর্থনৈতিক মানদণ্ডকে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করছে না বলেই মনে হয়। রাবার টায়ারস এবং হুইস্কী আমাদের অর্থনৈতিক মানদণ্ডের পরিচায়ক নয়।

সুতরাং আসল প্রশ্ন হলো—এ থেকে আমাদের দেশ কী পাচ্ছে? বৃটেনে এই আধুনিকীকরণ প্রতিযোগিতামূলক বিষয়টিকে সুদৃঢ় করে তুলেছে এবং রপ্তানী শিল্পকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। যদি আচার্যদের বদলে ছাবরিয়ারা শ'ওয়ালেসের নিয়ন্ত্রণভার হাতে নেন তবে কী ধরে নেব খদ্দেরদের জন্য সস্তা দর, বেশি পরিমাণে কর্মী বিনিয়োগ— তাদের ক্রমাগত উন্নতির ফল হিসেবে ঘটতে থাকবে? কিংবা রপ্তানীর রমরমা হবে? অনাবাসীদের হাতে টাকা বেশি আছে তাই হয়তো নতুন কারিগরির ব্যাপারে তারা অনেক কিছুই করতে পারেন। তবে যদি সংস্থাগুলির পরিস্থিতি একেবারেই ভেঙে পড়েও রপ্তানীর বাজার বেড়ে যায় তাহলে হয়তো এই নতুন ভেঞ্চার সফল হবে। তবে প্রথমেই জানতে হবে কী ঘটতে চলেছে, তা যদি বোঝা না যায় তবে এ শুধু অর্থনৈতিক নীতির পক্ষে শুধু অনর্থক ব্যাপারে হবে তাই নয়, দেশের পক্ষেও তা ক্ষতিকর হবে। রাজনৈতিক ক্ষমতার একত্রীকরণ অবশ্যই খারাপ, আর অর্থনৈতিক ক্ষমতার একত্রীকরণ আরো খারাপ অবশ্যই।

বিলেতের ভারতবর্ষ
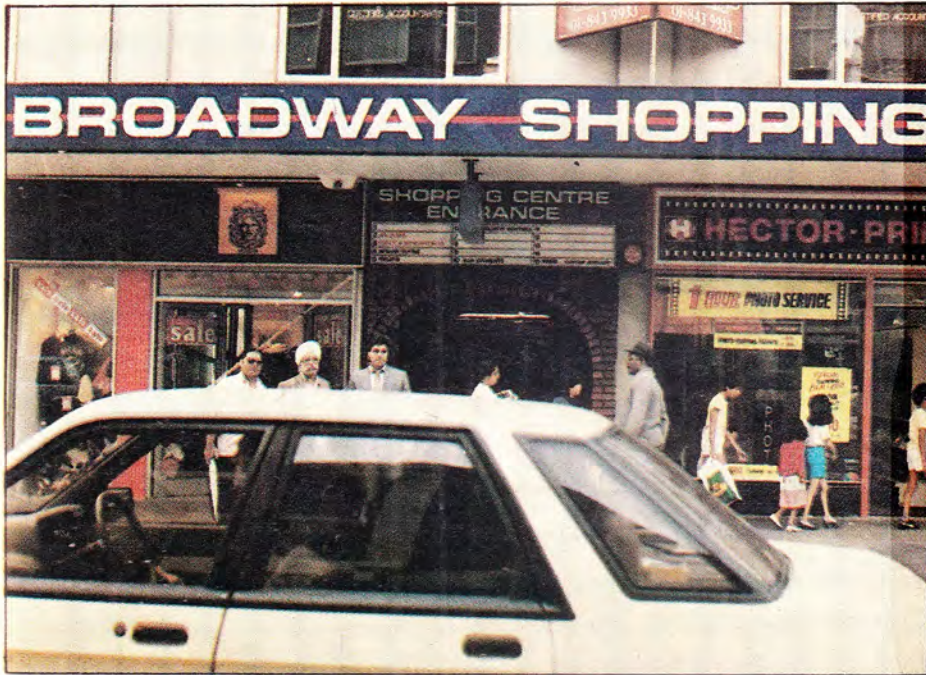
লণ্ডনের সাউথ হল এলাকায় পৌঁছে গেলে যেকোন ভারতীয়ই স্বস্তির সঙ্গে কয়েক লহমায় নিজের ভুখণ্ডকে খুঁজে পাবেন।

শিখেদের ধর্মীয় মিছিল

সাউথহলের শপিং-এরিয়া

সূর্য অস্ত গেছে। সন্ধ্যার এই মনোরম আবহাওয়ায় ইংলণ্ডের মিডলসেক্সের সাউথহলে আপনি কি না পাবেন? মুর্গ তন্দুরি থেকে শুরু করে কাবাব, জিলিপি, চাট কি নয়? লণ্ডনের শেপার্ডস বুশ গ্রীণ কিংবা অন্য কোন বাস স্টপ থেকে বাসে করে আপনি অনায়াসে সাউথহলে চলে আসতে পারেন। প্যাডিংটন স্টেশন থেকে ট্রেনে করেও সাউথহলে আসা যায়। ট্রেনে আসাই ভাল, এতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছনো যায়। একঘন্টা অন্তর ট্রেন।

সাউথহল রেলস্টেশনটি ফ্লাইওভারের একেবারে মাঝখানে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে মোড় নিলে একটি পুরনো এলাকা। সেখানে রয়েছে কয়েকটি পাকিস্তানী ও ভারতীয় রেস্তোরাঁ। সবকটিই বেশ পুরোনো। আছে বেশ কয়েকটি মিষ্টির আর খাবারের দোকান। ডানদিকে ঘুরে খানিকটা হাঁটলেই হাই স্ট্রিট। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সারাদিনই সেখানে কর্মব্যস্ততা। এমনকি ছুটির দিনেও রেহাই নেই–দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত মানুষের আনাগোনা চলছে অবিরাম। বড় দোকানগুলির মধ্যে উলওয়ার্থ ও মার্ক অ্যাণ্ড স্পেনসার–এর চেইন স্টোরগুলিও রয়েছে যেগুলি রবিবারে বন্ধ থাকে। কিন্তু ভারতীয় মালিকানার বড় বড় দোকানগুলি, সাধারণ স্টল থেকে শুরু করে খাবারের জায়গাগুলি খোলা থাকে রবিবারেও। আবহাওয়ায় অবশ্য ভারতীয়ত্ব নেই। টিপিক্যাল ইংলণ্ডের মতই ভিজে, স্যাঁতস্যাঁতে। তবে ভারতীয় পরিবেশ, ভারতীয় ভাষায় বার্তালাপের কোনও বিরাম নেই।

সাউথহল জায়গাটি কিন্তু লণ্ডনের অপেক্ষাকৃত গরীব এলাকা হলেও একেবারে তকতকে। কোথাও ভিখিরি বলতে কেউ নেই। সবকিছুই সেখানে আইনমাফিক চলে। বিনম্র স্মিত হাস্যে দোকানিরা

৭৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

যেন গলানো সোনা!

আরতি

সোনার মতই খাঁটি নতুন সরষের তেল

তাই তো এই বোতলে আছে
ভেজাল প্রতিরোধে বিশেষ সীল!

মাত্র ২৮ টাকা

নতুন সরষের তেল আরতি। সোনার মতই খাঁটি।

মাঠের তরতাজা সরষে চাষীদের নিজস্ব কো-অপারেটিভে পেষাই করে তৈরি। এর যেমন ঝাঁজ, তেমনি সুন্দর স্বাদ। সবচেয়ে বড় কথা হল, এই তেলে কোন রাসায়নিক জিনিস মেশানো নেই।

এই সোনার মত তেলে যাতে কোনমতেই ভেজাল ঢুকতে না পারে, তার জন্য আছে বিশেষ সীলের ব্যবস্থা।

এক নজর দেখলেই বুঝবেন, এধরনের বিশেষ বোতলে,এত সুরক্ষিত ভাবে রাখা খাঁটি সরষের তেল আপনি আগে কখনও পাননি।

আর দাম ? মাত্র ২৮ টাকা। চাষীদের নিজস্ব কো-অপারেটিভ "গ্রোফেড"-এ তৈরি বলেই এই দামে এত খাঁটি তেল দেওয়া সম্ভব।

ভেজালের যুগে এ সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। আজই কিনুন নতুন সরষের তেল আরতি।

সোনার মতই খাঁটি সরষের তেল

গুজরাট কো-অপারেটিভ অয়েলসীড্স গ্রোয়ারস্ ফেডারেশন লিমিটেডের এক উৎকৃষ্ট অবদান।

TSAC/GROF-1/88 BEN

ওড়িশার জঙ্গলে বাইসন শিকার

নরহন্তা সেই আশ্চর্য বাইসন

ছবি : প্রসেনজিৎ দাস

ঢেনকানল রাজকুমারের আমন্ত্রণে কলকাতার বিখ্যাত শিকারী রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় টুলুবকার জঙ্গলে ফলাহারী থেকে নরহন্তা হয়ে পড়া এক আশ্চর্য বাইসন শিকার করলে পুরো এলাকা এইভাবে সন্ত্রাসমুক্ত হয়।

হ্যারিকেন হাতে নিয়ে পাতুয়া খুঁজে চলেছিল ঝড়ে পড়া আম। আর ছোট ভাই অদি ঝুড়িতে ভরছিল তা। হঠাৎ অদি আধো অন্ধকারে একটা দ্রুত কিছু ছুটে আসার শব্দ পায়। চোখ মেলে দেখে একখণ্ড অন্ধকার যেন তার দাদাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। হেরিকেনটা ছিটকে পড়ল, আলো নিভে যাওয়ায় ঝড়ো পরিবেশ আরও অন্ধকার হয়ে উঠল। শুনতে পেল দাদার আর্তনাদ। অন্ধকারে কিছু না বুঝেই দৌড় দিল সোজা বাড়ির দিকে। একটু পরেই গ্রামবাসীরা লাঠি সোটা নিয়ে এসে দেখে পেটের নাড়িভুঁড়ি বার করা পাতুয়ার দেহটা পড়ে রয়েছে আমগাছের তলায়। কিন্তু মারল কে তাকে। দেহের কোন অংশেই তো কোন খাওয়ার চিহ্ন নেই। শুধু নাড়িভুঁড়ি ইতস্তত ছড়ান আর দেহটার পশেই অজস্র মহিষের মতো খুরের ছাপ। নিঃসন্দেহ হলো তারা এ নিশ্চই খেপা গড়ে'র কাজ। বাইসনকে টুলুকা গ্রামের আদিবাসী লোকেরা গড় বলেই ডাকে। সেখানের আদিবাসীদের মত কাঁচা আম বাইসনেরও অতি প্রিয় খাদ্য। হয়ত সে ভোর রাত্রে কোন দলছুট বাইসন এসেছিল আম খেতে। আর হতভাগ্য পাতুয়ার হাতের হেরিকেনের আলো দেখে সে ক্ষিপ্ত কিংবা ভীত হয়ে ওঠে। সেই-ই ছিল তার প্রথম শিকার।

হাতের রক্তমাখা বাঁশিটা শুধু আঁকড়ে স্থানুর মত বসে প্রচণ্ড শব্দ করে কালিন্দি গোঙাচ্ছে। তার পায়ের দিকটা ভেসে যাচ্ছে রক্তে। গরুগুলোও ভয় পেয়ে দৌড় লাগিয়েছে। সেই খেপা বাইসনের পরবর্তী শিকার মহিষগড়া গ্রামের রাখালছেলে কালিন্দি। একটা পা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে কালিন্দি এখনও বেঁচে আছে। তবে এখনও হঠাৎ হঠাৎ কেঁপে ওঠে দুঃস্বপ্নে। কিছু মনে নেই। শুধু একটা বড় শিংওলা মাথা তাকে দূরে ছিটকে ফেলে দিয়েছিল। সেই জ্বলজ্বলে চোখ দুটো এখনও তাকে তাড়া করে দিনে রাতে দুঃস্বপ্নে।

সেই গুণ্ডা বাইসনটির তৃতীয় শিকার ছিল গ্রামের চোরা শিকারী রবি মুণ্ডা। অত্যন্ত অভাবী সংসার রবি মুণ্ডার। একটা ছোট ছেলে আর স্ত্রী। কিন্তু পৈতৃক সূত্রে পাওয়া বাড়তি লাভ ছিল বাড়িতে একটা গাদা বন্দুক। তাই নিয়ে রবি চলে যেত গভীর জঙ্গলে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে মেরে নিয়ে আসত হরিণ, শুয়োর প্রভৃতি জীব জন্তু। কোনদিন বাকিং

ডিয়ার, কোনদিন মাউস ডিয়ার। যেদিন যেমন জুটতো ভাগ্যে। তারপর তাদের মাংস আর চামড়া বিক্রি করে দিত লুকিয়ে। এই ভাবেই চলত তার সংসার। কোনমতে টেনেটুনে। সেদিনও গিয়েছিল সে জঙ্গলে। শরীরটা কয়েকদিন ধরে খারাপ ছিল, তাই শিকারে বেরুতে পারে নি সে। সংসারে আর খাবার মতো কিছুই ছিল না। বাধ্য হয়ে বেরিয়ে ছিল সেদিন। খুঁজে খুঁজে জঙ্গলে একটা ছোট জলার ধারে একটা আটা (ঝুপড়ি) বানিয়ে হরিণের অপেক্ষায় বসেছিল। বহুক্ষণ বসে থাকার পর যখন বিকেল পড়ে আসছে সেইসময় হঠাৎ দেখতে পেল সেই গুন্ডা বাইসনটাকে। অত বড় শিকার দেখে তার মন আনন্দে নেচে উঠেছিল। নিঃশব্দে সেই ঝোপের আড়াল থেকে বহু দিনের সঙ্গী গাদা বন্দুকটাকে উঁচিয়ে ধরেই গুলি ছুঁড়ে দিয়েছিল। কিন্তু ওই গাদা বন্দুকের গুলি বুনো বাইসনের কি করবে? গুলি গায়ে লাগতেই এক দৌড়ে লাফিয়ে এসে রবিকে পিষে দেয় মাটির ওপর সেখানেই। এক পাও পালাতে দেয় নি বেচারিকে। রবিকে মেরে পায়ের ক্ষুর ঠুকে গর্জন করে সারা বন কাঁপিয়ে তুলেছিল প্রচণ্ড রাগে।

আর এই ঘটনার পরেই বন দপ্তর বাইসনটিকে খুনি বলে ঘোষণা করে।

উড়িষ্যার ঢেনকানল রাজপরিবারের কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে বহুদিনের বন্ধুত্ব কলকাতার শিকারী রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়ের। ১৯৬৮ সালের জুন মাস। ছুটির দিনে দুপুরের নিদ্রাটা বেশ জোরাল হয়ে এসেছিল। এমন সময় হাতে এসে পৌছয় ঢেনকানল রাজকুমারের কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম—কাম শার্প টু শুট ডাউন এ রোগ বাইসন। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে রঞ্জিত বিছানার ওপর। একে বন্ধু তার পাঠিয়েছে। তার ওপর রঞ্জিতের বহুদিনের মনের গোপন ইচ্ছে যে শিকারী জীবনের একটা স্মারক হিসাবে বাইসনের মাথা ঘরে টাঙিয়ে রাখা। অতএব এ সুযোগ কখনই হাতছাড়া করতে নেই। পরের দিনই মাদ্রাজ মেলে চেপে বসে সে। সোজা গিয়ে নামে কটকে।

স্টেশনে দেখা হয় রাজকুমারের সঙ্গে। অনেকদিন বাদে দেখা দুই বন্ধুর। খানিক গল্প গুজবের পর রাজকুমারের সঙ্গে রঞ্জিত চলে আসে রাজবাড়িতে। ঢেনকানল রাজকুমারের বাড়িতে ভোজনপর্ব শেষ করে গাড়ি নিয়ে দুই বন্ধু সোজা চলে যায় টুল্‌কার বন বাংলোয়। উড়িষ্যার অঙ্গুল ডিভিশানে এই টুল্‌কা রেঞ্জটি পড়ে। বন বাংলোয় পৌছে সেখানকার রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে কুমার রঞ্জিতের পরিচয় করিয়ে দেন। আগে থেকেই অনুমতিপত্র ও অন্যান্য কাজ সেরে রেখেছিলেন কুমার। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাতে পেয়ে রঞ্জিত বলেন, আমি এখনই একবার সেই লোকটির বাড়ি যেতে চাই কুমার। ওই চোরা শিকারীটির বাড়ি, যে দিন তিনেক আগে মারা গেছে।

এদের দেখেই শিকারী রবি মুণ্ডার স্ত্রী ডুকরে কেঁদে ওঠে। কোন কথাই ওর কাছ থেকে জানতে পারা যায় নি। সেই অস্বস্তিকর করুণ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে রঞ্জিত মনস্থির করে সেই জলাশয়ের কাছে যাবার।

বাইসনের মাথসহ শিকারী রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়

আগে থেকেই অনুমতিপত্র ও অন্যান্য কাজ সেরে রেখেছিলেন কুমার। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাতে পেয়ে রঞ্জিত বলেন, আমি এখনই একবার সেই লোকটির বাড়ি যেতে চাই কুমার। ওই চোরা শিকারীটির বাড়ি, যে দিন তিনেক আগে মারা গেছে।

—সঠিক লোকেশানটা অবশ্য রেঞ্জার সাহেব জানেন।—চল রঞ্জিত যাওয়া যাক। কুমার সাহেব জীপে উঠতে উঠতে বলে ওঠেন।

—এই হলো সেই জায়গা রঞ্জিতবাবু। এখানেই রবির হতভাগ্য দেহটা পড়ে ছিল।—রেঞ্জার সাহেব বলেন। রঞ্জিত ততক্ষণে জলাশয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। নিচু হয়ে সমস্ত জায়গাটা পরীক্ষা করে। তারপর রেঞ্জারের দিকে লক্ষ্য করে বলে ওঠে, 'পায়ের ছাপ দেখে মনে হচ্ছে বাইসনটা আকারে খুবই বড়। বাইসনরা সাধারণভাবে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালবাসে। কিন্তু এখানে মাত্র একটিই বাইসনের পায়ের ছাপ। তার মানে দলছুট বাইসন।

দলছুট তো বটেই রঞ্জিত। আর জঙ্গলে দলছুট যে কোন জানোয়ারকেই সমীহ করে চলা উচিত। কারণ তাদের মতিগতি বোঝা ভার। —কুমার কথাটা বলে একটা সিগারেট ধরান। সেই প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরিয়ে নিয়ে রঞ্জিত গভীর মনযোগ দিয়ে বাইসনের পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলে যায় বেশ খানিকটা।

এদিকে ক্রমশ দিনের আলো কমে আসছে দেখে রেঞ্জার সাহেব বলে ওঠেন, তাহলে কাল থেকেই খোঁজা শুরু করা যাবে না হয়। কি বলেন রঞ্জিতবাবু?

পরদিন সকালে সবাই যখন বাংলোর সামনের লনে বসে প্রাতরাশ সারছে তখন হঠাৎ দেখা গেল জনা দশেক লোক খুব উত্তেজিত হয়ে নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করতে করতে আসছে বাংলোর দিকে। তারা উত্তেজিত হয়ে ওড়িয়া ভাষায় যা বলল তার বাংলা মানে দাঁড়ায় এইরকম—আজ ভোরেই তাদের গ্রামে আম বাগানের ভিতর গড়কে (বাইসনকে) দেখা গেছে। তাকে একপলক দেখেই আমকুড়োনেরা ছুটে গ্রামে এসে খবর দিয়েছে। অতএব সাহেবরা যদি যেতে চান তো চলুন।

খবরটা শুনে প্রাতরাশ অর্ধসমাপ্ত রেখে রঞ্জিত উঠে দাঁড়ায়। ছুটে ঘরের ভেতরে যেতে যেতে বলে ওঠে, কুমার, আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। ইউ অলসো গেট রেডি।

খানিক বাদেই জীপে করে কুমার, রেঞ্জার, দুই
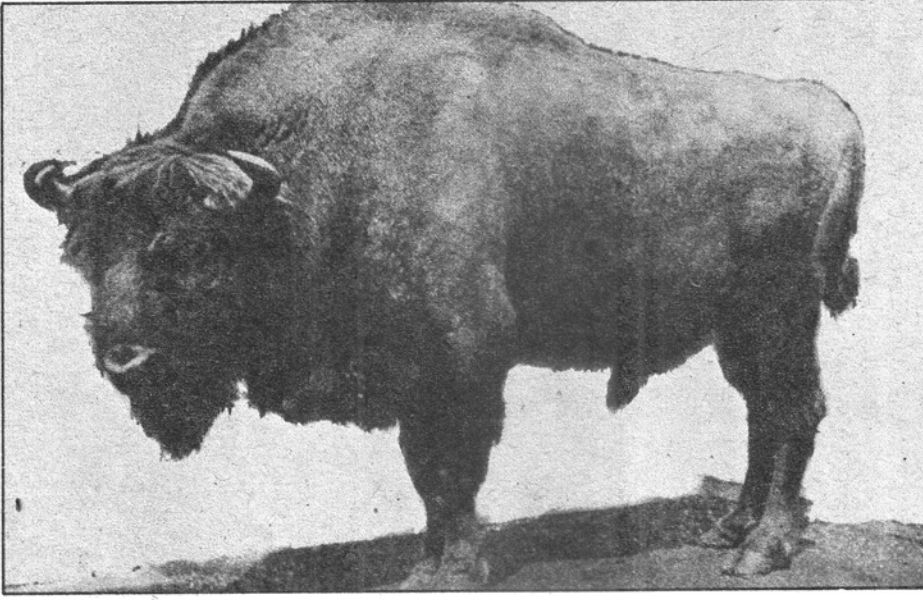
ট্রুস্তকার খেপা গড়

গ্রামবাসী আর নিজের প্রিয় সঙ্গী ৪৫০/৪০০ বোরের ডবল ব্যারেল রাইফেল নিয়ে রঞ্জিত সেই আমবাগানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। গ্রামটির দূরত্ব বনবারলো থেকে আন্দাজ তিন কি.মি.। জীপ গ্রামের লাগোয়া আমবাগানে থামতেই রঞ্জিত আর রেঞ্জার সাহেব লাফ দিয়ে নেমে পড়েন জীপ থেকে।

–দেখুন রঞ্জিতবাবু, একেবারে সদ্য আসা বাইসনের পায়ের ছাপ মনে হচ্ছে। রেঞ্জার সাহেব বলে ওঠেন।

–কিন্তু পায়ের ছাপের পাশে সাদা সাদা এই তৈলাক্ত পদার্থগুলো কি? নিশ্চয়ই পুঁজ। রবির গুলির আঘাত তার দেহে পচ ধরিয়ে দিয়েছে।

রঞ্জিত মাটির ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে রেঞ্জারের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, আমি এক্ষুনি বাইসনটাকে ফলো করতে চাই। একজন অভিজ্ঞ ট্রেকার পাওয়া যাবে কি?

–নিশ্চয়ই। 'এই নবিয়া এদিকে এসো।' রেঞ্জারবাবু একজনকে ডাক দেন। লম্বা সেল্যুট ঠুকে একজন দোহারা চেহারার একচোখ কানা লম্বা লোক এসে সামনে দাঁড়ায়। রঞ্জিতবাবু এর নাম নবিয়া। এই-ই আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। নবিয়ার হাতেও একটা বন্দুক ছিল একনলা।

–উইস ইওর সাকসেস রঞ্জিত। কুমার সাহেব হাত নেড়ে অভিবাদন করলেন।

পথপ্রদর্শক নবিয়া ও রঞ্জিত খোলা মাঠ ধরে অগ্রসর হলো। নবিয়া, তোমার হাতে বন্দুক থাকলেও তুমি কিন্তু কখনোই কোন অবস্থাতেই বন্দুক চালাবে না। রঞ্জিত নবিয়াকে সাবধান করে দেয়। কারণ আমার হাতে শক্তিশালী রাইফেল আছে।

নবিয়া উত্তরে বুক ফুলিয়ে বলল, না, মু ডরাই বি না। গড় আইলে কান ধরি মারিব।

ধীরে পদক্ষেপে বাইসনের পায়ের ছাপ ধরে ক্রমশঃ তারা জঙ্গলের গোড়ায় এসে হাজির হলো। বাইসনের পায়ের ছাপের পাশাপাশি ক্রমাগত পুঁজও পড়ে গেছে। গভীর জঙ্গলের দিকে তারা ঢুকে যায়। ক্রমশ সকাল গড়িয়ে দুপুর হল। তখনো দুজনে সন্তর্পণে এগিয়ে চলে।

বাংলোর সামনেই উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছে কুমার সাহেব ও রেঞ্জার সাহেব। এদের দুজনকে ফিরতে দেখেই উল্লসিত হয়ে ওঠেন তারা। কিন্তু মরা হরিণ দেখে চমকে ওঠেন।

পরদিন সকাল থেকেই জীপ নিয়ে আরও দূরের গ্রামে যাত্রা। তিনটে গ্রাম এগিয়ে চতুর্থ গ্রামে জীপ পৌছল বেলা দশটা নাগাদ। প্রচণ্ড সূর্যের তাপ। সেখানে জীপ পৌছতেই গ্রামবাসীরা হামলে পড়ল। তারা জানাল যে, গতরাত্রে তাদের গ্রামের দশ-আমগাছের বাগানে সারারাত বাইসনটা ছিল এবং সারাক্ষণ সে মুখ থেকে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ করছিল। ভোর হতে গ্রামবাসীরা গিয়ে দেখে সব আম বাইসন খেয়ে গেছে। রঞ্জিত জীপ থেকে রাইফেল হাতে নেমে পড়ে। বাইসনের পায়ের ছাপের পাশেই দেখে সেই পুঁজের আভাস। আর সেই পুঁজ ফোঁটা ফোঁটা করে সারা আমতলায় ছড়ানো।

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে রঞ্জিত ঘাসে ভরা ঝোপ জঙ্গলে ঢুকে যায়। যখন দূরত্ব প্রায় তিরিশ ফুটের মতো তখন রঞ্জিত থেমে যায়। আর এগনো ঠিক নয়। বাইসনটা চনমনে হয়ে উঠেছে। হয়ত বা সেও বুঝতে পেরেছে বিপদের আগমন।

–নবিয়া, আজ বাইসনটাকে শেষ করবই। যে ভাবে হোক। তুমি কিছু বিস্কুট আর জল সঙ্গে নিয়ে নাও। রঞ্জিত নবিয়াকে বলে।

অকুতোভয় সঙ্গী নবিয়াকে সঙ্গে নিয়ে মা কালীর নাম স্মরণ করে দুজনে এগলো। প্রায় ঘন্টা খানেক চলার পর এক গভীর উপত্যকায় এসে দুজনে হাজির হল।

–বাবু আর একটু এগলেই একটা জলা পাওয়া যাবে। গরমে জল শুকিয়ে এলেও হয়ত এখনও কিছু জল পাওয়া যাবে। নবিয়া সামনের দিকে ইঙ্গিত করে।

–নবিয়া আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে বাইসনটাকে ওখানেই পাওয়া যাবে। চলো সাবধানে এগিয়ে যাই। রঞ্জিত ও নবিয়া এগিয়ে যায় ধীর পদক্ষেপে। একটু এগিয়ে দুজনে জলার দিকে নামতে শুরু করে দেয়। হঠাৎ কানে আসে সেই আওয়াজ।

ঝোপের পাতার আড়াল থেকে রঞ্জিত লক্ষ্য করে বাইসনটা জলার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর নাক উঁচু করে কি একটা গন্ধ নেবার চেষ্টা করছে। সৌভাগ্যক্রমে তখন হাওয়া বইছিল বাইসনের দিক থেকে শিকারীদের দিকে। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রঞ্জিত নবিয়াকে ফিসফিসিয়ে বলে, তুমি চুপ করে এখানে বসে থাক। আমি এগোচ্ছি। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে রঞ্জিত ঘাসে ভরা ঝোপ জঙ্গলে ঢুকে যায়। যখন দূরত্ব প্রায় তিরিশ ফুটের মতো তখন রঞ্জিত থেমে যায়। আর এগনো ঠিক নয়। বাইসনটা চনমনে হয়ে উঠেছে। হয়ত বা সেও বুঝতে পেরেছে বিপদের আগমন। এতটা পথ এসে রঞ্জিত এমন হাঁপিয়ে পড়েছিল যে একমিনিট নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইল। তারপর শোয়া অবস্থাতেই রাইফেল উঁচিয়ে নিঃশ্বাস চেপে বাইসনের হৃদপিণ্ড লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপে দিল খুব ধীরে।

প্রচণ্ড আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিত লক্ষ্য করল যে বাইসনটা গুলি খেয়েই দুর্বার বেগে ওর পিছনের জঙ্গলের দিকে দৌড়তে শুরু করল। আর রঞ্জিতও রাইফেল নিয়ে তার পিছনে ধাওয়া করল। খুব বেশি হলে বিশ গজ গিয়ে রঞ্জিত দেখতে পায় একটা চালতা গাছের নিচে বাইসনটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। তার নাক মুখ দিয়ে ফেনার মত রক্ত গড়াচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখল বাইসনটার সেই পায়ের দগদগে ঘা থেকে রক্ত পুঁজ পড়ছিল। হঠাৎ রঞ্জিত পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে যে নবিয়া মিটিমিটি হাসছে। নবিয়া নিচু হয়ে রঞ্জিতকে প্রণাম করে আনন্দে।

–চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এরাই দুটি বিশেষ কারণ যাদের জন্যে মানালী বেঙ্গসরকার ভিজিল সাবানই বেছে নেন
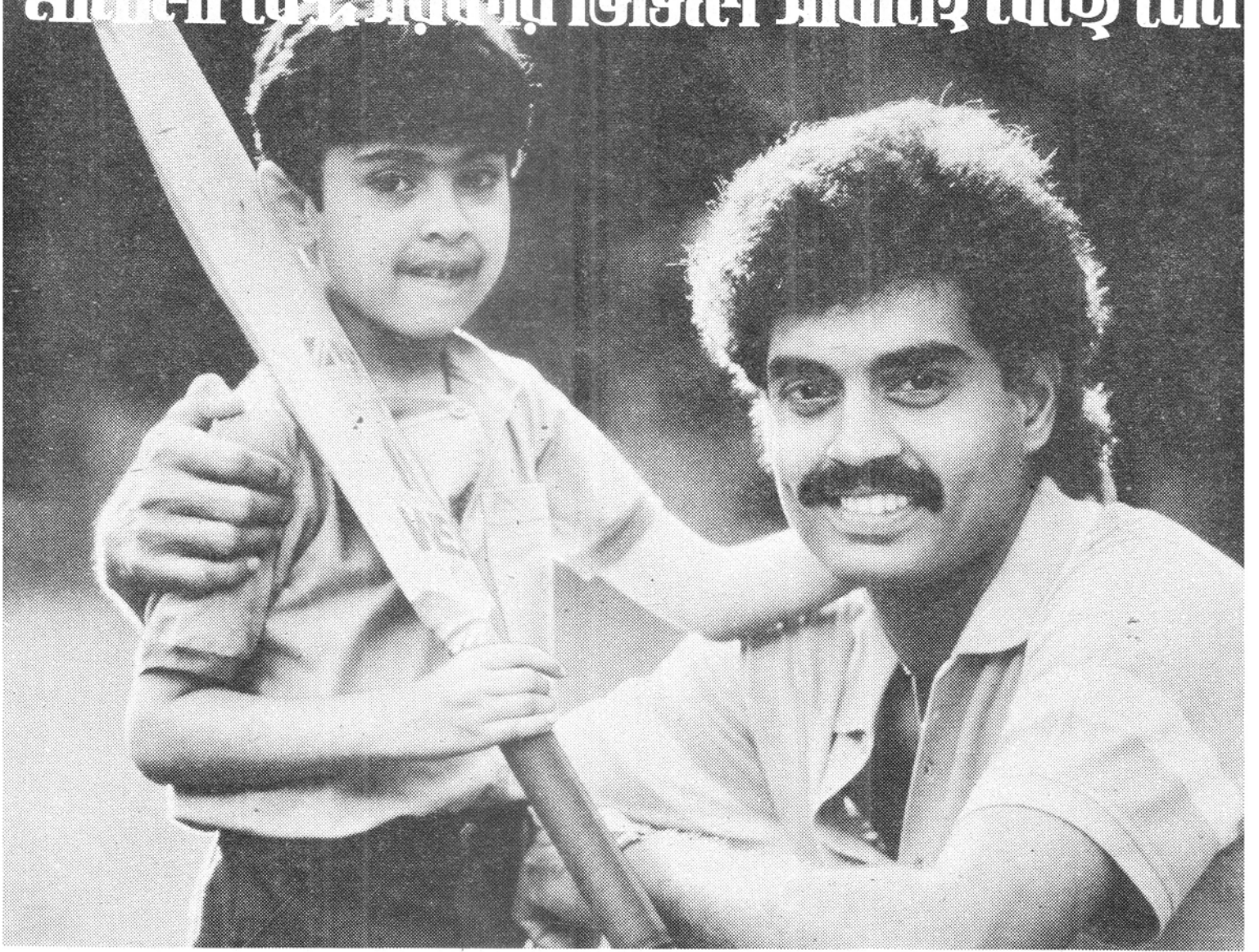
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষা করে, গোদরেজএর নতুন সাবান ভিজিল।

"দিলীপ আর আমার নকুল সোনাকে ঘিরেই তো আমার সারা দুনিয়া!" বলেন মানালী বেঙ্গসরকার, "আমার মত আপনার কাছেও যখন পরিবারের স্বাস্থ্যরক্ষাই সবচেয়ে বড় কথা, তখন সব জিনিষ যাচাইপরখ করেই তো ব্যবহার করেন, তাই না ? হলোইরা তা স্নানের সাবান!

এইজন্যেই তো আমিও ভিজিল সাবানই বেছে নিয়েছি। ভিজিলে রয়েছে প্রাকৃতিক তেল যা ত্বকের সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যপ্রদ গুণের জন্যে শতশত বছর ধরে নাম কিনেছে ঘরে-ঘরে। ননীর মত এর কোমল ফেনার রাশ, আর এর মনমাতানো সুবাস—আহ্, সেকথা আর কি বলব! সত্যি বলতে ভিজিলই এক এমন সাবান, পরিবারের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যার উপর আমি চোখ বুজে ভরসা করতে পারি।"

ভিজিল—গোদরেজএর নতুন সাবান পরিবারের স্বাস্থ্যের প্রহরী।

গোদরেজ

৬৫ পৃষ্ঠার পর

সেখানে ক্রেতাকে আহ্বান করে। রাস্তায় গাড়িগুলি কখনই এলোপাথাড়ি কর্ণবিদারক হর্ণ দেয় না। নেই দিগবিদিকশূন্য মানুষের ভিড়, ঠেলাঠেলি। বাস, ট্রেন ছাড়ে নির্দিষ্ট সময়ে। বাসে, ট্রেনে উঠবার সময়ে সকলেই কিউ–এ দাঁড়ান। আপনি একজন খুব সাধারণ লোক বা অল্প কেনাকাটার লোক হলেও প্রতিটি ব্যাপারে দোকানি আপনাকে সমানভাবেই আপ্যায়ণ করবে।
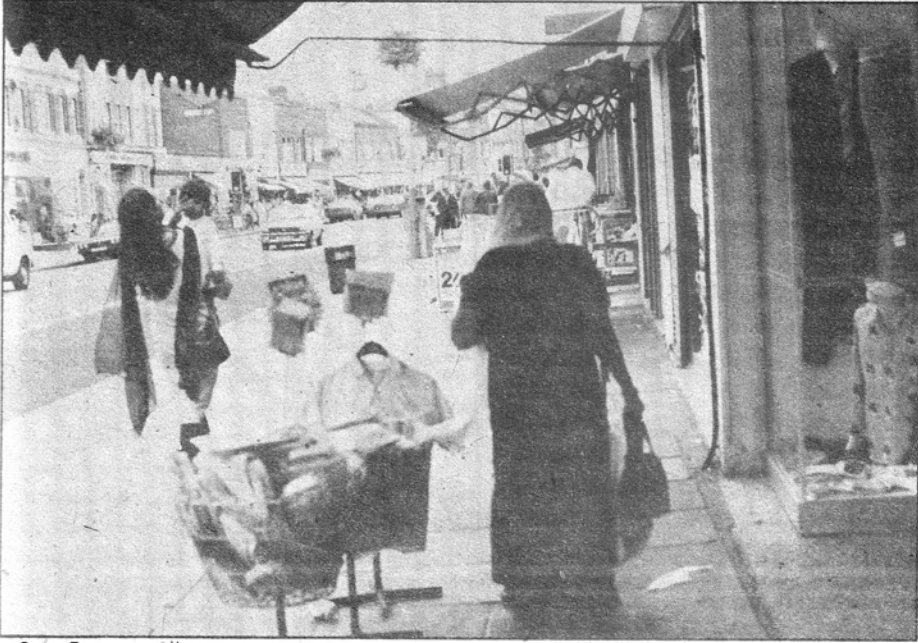
পাকিস্তানী ও ভারতীয় মহিলারা, দ্বিপ্রাহরিক অবকাশে বাজার সারছেন

সাউথহলের ব্রিটিশ-ভারতীয় সম্প্রদায় সাহেবী কেতাদুরস্ত হলেও আনন্দ বেদনার অনুভূতি তাদের নিজস্ব। একদিকে যেমন তাদের জীবনে আছে সাফল্য, আনন্দের কাহিনী। তেমনি ব্যর্থতা, হতাশার ঘটনাও ঘটেছে বইকি। সুখদুঃখের কত স্মৃতি না বয়ে বেড়াচ্ছেন এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা। অবতার সিং গিলকে দিয়েই শুরু করা যাক না।

অবতার সিং–দাড়ি গোঁফ কামানো মাঝবয়সী এই শিখটিকে দেখলে যুবক বলেই মনে হয়। সাউথহলের বাসিন্দা অবতার সেই ১৯৬৪ সালে ইংলণ্ড আসেন। এখানে এসে বিয়ে করলেন এক অষ্টাদশীতরুণীকে। মেয়েটির বাবা ১৯৫৬ সালে পাঞ্জাবের চাঁদ গ্রাম থেকে ইংলণ্ড আসেন। এরপর ভদ্রলোক সাউথহলের একটি রবার ফ্যাক্টরিতে কাজও পেয়ে যান। অবতার সিং ঠিক করলেন শ্বশুরের মত তিনিও সাউথহলেই সেটল্ড হবেন। এখনকার মত তখনকার দিনে কাজ জোটানো এত প্রতিযোগিতাপূর্ণ, কঠিন হয়ে ওঠেনি।

প্রথমদিকে একটু কষ্ট হলেও অবতার শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ এয়ারওয়েতে একটি কাজ জুটিয়ে নিলেন। একটি ফল ও সব্জি কারখানায় সুপারভাইজারের কাজ পেলেন তাঁর স্ত্রী। এখন তাঁদের চারটি সন্তান। বছর কুড়ি বয়েসের মনবীণ বড় মেয়ে তাদের।

অবতার সিং–এর পথ ধরে তাঁর বোনও পাঞ্জাব থেকে শেষ পর্যন্ত লণ্ডনের সাউথহলে চলে এলেন। বিয়ে করলেন এক প্রবাসী শিখকে। এইভাবে প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যে স্থানান্তর ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে ইংলণ্ডের সাউথহলে। ব্রিটিশ ও ভারতীয় এই দুইয়ের সমন্বয় যা এককথায় সেদেশের জাতীয় সংহতিরই নামান্তর। নতুন পরিবেশে মানুষ নিজেকে যে কতটা খাপ খাইয়ে নিতে পারে–এখানে না এলে তা বোঝা যাবে না।

এবার শ্রীমতী সুশীল ভগতের কথায় আসা যাক। গত তেইশ বছর ধরে তিনি সাউথহলের বাসিন্দা। সদ্য বিবাহিতা তরুণী বধূ হিসেবে ১৯৬৫তে তাঁর ইংলণ্ডে আসা। তিন বছর আগে তাঁর স্বামী ইংলণ্ডের সাউথহলে এসেছিলেন। স্মিত হেসে সুশীল বললেন,–'দেখুন, বিদেশ দেখার আগ্রহ ছিল আমার অনেক দিনের। বিয়ের পরে আমার সেই ইচ্ছে পূরণ হল। তো বিদেশই আমার কাছে এখন স্বদেশ।

বিয়ের ঠিক দু'বছর পরে এই ভগত দম্পতি সাউথহলে একটা বাড়ি কেনেন। দুই সন্তান হয় তাঁদের। বড়টি একুশ বছরের আর ছোটটি পনেরোয় পা দিয়েছে এখন। তাঁদের এই স্বচ্ছল-সুখী জীবনের ছন্দপতন শুরু হ'ল তখনই যখন সুশীলের স্বামী ঠিক করলেন ইংলণ্ডে আর নয় আবার তাঁরা ফিরে যাবেন ভারতে। সুশীলের কিন্তু ভারতে ফিরে যাওয়ার তেমন ইচ্ছে নেই, কিন্তু তাঁর স্বামী একেবারে নাছোড়বান্দা। সুশীলের এর বিরুদ্ধে বক্তব্য খুবই স্পষ্ট ছিল। 'বলতে গেলে এই সবেমাত্র আমরা একটু থিতু হয়েছি। আমি এখন এখানে চাকরি করি। ওখানে গেলে আমাকে চাকরি ছাড়তে হবে। আমার দুই ছেলে এখানে স্বাধীনভাবেই বড় হয়েছে, দেশের পরিবেশে ওরা মানিয়ে নিতে পারবে না।'

কিন্তু এই ব্যবস্থা তাদের মেনেই নিতে হল। নতুন পরিবেশে নতুন জীবন শুরু করতে হল তাদের ভারতে ফিরে এসে। কিন্তু এর পরিণাম কি হল···বছর বিশেক বিদেশে কাটানোর পর ভারতে এসে এখানকার পরিবেশে এঁরা একেবারেই খাপ খাওয়াতে পারেন নি। এমন সব ছোটখাট অসুবিধেজনক অবস্থার সম্মুখীন হতেন যে মেজাজ কিছুতেই ঠিক রাখতে পারতেন না। সুশীলের স্বামী একটি ছাপাখানার ব্যবসা শুরু করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভারতীয় বাণিজ্যিক মহলের চাহিদা, লাল ফিতের ফাঁস, কাস্টমসের জটিলতার রীতিনীতি ইংলণ্ড থেকে একেবারে আলাদা তা অচিরেই টের পেলেন তাঁরা। এদিকে ব্যবসায় কিছু অসুবিধেও দেখা দিল, এমন কি পারিবারিক বন্ধনেও চিড় ধরতে শুরু করল এরপর। যৌথ পরিবারে নানান ব্যাপারে খিটিমিটি লেগেই থাকত। সেইসব সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সুশীল আরও ফ্যাসাদে পড়ে যান। কোথায় সাউথহলের সেই মুক্ত, আত্মবিশ্বাসী জীবন আর কোথায় বোম্বাইয়ের এক ছোট্ট ফ্ল্যাটে এই বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে মানিয়ে নেওয়ার জোড়াতালি দেওয়া জীবন। ছেলেদের লেখাপড়ার যথেষ্ট বাধা আসছে। কারণ জীবনধারার মত পড়াশুনোর রীতি-পদ্ধতির ব্যাপারেও ইংলণ্ডের সঙ্গে এখানকার তফাৎ অনেক। তাছাড়া ছেলেরা হিন্দি ও মারাঠী কোন ভাষার সঙ্গেই তেমন পরিচিত নয়। অথচ এদুটি ভাষাই এখানে বাধ্যতামূলকভাবে শেখানো হয়। ছেলেবেলা থেকে এদুটি ভাষার কোনটিই প্রথাগতভাবে শেখার আগ্রহ ছিল না, বোম্বের স্কুলের ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ঠিকমত মানিয়ে নিতে পারছিল না তারা।

নানাদিক থেকে এই সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সুশীলের স্বামী এখন হতাশায় ভুগতে থাকেন। সমাধান হিসেবে সঙ্গী করে অ্যালকোহলকে। তাঁর যত রাগ, দুঃখ কেন্দ্রিভূত হয় তাঁর স্ত্রী ও ছেলেদের প্রতি।

পরিবারের কর্তা যদি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন তাহলে সংসারের অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই এরপর সুশীল পুনরায় ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যোগাযোগ করে সাউথহলে একটি চাকরিও যোগাড় করলেন। অনেক টালবাহানার পর এক বছর পরে তাঁর স্বামীও তাঁর অনুগামী হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বামীর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। সুশীল ম্লান হাসেন, 'ভারতে না ফিরে গেলে এসব কিছুই হত না। কি যে ভুত ভর করেছিল মাথায় তখন।'

সাউথহলের অনতিদূরে লণ্ডনের একজন সক্রিয় সমাজসেবী তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে

সাউথহলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় 'ইন্দো ব্রিটিশ ফ্রেণ্ডশিপ সোসাইটি'-র মিটিং

বললেন—'ভারত ও ব্রিটেনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রভাব ইংলণ্ডের প্রতিটি স্তরেই রয়েছে। আমাদের পথটাই হ'ল সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে চলা।' ভারতীয় মেয়েরা যে সমস্ত চিরাচরিত অসুবিধের সম্মুখীন হন তার সমাধানের ব্যাপারে তিনি পরামর্শক হিসেবে সাহায্য করেন। এই সমাজসেবী কর্মীটি মেয়েদের সবসময়ই নিপীড়ন, অত্যাচার, অসুবিধে মুখ বুজে সহ্য করতে নিষেধ করেন। মেয়েরা এখানে অনেক আত্মবিশ্বাসী তাই যেমনটি করেন ভারতীয় মেয়েরা তা এখানে আশা করা যায় না। সুশীল নিজের অভিজ্ঞতায় এসব ভালোই বোঝেন। তিনিও প্রবাসী ভারতীয়দের সমাজের নিপীড়িত মেয়েদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। এসব ব্যাপারে তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য যাঁরা আসেন তাঁদের সাধ্যমত সাহায্য করেন তিনি।

সামাজিক দিক থেকে লণ্ডনের ভারতীয় মূল যুব সম্প্রদায়ের কাজকর্ম, রীতিনীতিতে যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। পরিবর্তন এসেছে প্রতিটি বাড়ির আবহাওয়ায়ও। হাওয়া বদলের এই পরিস্থিতিতে একটি বাড়ির পুরনোপন্থী গৃহকর্তারা যেখানে প্রাচীনতা টিকিয়ে রাখতে ট্র্যাডিশনাল ফুডের পক্ষপাতি সেখানে আধুনিকেরা চায় ফাস্ট ফুড। যে সমস্ত ভারতীয় ছেলেমেয়েরা ব্রিটিশ রীতি-নীতি, আদবকায়দা রপ্ত করেছেন তারাও সেই একই সঙ্গে অস্তিত্বের শেকড় খোঁজার নিরন্তর কমপ্লেক্সে ভুগছেন। সুতরাং যতই একটি ছেলে ও একটি মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে নাচানাচি, একসঙ্গে রাত্রিযাপন ইত্যাতি পশ্চিমী জীবন ধারার যা কিছুই করুন না কেন জাতিগত নিজস্বতা বজায় রাখার একটা তীব্র লড়াই কিন্তু চলছে এদের মনে সবসময়ই। কারণ ব্রিটেনের ব্রিটিশ সমাজ ভারতীয়দের একান্ত নিজস্ব তো মনে করে না কখনই। যতই মেলামেশা হোক রঙের পার্থক্য, মনের পার্থক্য একটা থেকেই যায়। হাজার বছরের পুরনো ভারতীয় সভ্যতা তো এক নিমেষে বদলে ফেলা যায় না। আজকের যুবকদের একটা টেনডেনসিই হল বড়দের কথা এড়িয়ে যাওয়া, কথার গুরুত্ব না দেওয়া। কিন্তু কিছু একটা আদর্শ তো তাদের সামনে দরকার।

সুশীলের স্বামীর মত আরও অনেক পরিবার আছে সাউথহলে, যারা এখনও এখানেও ভারতবর্ষের সবরকম স্বাদ পেতে চান। ব্রিটিশরা যেমন নেটিভদের কাছ থেকে নিজেদের দূরে রাখেন তেমনি এঁরাও পাশ্চাত্য ভাবধারা থেকে নিজেদের দূরে রাখেন। বিশেষ করে ব্যক্তিগত জীবনে ওঁরা পাশ্চাত্য ভাবধারা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেন। উদাহরণ হিসেবে বিষ্ণু দত্ত শর্মার কথাই ধরা যাক। ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কারস অ্যাসোসিয়েশনের একজন উচ্চপদস্থ কর্মী তিনি। এই সংস্থাটির সূচনায় আর যাঁরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন ইনি তাঁদের মধ্যে একজন। একত্রিশ বছর বয়সে পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলা থেকে তিনি ব্রিটেনে আসেন। ভাই, বোনের বিয়ে দিয়ে দেশ গাঁয়ে তার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে। একগাদা ঋণের বোঝা কাঁধে। তখনকার দিনে লোকেরা বলত—বিলেতের বাতাসে টাকা ওড়ে। পাঞ্জাব থেকে লোকজনেরা সুযোগ পেলেই চলে আসত ব্রিটেনে। তাই নিজের অর্থনৈতিক অবস্থাকে মজবুত করার উদ্দেশ্যেই তাঁর ব্রিটেনে আসা। লণ্ডনে তাঁর চেনাশোনা অনেকেই ছিলেন। তাঁর প্রতি ভীষণ সহানুভূতিশীল ছিলেন তাঁরা। কাজ না পাওয়ার আগে পর্যন্ত সেই সব পরিচিত জনেদের বাড়িতেই থাকতেন তিনি।

বিষ্ণু দত্তের মুখেই শোনা যাক। ১৯৫০—৬০ সালের কথা। লণ্ডনের চারিদিকে তখন কম মাইনের কাজকর্ম সত্যিই অনেক খালি থাকত। কিন্তু এশিয়াবাসীদের কাজ করার মত প্রায় কোনরকম কাজই সেখানে ছিল না। এত লোক

এসে পড়েছিল এই ছোট্ট দ্বীপটিতে। এশিয়াবাসী বলতে ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীদের সংখ্যাই অধিক। ভারতীয়, পাকিস্তানী আর সত্তরের দশক থেকে বাংলাদেশীরা। যেটুকু কাজ তাদের দেওয়ার মত ছিল তা কম মাইনের বাণিজ্যিক হাউসগুলিতে কলমপেশা, কিংবা দৈহিক কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর মানে অবশ্য এই নয় যে টাকা রোজগারের কোন উপায় তাদের ছিল না। যারা একটু বুদ্ধি খরচ করত তাদের উন্নতিও হয়ে যেত চটপট। যদিও অনেকেই আর্থিক ভিত শক্ত হওয়ার পরেই দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবত কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুব কম লোকই আবার দেশ গাঁয়ে ফিরত। দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থেকে বিশেষ করে ব্রিটেনের আবহাওয়ায় দৈনন্দিন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ার দরুন তাদের পক্ষে আবার ভারতে ফিরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠত।

তবু সাউথহলের ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই চাকরি জীবনের শেষে আবার ভারতে ফিরে যেতে চান। বিষ্ণু দত্ত বললেন–'বোনের বিয়ে দেওয়ার পরেই ভারত থেকে এখানে চলে আসি। সে আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা। তখন বয়স কম ছিল। কিন্তু এখন বুঝি এদেশে বার্ধক্য কত অসহনীয়। মাঝে মাঝেই ভারতে যান তিনি। গতবারে ভারতে গিয়ে তিনি প্রায় ন'মাস ছিলেন। তখন থেকেই ভারতে একেবারে থাকার ইচ্ছে তাঁর মনে দানা বাঁধে। এমনি অনেকেই আছেন। আছেন নরেন ব্যানার্জি বা সুধাময় দত্তের মত বয়স্ক প্রবাসীরাও। দেশের উষ্ণতার জন্য তাঁদের মন কেমন করে।

এ ধরনের হোম সিকনেস কিন্তু এখানকার ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় নেই বললেই চলে। জন্ম থেকেই এরা ব্রিটিশ আবহাওয়ায় মানুষ। এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা এরা ভাবতেই পারে না। কথা প্রসঙ্গে অবতার সিং–এর মেয়ে মনবীণ জানালেন, 'এক ধরনের আত্মিক বন্ধনে ভারতের সঙ্গে আমরা জড়িয়ে তো আছিই। সেখানকার সমস্ত খবর আমরা রাখি। কিন্তু ভারতে গিয়ে বসবাসের কথা আমরা ভাবতেও পারি না। সাউথহলে আমরা অনেক ভালো আছি। যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি এখানে। আমার মনে হয় যে কোন ভারতীয় সাউথহলে এলে অনায়াসে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন।' আজ পর্যন্ত জাতিগত বৈষম্যের পরিচায়ক সরকারীভাবে কোনরকম অবহেলা কিংবা অবজ্ঞা মনবীণ পায়নি। তিনি স্বীকার করেন সাউথহলের সাদা চামড়ার লোকেরা এশিয়াবাসীদের দেখলে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে এটা তিনি লক্ষ্য করেছেন। বিশেষ করে ভারতীয়দের বেলায় সেটা যেন বেশি চোখে পড়ে। বোধহয় প্রতিযোগিতার মনোভাব থেকেই এটা হয়।

'আমি এটাও দেখেছি লণ্ডনের বাইরে সাউথহলের ভারতীয়রা যথেষ্ট নিরাপদে থাকা সত্ত্বেও নিজেদের নিরাপত্তাহীন ভাবেন। শুধু ভারতীয়রা নয় অন্যান্য দেশের লোকেরাও এই একই রকম ভাবেন।'

মনবীণ প্রায়ই তাঁর দেশে যান, গ্রামেই যান। পাঞ্জাবের মোগায় তাঁর ঠাকুরদা আছেন। মনবীণ বললেন, 'আমাদের প্রতি ওদের ব্যবহার দেখে মনে হয় আমরা যেন অন্য গ্রহের মানুষ। এমন কি আমরা সহজভাবে কথা বললেও তাঁরা সেটা সহজভাবে নেন না, লোকেরাও কেমন ছাড়াছাড়া ভাবে মেশে। তাই কিছুদিন সেখানে থাকার পরই আমরা হোমসিক হয়ে পড়ি। যারা ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নেয়নি তারাও এরপর ব্রিটিশ নাগরিকত্বের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়ায়।'

বিশ, পঁচিশ বছর আগে যে কোনও ভারতীয়র পক্ষে ব্রিটেনে একটা কাজ জুটিয়ে ফেলা এমন কোন কঠিন ছিল না। যেটুকু অসুবিধে তা শুধু গায়ের চামড়ার রঙের পার্থক্যের দরুন। প্রথমদিকে শিক্ষিত, কারিগরিবিদ্যার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অনেকেই ব্রিটেনে আসতেন। ১৯৬০ থেকে ৭০ অবধি এই ধারা অব্যাহত ছিল। এর পরবর্তী সময়ে ব্রিটেনের সাদা চামড়ার লোকেদের ভারত থেকে আগত লোকেদের প্রতি যতটা 'রাজ' জমানার অ–নাক সিঁটকোনো ভাবই থাক বা না থাক, পরে যাঁরা এসেছেন তাঁদের গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা যে মোটেই রাজি ছিলেন না সেটা খুবই স্পষ্ট, কারণ সব রকম চাকরিতেই ভারতীয়রা ব্রিটিশদের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছিল। এখনও ভারত ও অন্যান্য দেশ থেকে আগত আগন্তুকদের প্রতি ব্রিটেনের সাধারণ লোকেদের ঘৃণা, বিদ্বেষ অতটা প্রকাশ্য নয় (কারণ ব্রিটিশ অভিবাসন আইনের কড়াকড়িতে আসাটা অনেক কমেছে), কিন্তু মনোভাবটা রয়েই গেছে কয়েক বছর আগের সাউথহলের দাঙ্গা এরই চরম বহিঃপ্রকাশ।

সাজিদ আলিও বরাবরের মত সাউথহলেই থেকে গেছেন। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে চিকিৎসাবিদ্যায় পড়াশুনোর জন্য তিনি ব্রিটেনে আসেন। পড়াশুনোর জন্য ব্রিটেনে এলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনে থাকারই মনস্থির করেন। প্র্যাকটিস শুরু করে দেন সাউথহলে। সাজিদ আলিরা তিন ভাইবোনই ইংলণ্ডে পড়াশুনো করেছেন। সবার বড় সাজিদ। পাকিস্তানের এক ব্যবসায়ী পরিবারে ছোট বোনের বিয়ে হয়েছে। এখন সেও ইংলণ্ডে। গত পঁচিশ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে সাউথহলের। শুধু সাজিদ আলির কথাতেই যে তা প্রকাশ পায় তা নয়, গত কয়েক দশক ধরে যাঁরা সাউথহলের বাসিন্দা তাঁদের সকলেরই অভিমত তাই।

১৯৫০–এর প্রথম দিকে সাউথহলের প্রায় সব বাসিন্দাই ছিল সাদা চামড়ার। এখন এক–তৃতীয়াংশ দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসী। হাই স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এমন কোন দোকানদার বোধহয় পাবেন না যিনি ভারতীয় বংশভূত নন–তা খবরের কাগজ বিক্রেতা থেকে শুরু করে মাসিক পত্রিকা, জামাকাপড়, ক্যাসেট, খাওয়ার জিনিস যাই বলুন না কেন। এমন কি একশো বছরের পুরনো সাপ্তাহিক পত্রিকা–'সাউথহল গেজেট' পঁচিশ বছর আগেও যে পত্রিকা শুধু শ্বেতাঙ্গদের জন্যই ছিল, এখন ব্রিটেনে বসবাসকারী ভারতীয় বংশভূতরাও এর অঙ্গীভূত হয়ে গেছেন। হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবী, বাংলা, গুজরাতি ভাষার কাগজপত্রও বের হয় এখান থেকে। এ ধরনের সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি নয়, তবে একটা জাতিগতভাব তো থাকেই। সাউথহলের গুজরাতিরা বেশিরভাগ এসেছেন আফ্রিকা থেকে, এদের অনেকের সেখানে ব্যবসাপত্র ছিল। এঁরাও নিজেদের দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেন, বিয়ে শাদি উৎসব অনুষ্ঠানকে নিয়ে। ইতিমধ্যে সাউথহলে দু-দুবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেছে। দুটি দাঙ্গাই শ্বেতাঙ্গ গুন্ডাদের দ্বারা সংঘটিত। এই দাঙ্গা হাঙ্গামায় প্রায়ই ভারতীয়দের সম্পত্তিহানি ঘটে। শ্বেতাঙ্গদের এ ব্যাপারে অপরোক্ষ সাহায্য করেন অনেক ব্রিটিশই, ফ্রন্টের কর্মীরা। কিন্তু ভারতীয় গোষ্ঠীও এখন পাল্টা জবাবে পেছপা নয়। যদিও দেশের আইন শৃংখলা তারা ভীষণভাবে মেনে চলে। জাতিগত বিদ্বেষ জনিত আক্রমণের মোকাবিলা ও শান্তিশৃংখলা বজায় রাখার জন্য সাউথহলের ভারতীয় ও ব্রিটিশ যুবসম্প্রদায় সম্প্রতি একটি দল গঠন করেছে। আর ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলোও আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছে ভোট পেতে হলে ভারতীয়দের হাতে রাখা দরকার। এখানকার লোকেরা রাজনীতির ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রধান পার্টিগুলির শাখার সঙ্গে মিলে মিশে যাচ্ছে। ভারতীয় কর্মী সংঘের প্রভাবে এদের মধ্যেও আবার শাখা প্রশাখাও দেখা দিচ্ছে। কনজারভেটিভ পার্টি ইতিমধ্যেই ভারতীয় যুবসম্প্রদায়কে তাদের দিকে টানছে, টানার চেষ্টা করছে লেবার পার্টিও। অবশ্য একটা কথা বলে নেওয়া দরকার, সাউথহল কিন্তু প্রভাবিত করছে ভারতীয় রাজনীতিকেও। এখানকার কিছু কিছু শিখ ও গুরুদুয়ারা কর্তৃপক্ষ রাজনীতি পাঞ্জাবের বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করে। তবে যে সমস্ত যুবকেরা এই প্রবাসে শিখ রাজনীতির সঙ্গে কোনভাবে জড়িত তারা ভারতীয় বংশোদ্ভূত না বলে ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত বলাই যুক্তিযুক্ত, কেননা অনেককাল আগে এদের পিতামহ, প্রপিতামহরা ভারত ছেড়ে ব্রিটেনে এসে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন। এখানে অবশ্য বাংলাভাষাভাষীর সংখ্যা যথেষ্ট। তাদের মধ্যে বেশী ভাগই বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষজন। তবে ভারতীয় বাঙালিরাও আছেন, কবি সম্মেলন, পত্রপত্রিকা প্রকাশ, স্বরস্বতীপূজা আর বিজয়া-সম্মিলনী নিয়ে।

সবশেষে বলা যায় সাউথহলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের অধিবাসীরা সকলেই আচার ব্যবহারে হলেও মানসিকভাবে পুরোপুরি এখনও ব্রিটিশ হয়ে যায়নি। তারা আবার নতুন করে শিকড়সন্ধানী। অন্ততঃ ভারতে বসবাসকারী 'ট্যাঁস'দের চেয়ে এরা অনেক বেশি ভারতীয়, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। **–প্রবীণা সূদ**
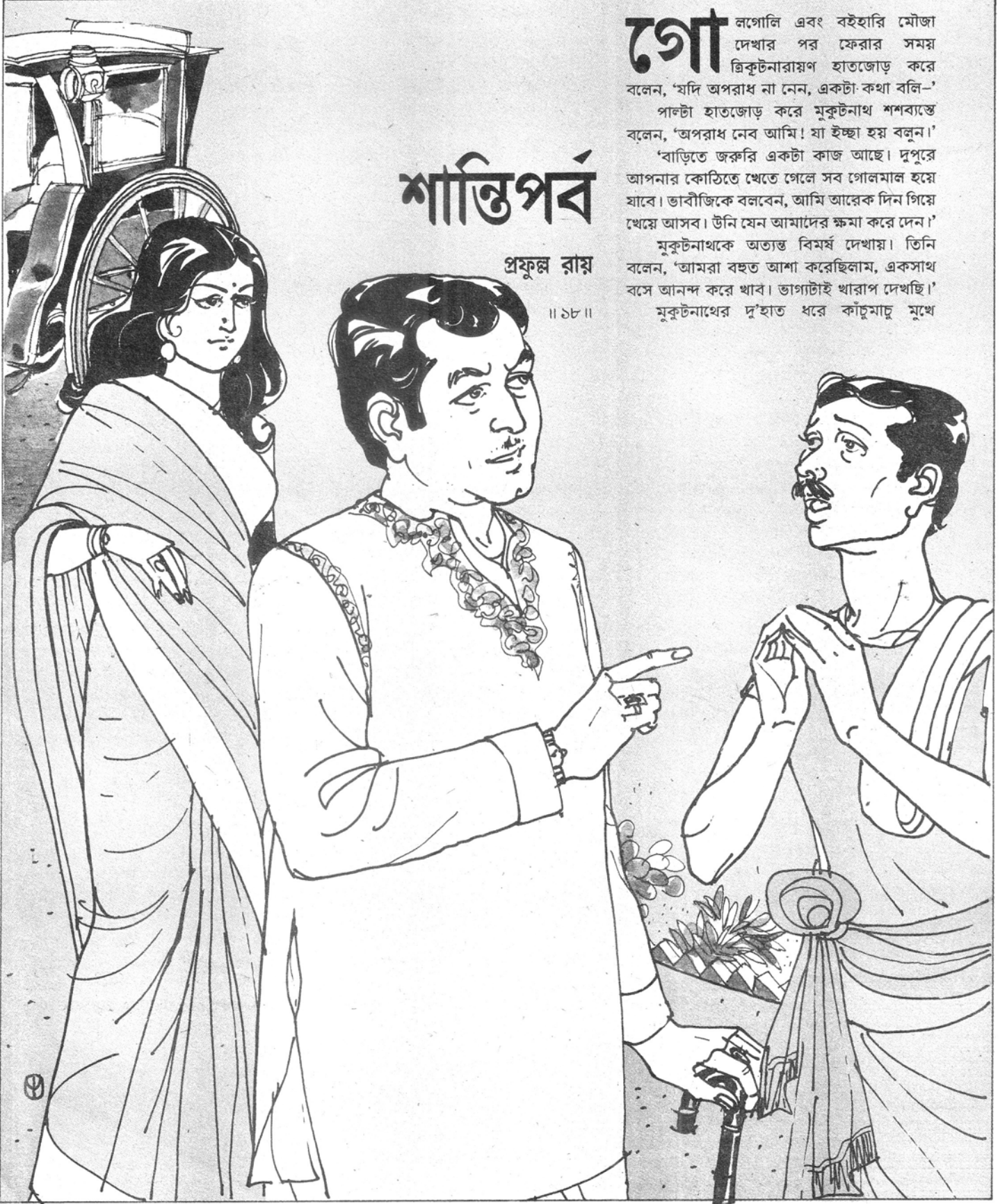
শান্তিপর্ব

প্রফুল্ল রায়

॥ ১৮ ॥

গোলগোলি এবং বইহারি মৌজা দেখার পর ফেরার সময় ত্রিকূটনারায়ণ হাতজোড় করে বলেন, 'যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা বলি—'

পাল্টা হাতজোড় করে মুকুটনাথ শশব্যস্তে বলেন, 'অপরাধ নেব আমি! যা ইচ্ছা হয় বলুন।'

'বাড়িতে জরুরি একটা কাজ আছে। দুপুরে আপনার কোঠিতে খেতে গেলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। ভাবীজিকে বলবেন, আমি আরেক দিন গিয়ে খেয়ে আসব। উনি যেন আমাদের ক্ষমা করে দেন।'

মুকুটনাথকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখায়। তিনি বলেন, 'আমরা বহুত আশা করেছিলাম, একসাথ বসে আনন্দ করে খাব। ভাগ্যটাই খারাপ দেখছি।'

মুকুটনাথের দু'হাত ধরে কাঁচুমাচু মুখে

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন'আপনার না, ভাগ্যটা আমারই খারাপ। দু'টো দিন, ওনলি টু ডেজ। তারপর আমি হরিশ আর রাজেশকে সঙ্গে করে এসে ভাবীজির রান্না খেয়ে যাব।'

মুকুটনাথ হতাশভঙ্গিতে বলেন, 'ঠিক আছে। কৃপা করে আসবেন কিন্তু—এবার মেহমানদারির চান্সটা যেন পাই।'

ত্রিকূটনারায়ণ এবার হেসে ফেলেন। হালকা গলায় বলেন, 'পাবেন পাবেন। চিন্তা মাত কিজিয়ে—' একটু থেমে ফের বলেন, 'আরেকটা মেহরবানি যে করতে হবে মুকুটনাথজি—'

মুকুটনাথ বলেন, 'মেহেরবানি কি, হুকুম করুন।

ত্রিকূটনারায়ণ জানান, তাঁরা মুকুটনাথের ফিটন নিয়ে আপাতত কামতিগঞ্জে ফিরে যাবেন। বাড়ি পৌঁছে ফিটনটা ফেরত পাঠানো হবে। মুকুটনাথ যেন তাঁর ড্রাইভারকে মোটর নিয়ে কামতিগঞ্জে চলে যেতে বলেন।

এরপর দু'টো ফিটন দু'দিকে চলে যায়। এক ফিটনে ত্রিকূটনারায়ণ, হরীশ এবং রাজেশ। অন্য ফিটনটায় মুকুটনাথ, কিরণ আর খুবলাল।

'মিশ্র নিকেত'—এর কাছে যখন কিরণদের ফিটন এসে পৌঁছয়, সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। রোদে এখন ছুরির ধার। গরম হাওয়া গনগনে ভাপ ছড়াতে ছড়াতে ধরমপুরা টাউনের ওপর দিয়ে উল্টোপাল্টা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

ফিটনটা দেখে দারোয়ান ধাতব শব্দ করে লোহার গেট খুলে দেয়।

কোচোয়ান ভেতরের ফাঁকা জায়গায় ফিটনটা এনে থামাতেই মুকুটনাথ এবং কিরণ নেমে পড়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা মাঝবয়সী নৌকর উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসে। কিন্তু কিছু বলার আগেই নতুন শিবমন্দিরের বারান্দা থেকে কুলগুরু বশিষ্ঠ নারায়ণ তাকে থামিয়ে দেয়, 'তোকে কিছু বলতে হবে না। যা বলার আমি বলছি।'

মুকুটনাথ শিবমন্দিরের দিকে তাকান। বারান্দায় শুধু বশিষ্ঠ নারায়ণই নেই, রেবতীও রয়েছেন। তাঁরা দু'জনেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন।

মুকুটনাথের স্নায়ু খুবই সজাগ। মুহূর্তে তিনি টের পান, গোটা মিশ্র নিকেত—এর আবহাওয়া কেমন যেন থমথমে। ঘন্টা তিনেক আগে তিনি যখন গোলগোলি এবং বারহৌলি মৌজায় গিয়েছিলেন, এ বাড়ির কোথাও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে নি। কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ কি ঘটে যেতে পারে? কিছুটা উদ্বেগই হতে থাকে তাঁর।

আগে লক্ষ্য করেননি মুকুটনাথ এবার তাঁর চোখে পড়ে নৌকর নৌকরনী দূরে দূরে থোকায় থোকায় দাঁড়িয়ে চাপা নিচু গলায় কী যেন বলাবলি করছে। নিজের অজান্তেই ভুরু কুঁচকে যেতে থাকে মুকুটনাথের।

বশিষ্ঠ নারায়ণ এবং রেবতী কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। বশিষ্ঠ নারায়ণ বলেন, 'তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

মুকুটনাথ বলেন, 'কী?'

চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে বশিষ্ঠ নারায়ণ বলেন, 'এখানে না, ভেতরে চল' রেবতীকে বলেন, 'তুমি কিরণকে ওপরে ওর ঘরে পৌঁছে দাও। ডান দিকের সিঁড়ি দিয়ে যাবে।'

ওপরে যাবার দুটো সিঁড়ি আছে এ বাড়িতে। রেবতী মাথা নেড়ে বলে, 'জি।' কিরণের দিকে ফিরে বলে, 'আয়।'

কিরণ খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বিমূঢ়ের মতো সে রেবতীর সঙ্গে ডান ধারের সিঁড়ির দিকে চলে যায়।

বশিষ্ঠ নারায়ণ বলেন, 'এসো মুকুট—'

পা বাড়াতে গিয়ে ত্রিকূট নারায়ণের অনুরোধ মনে পড়ে যায় মুকুটনাথের। যে মোটরে করে সকালে তিনি এসেছিলেন সেটা ফেরত পাঠাতে বলেছেন।

ত্রিকূট নারায়ণের ফোর্ড গাড়িটা এক কোণে পার্ক করা হয়েছে। মাঝবয়সী নৌকরটা তাকে কিছু বলার জন্য দৌড়ে এসেছিল সে এখনও দাঁড়িয়েই আছে। তাকে দিয়ে ত্রিকূট নারায়ণের ড্রাইভারকে ডাকিয়ে ফিরে যেতে বলেন। তারপর বশিষ্ঠ নারায়ণের সঙ্গে বাড়ির দিকে এগিয়ে যান।

যেতে যেতে বশিষ্ঠ নারায়ণ চাপা গলায় বলেন, 'বহুত মুসিবত্ মুকুট—'

মুকুটনাথের স্নায়ু খুবই সজাগ। মুহূর্তে তিনি টের পান, গোটা মিশ্র নিকেত-এর আবহাওয়া কেমন যেন থমথমে। ঘন্টা তিনেক আগে তিনি যখন গোলগোলি এবং বারহৌলি মৌজায় গিয়েছিলেন, এ বাড়ির কোথাও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে নি। কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ কি ঘটে যেতে পারে? কিছুটা উদ্বেগই হতে থাকে তাঁর।

'কী হয়েছে? মায়ের কি কিছু হল?' একটু আগের সেই উদ্বেগটা হঠাৎ অনেকখানি বেড়ে যায় মুকুটনাথের।

'না না, মহেশ্বরী ঠিক আছে।'

'তা হলে?'

'ভেতরে গিয়ে সব বলব।'

মুকুটনাথ বুঝতে পারছিলেন, বশিষ্ঠ নারায়ণ এই খোলা জায়গায় যেখানে নৌকর নৌকরনীরা থিক থিক করছে—কিছুই বলবেন না। যা জানাবার গোপনেই জানাবেন।

মুকুটনাথ ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। কোনো কারণেই তিনি অধীর হয়ে পড়েন না। তাঁর ধৈর্য অফুরন্ত। আর কোনো প্রশ্ন করেন না তিনি।

দু'জনে একটু পর একতলার বাঁ-দিকে একটা ফাঁকা ঘরে গিয়ে সোফায় মুখোমুখি বসেন।

মুকুটনাথ স্থির চোখে বশিষ্ঠ নারায়ণের দিকে তাকান, 'এবার বলুন গুরুজি—'

বশিষ্ঠ নারায়ণ বলেন; 'ওই ছোকরা এসেছে।'

'কার কথা বলছেন?'

'ঐ যে দিল্লীবালা, যার কথা কিরণের কলেজের বড়ে মাস্টারনী তোমাকে চিঠিতে জানিয়েছিল।'

পলকে মুখচোখের চেহারা একেবারে পাল্টে যায় মুকুটনাথের। চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হতে থাকে, শরীরের সব রক্ত গিয়ে জমা হয় দু'চোখে। মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে সে দু'টো ফেটে যাবে। কণ্ঠার কাছের রক্তবাহী শিরাগুলো দড়ির মতো পাকিয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত ঘষে মুকুটনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি প্রভাকরের কথা বলছেন তো?'

'হ্যাঁ—' আস্তে মাথা হেলিয়ে দেন বশিষ্ঠ নারায়ণ।

মুকুটনাথ বলেন, 'কখন এসেছে কুত্তাটা?'

'তোমরা ফিটন নিয়ে বেরিয়ে যাবার এক দেড় ঘন্টা পর।'

'কোঠির ভেতর ঢুকতে দিল কে? দারবানেরা?'

'নেহী, আমিই দিয়েছি।'

মুকুটনাথ যত ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হোন না, কুলগুরুর সিদ্ধান্তের ওপর কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি যা করেছেন তা মেনে নিতেই হবে। কোনো প্রশ্ন না করে মুকুটনাথ তাকিয়ে থাকেন।

বশিষ্ঠ নারায়ণ এবার বলেন, 'ছোকরাকে দারবানেরা ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছিল না। ও তখন কিরণের নাম করে এমন চেল্লাচিল্লি শুরু করে দেয় যে লোক জমে যাচ্ছিল। ঘরের কেচ্ছা বাইরে রটুক, সেটা তো ঠিক না মুকুটনাথ। তাই ওকে ভেতরে এনে বসিয়েছি।'

মুকুটনাথ সায় দিয়ে বলেন, 'ঠিক করেছেন। ছোকরা হঠাৎ এখানে এল কেন? আপনাকে কিছু বলেছে?'

'নেহী। আমি জিজ্ঞেস করিনি। ভাবলাম, গোলগোলি মৌজা থেকে ফিরে এলে যা বলার তুমিই বলবে। আমি অবশ্য তোমার সঙ্গে থাকব।'

কোনো কারণেই মুকুটনাথ মাথা গরম করেন না। অসীম ধৈর্য তাঁর। কিন্তু এই মুহূর্তে অসহ্য ক্রোধে এবং উত্তেজনায় রক্তচাপ ভয়ানক বেড়ে যায়। কণ্ঠাব দু'পাশে শিরা দু'টো মোটা হয়ে ফুলে ওঠে। চোখ দু'টো এত লাল হয়ে উঠেছে যেন ফেটে গিয়ে এখনই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। দাঁতে দাঁত ঘষে বলেন, 'ওর এত সাহস যে দিল্লি থেকে ধরমপুর পর্যন্ত চলে এসেছে। শুয়ারকা বাচ্চার সঙ্গে একটা কথাও আমি বলব না, স্রিফ লাথ মারতে মারতে কোঠি থেকে বার করে দেব। নৌকরদের বলব গর্দানা পাকড়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে।' বলতে বলতে উঠে পড়েন।

বশিষ্ঠ নারায়ণ মুকুটনাথের হাত ধরে ফের বসিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো মুকুটনাথ। ছোকরা দিল্লির প্রফেসর, ধরমপুরার আনপড়ে ডরপোক আদমী না। যে এত দূর আসতে পারে তার পেছনে জরুর বড়ে বড়ে আদমী আছে।'

বশিষ্ঠ নারায়ণ বোঝাতে চাইছেন, ধরমপুরার গরীব শিক্ষাদীক্ষাহীন ভীরু লোকজনের ওপর অবশ্যই দাপট খাটানো যায়, চোখ রাঙিয়ে তাদের দাবিয়ে রাখাও যেতে পারে। তাদের গলা দিয়ে টুঁ শব্দটি বেরুবে না। কিন্তু দিল্লির একজন উচ্চশিক্ষিত প্রফেসারের ওপর ঠিক ঐ পদ্ধতি চালানো যায় না। তাছাড়া তার পেছনে প্রভাবশালী মুরুব্বির জোর থাকা অসম্ভব নয়। জবরদস্তি কিছু করতে গেলে তার ফলাফল হবে মারাত্মক। কোনরকম হৈচৈ না করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রভাকরকে ফেরত পাঠানোই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। মনে রাখা দরকার, সব জায়গায় জোরজুলুম খাটে না, কূটকৌশলও কাজে লাগাতে হয়।

বশিষ্ঠ নারায়ণের কথাগুলো আদৌ অসার নয়, তার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। মুকুটনাথের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক জুড়িয়ে আসে। তিনি বলেন, 'আপনি যা বলছেন তা-ই হবে।'

'চল তা হলে—'

একতলায় মহেশ্বরীর কামরা বাদ দিলে তিন তিনটে বসবার ঘর রয়েছে। দক্ষিণ দিকের শেষ মাথায় প্রভাকরকে বসানো হয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে বশিষ্ঠ নারায়ণ এবং মুকুটনাথ সেখানে চলে আসেন।

ঝকঝকে চেহারার প্রভাকর একটা সোফায় চুপচাপবসে ছিল। মাথার ওপর আস্তে আস্তে পুরনো মডেলের দুই ব্লেডের পাখা ঘুরে যাচ্ছে। মুকুটনাথদের দেখে সে উঠে দাঁড়ায়। মাথা ঝুঁকিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে বলে, 'নমস্তে। আমি প্রভাকর।'

প্রতি নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতটা সামান্য তুলে মুকুটনাথ বলেন, 'আমার নাম মুকুটনাথ মিশ্র'। বশিষ্ঠ নারায়ণের পরিচয় দিয়ে বলেন, 'ইনি আমাদের কুলগুরু।'

'ওঁকে আগেই দেখেছি। পরিচয়টা জানতাম না।' প্রভাকর বলতে থাকে, 'আমি দিল্লি থেকে আসছি।'

'শুনেছি। বসুন। অতদূর থেকে যখন এসেছেন, নিশ্চয়ই জরুরি কোন ব্যাপার আছে।'

সবাই বসে পড়েছিল। সেন্টার টেব্‌লের একধারে মুকুটনাথ এবং বশিষ্ঠ নারায়ণ তাঁদের মুখোমুখি প্রভাকর।

প্রভাকর বলে, 'হ্যাঁ। আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। আমার বিশেষ কিছু কথা আছে।'

'বলুন'—মুকুটনাথ তার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকাল

প্রভাকর হাতজোড় করে বলে, 'আমার একটা অনুরোধ আছে। বয়েসে আপনাদের চেয়ে আমি অনেক ছোট। 'আপনি টাপনি' করে বলছেন আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে।'

'ঠিক আছে। যা বলতে এসেছ, বলে ফেল—'

'কিন্তু'—বলে দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে বশিষ্ঠ নারায়ণের দিকে তাকায় প্রভাকর।

তার মনোভাবটা বুঝতে পারেন মুকুটনাথ। বলেন, 'তুমি আমাকে যা বলবে, ওঁর কাছে তার একটা শব্দও গোপন থাকবে না। কোনো চিন্তা নেই। গুরুজির সামনে বললে তোমার ক্ষতি হবে না।'

প্রভাকর বলে, 'ঠিক আছে। আপনি যখন বলছেন—'

প্রভাকরকে থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ বশিষ্ঠ নারায়ণ বলে ওঠেন, 'কথাবার্তা পরে হবে। তুমি অতদূর থেকে এসেছ। নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত। আগে চা খাও, তারপর কথা—'

কুলগুরুর সূক্ষ্ম চালটা ধরতে পারেন মুকুটনাথ। অর্থাৎ খাতিরদারি করে, মধুর ব্যবহারে, মিষ্টি কথায় প্রভাকরকে বিদায় করতে হবে। অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তিনি বলে ওঠেন, 'নৌকরগুলোকে ঘাড় ধরে আমার কোঠি থেকে বার করে দেবো। একটা লোক দিল্লি থেকে এসে টায়ার্ড হয়ে বসে আছে, তাকে চা পানি দেবার কথা কারো খেয়াল নেই? যত ভুচ্চরের দল—' বলেই চিৎকার করে একটা নৌকরকে ডাকেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘোলের উৎকৃষ্ট ঠাণ্ডাই গুলাবজামুন প্যাঁড়া, কলাকন্দ, নিমকিন এবং সমোসা এসে হাজির হয়। মুকুটনাথ পরম সমাদরের ভঙ্গিতে বলেন, 'খাও—'

প্রভাকর আপত্তি না করে ঠাণ্ডাই এবং দু'একটা মিঠাই খেয়ে বলে, 'এবার শুরু করতে পারি?'

'সার্টেনলি।'

কোনো ভনিতা না করে সোজাসুজি কাজের কথায় চলে আসে প্রভাকর, 'কিরণের কাছে আমার কথা হয়ত আপনি শুনে থাকবেন।'

মুকুটনাথ চোখের কোণ দিয়ে বশিষ্ঠ নারায়ণকে এক পলক দেখে নেন। তারপর বলেন, 'কিরণ আমাকে বলেনি। তবে তোমার নাম অন্য জায়গা থেকে শুনেছি।

'কোত্থেকে?'

'সেটা না জানলেই কি নয়?'

প্রভাকর বলে, 'জানতে পারলে ভাল হ'ত।'

মুকুটনাথ বলেন, 'বেশ শুনে নাও। কিরণের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন।'

প্রভাকর হকচকিয়ে যায়। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে খুব সংযত ভঙ্গিতে বলে, 'প্রিন্সিপ্যাল আমার সম্বন্ধে কি লিখেছেন, জানতে চাই না। তবে আমার ধারণা—'

চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকেন মুকুটনাথ, কোনো প্রশ্ন করেন না।

প্রভাকর থামে নি। সে বলে যায়, 'ঐ চিঠিটা পাওয়ার পরই বোধহয় কিরণকে আপনি লোক পাঠিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন?'

ধারাবাহিক

মুকুটনাথ বলেন, 'তোমার এ কথার জবাব আমি দেবো না। অন্য কথা থাকলে বল—'

প্রভাকর তক্ষুনি কিছু বলে না। কিছুক্ষণ ভেবে শুরু করে, 'কয়েকদিন আগে আমি কিরণের একটা চিঠি পেয়েছি। তাতে সে কী লিখেছে আপনি কি জানেন?'

সমস্ত ঘরটায় নিরেট স্তব্ধতা নেমে আসে। কিরণকে তো দিনরাত একরকম কয়েদীদের মতো কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে। আজ গোলগোলি মৌজায় যাওয়া ছাড়া এক পলকের জন্যও তাকে 'মিশ্র নিকেত' এর বাইরে বেরুতে দেওয়া হয় নি। একদিন একা একা সে তার ছেলেবেলার বন্ধুর বাড়ি যেতে চেয়েছিল, দারোয়ানেরা তাকে রুখে দেয়। এই নিশ্ছিদ্র নজরদারির ভেতরে থেকেও সে কী করে প্রভাকরকে চিঠি পাঠাতে পারল?

মুকুটনাথের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। কর্কশ স্বরে তিনি বলেন, 'কী লিখেছে?'

প্রভাকর মুকুটনাথের চোখের দিকে পলকহীন তাকিয়ে বলে, 'আপনি তাকে এ বাড়িতে আটকে রেখেছেন।'

বশিষ্ঠ নারায়ণের পরামর্শ মতো প্রাণপণে এতক্ষণ নিজেকে সংযত রেখেছিলেন মুকুটনাথ। কিন্তু শরীরের সব রক্ত আবার তাঁর মাথায় উঠে আসতে থাকে।

প্রভাকর এবার বলে, 'এটা আপনি কিছুতেই পারেন না। দিস ইজ টোটালি আন ল'ফুল, পুরোপুরি বে-আইনি।'

মুকুটনাথকে এই মুহূর্তে বারুদের স্তূপের মতো দেখাচ্ছে। প্রভাকরের কথা শুনতে শুনতে তার দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন বশিষ্ঠ নারায়ণ। বিস্ফোরণটা ঘটবার আগেই মুকুটনাথকে থামিয়ে দিয়ে তিনি প্রভাকরকে বলেন, 'মুকুট কিরণের বাবা। মেয়েকে আটকে রাখা না রাখা, সবটাই তার ইচ্ছা।'

প্রভাকর আগাগোড়াই ধীর স্থির এবং শান্ত। নিরুত্তেজ ভঙ্গিতে সে বলে, 'কিরণ সাবালিকা। তাকে কারো ইচ্ছামতো আটকে রাখা যায় না, বাবা হলেও না। আপনারা যে কোন ভকিলকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারেন।'

বশিষ্ঠ নারায়ণ অদ্ভুত হাসেন, 'তুমি কলেজে পড়াও, জ্ঞানী আদমী। আইন না জেনেই কি আর বলছ! তবে আইনের ওপরও অনেক কিছু থাকে।'

'যেমন।' কিঞ্চিৎ উৎসুক দেখায় প্রভাকরকে।

'তুমি সেই শ্লোকটা জরুর জানো—'পিতা স্বর্গ: পিতা ধর্ম:—'

'জানি।'

'তাছাড়া কিরণদের বংশের একটা পরম্পরা আছে।'

'কিরকম?'

'এই বংশে বাপই সব। তার ইচ্ছা বা হুকুমের বাইরে কোনো কিছু হবার উপায় নেই।'

'ছেলেমেয়ে যদি বাবার ইচ্ছায় না চলে?'

'তার ফল তাদের ভুগতে হবে।' বশিষ্ঠ নারায়ণ বলেন, 'ওসব কথা থাক। তুমি তো বললে কিরণের চিঠি পেয়ে চলে এসেছ—'

'হ্যাঁ—' আস্তে মাথা নাড়ে প্রভাকর।

'কী জন্যে এসেছ, সেটা কিন্তু এখনও আমরা জানতে পারিনি।'

'আমি কিরণকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

বশিষ্ঠ নারায়ণ চমকান না। প্রভাকর যে এই উদ্দেশ্যেই এখানে হানা দিয়েছে, সেটা যেন জানাই ছিল তাঁর। তিনি বিচলিত হ'ন না। অত্যন্ত স্বাভাবিক সুরে বলেন, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি—'

প্রভাকর বলে, 'নিশ্চয়ই।'

'তোমার সঙ্গে মুকুটনাথদের রিস্তেদারি আছে বলে কখনও শুনি নি। তুমি ওর ভাই না, চাচা না, মামা না—তোমার সঙ্গে একটা জোয়ানী লেড়কীকে আমরা যেতে দেবো কেন?'

প্রভাকর বলে, 'কিরণ আমার স্ত্রী। তাই ওকে আমার সঙ্গে যেতে দেবেন।' তার কণ্ঠস্বর শান্ত, অথচ দৃঢ়।

সমস্ত ধরমপুরা টাউন তোলপাড় করে মিশ্র নিকেত-এর মাথায় আচমকা প্রচণ্ড শব্দে একটা বাজ পড়ে যেন। তারপর কিছুক্ষণের জন্য সারা ঘর একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়।

(ক্রমশ)

ট্র্যাক্টর রঙের আভায় উজ্জ্বল কী সুন্দর ওদের ঘর!
সবার সাধের এই রঙ কিন্তু সবার সাধ্যের মধ্যে!

ট্র্যাক্টর

দুই ধরনের ফিল্মেই সমান দক্ষতা

শাবানা আজমী: হিন্দি ছবির দু পিঠের নায়িকা

শাবানা ও নাসিরুদ্দিন, হিন্দি চলচ্চিত্রকে এক নতুন দিকদর্শন দিয়েছেন

একহাতে বাণিজ্যিক ছবি, তো অন্যহাতে আর্ট ফিল্মের সফলতা এই দুই বিপরীতমুখী শিল্পভাবনার সংগম শাবানা আজমীর ফিল্ম কেরিয়ারে ব্যতিক্রমী ইমেজ তৈরি করেছে।

লোকজন আজকাল বলছেন—আমি নাকি আর্ট ফিল্মে অভিনয় করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর, সেই ইমেজ ভাঙিয়ে এখন শুধুই রোজগার বাড়াতে চাই। আর চাই বাণিজ্যিক ছবিতে কাজ করে পরিচিত সুপারস্টার হয়ে উঠতে। আমি 'অংকুর' আর 'পরিণয়' ছবিতে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে দেব আনন্দের 'ইশক-ইশক-ইশক' ছবির কাজও করেছি। আমি একইসঙ্গে দুই ধরনের ছবিতে আগেও কাজ করেছি এখনও করছি। একদিকে 'সতী' আর 'পেস্টনজী'তে কাজ করেছি। আবার অপরদিকে নাদিয়াদওয়ালার 'সত্যম'—এর মত

ছবিতেও কাজ করেছি। 'সত্যাম' ছবিটির আগের নাম ছিল 'সচ'। নায়ক অমিতাভ বচ্চন। তবে প্রথম থেকে আমি ভালভাবেই জানতাম যে ব্যবসায়িক ছবিতে কাজ করলে তবেই দর্শক, বাজার সবদিকেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। আর সেটা মনে করে আমি কোন খারাপ কাজ করি নি। তাছাড়া আমার অভিনয়ে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে তো আর্ট ফিল্মই–বলতে বলতে শাবানা আজমী বেশ উত্তেজিতই হয়ে পড়েন।

শাবানার এই বক্তব্য অনেকটাই সত্যি। আসলে ব্যবসায়িক কিংবা আর্ট দু'ধরনের ছবিতেই তাঁর সমান প্রশংসা। এইজন্যেই তাঁর সবরকমের ছবি দর্শকের ভিড়ে জমজমাট। সে যেরকমই ছবি হোক। সৈয়দ মির্জার 'আলবার্ট পিন্টো কো গুস্সা কিঁউ আতা হ্যায়' অথবা সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জকে খিলাড়ি', গোবিন্দ নিহালনীর 'আক্রোশ', শেখর কাপুরের 'মাসুম', সাই পরাজপের 'স্পর্শ', মহেশ ভাটের 'অর্থ' শ্যাম বেনেগালের 'অংকুর', 'নিশান্ত', 'জুনুন' আর বাসু চ্যাটার্জির 'স্বামী' এইসব নতুনধর্মী ছবিতে দর্শকরাই শাবানাকে একটি নতুন ইমেজের জন্যে বিশেষ সম্মান দিতে থাকেন। সেই সম্মান আর

এখন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রেও

'অমর আকবর এ্যান্টনী', 'কর্মা', 'ফকীরা', 'হীরা আউর পত্থর'–এর মত ছবিতে পাওয়া সম্মানের মধ্যে পার্থক্য অনেক।

সত্তর দশকে শাবানা আর্ট ও ব্যবসায়িক ফিল্মের দুই মহলকেই মাতিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এই গত কিছু বছর ধরে দর্শকদের মাথা থেকে ক্রমশ শাবানার জাদু ধোঁয়াটে হয়ে আসছে। সম্ভবত এইজন্যেই তিন বছর ধরে তাঁর ছবির কোন ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে না। এই প্রথম শ্যাম বেনেগালের নির্মিত দু'টি ছবি 'ত্রিকাল' ও 'সুসমন' পুরোপুরি তৈরি হয়েও ক্রেতার অভাবে বাক্সতেই পড়ে রয়েছে। তাও 'ত্রিকাল' যাহোক করে দূরদর্শনে দেখানর অনুমতি পেল। কিন্তু 'সুসমনের' কোন সদ্‌গতি হল না। 'ত্রিকাল'–এ প্রায় সব শিল্পীরাই নতুন। সেই তুলনায় 'সুসমন'–এ শাবানা আজমী ছাড়াও রয়েছেন পরিচিত শিল্পীরাই।

সেইরকমই মৃণাল সেনের 'খণ্ডহর', গৌতম ঘোষের 'পার', কল্পনা লাজমীর 'এক পল', মুজফ্ফর আলীর ছবি, বিজয়া মেহেতার 'পেস্টনজী' যথেষ্ট প্রশংসা পাওয়া সত্ত্বেও অনেকদিন পর্যন্তই ছবিগুলি বাক্সবন্দী ছিল। ছবিগুলি শিল্প নির্দেশনার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উৎকর্ষতা লাভ করে।

–দুর্ঘটনা শুধুই আমার ছবির ক্ষেত্রেই হয়নি। সব আর্ট ফিল্মই এজন্য যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে শাবানার অভিমত হল––আর্ট ফিল্মের লোকসানের দুটি মুখ্য কারণ হল ভিডিও আর দূরদর্শন। এই দুটি মিডিয়া বিশেষ করে ভিডিও সংস্কৃতিই আর্ট ফিল্মকে বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ব্যবসায়িক ছবিতেও আর তেমন দর্শক পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে সিনেমা হলে না গিয়ে ঘরে বসে ভিডিওতে ছবি দেখাই দর্শকেরা বেশি পছন্দ করেন। তাহলে আর্ট ফিল্মের জন্যে তাঁরা কষ্ট করে সিনেমাহলে যাবেন কেন?

গুঞ্জন উঠেছে শশিকাপুরের জন্যেই শাবানা 'উৎসব'–এ সুযোগ পান নি। কিন্তু তাঁকে ব্যবসায়িক ছবিতে স্টার বানাবার জন্যে সবরকমের সাহায্য করেন শশিকাপুর। ছোট থেকেই, শাবানা শশিকাপুরের ভীষণ ফ্যান। তিনি যখন পঞ্চাশ ষাট দশকের বিখ্যাত নায়ক। শশিকাপুর সেইসময় প্রত্যেক রবিবার জানকী কুটিরে যেতেন তাঁর বাবা পৃথ্বীরাজকাপুরের কাছে। শাবানা আজমীও তখন সেই পাড়াতেই থাকতেন। কৈফী আজমী ও শৌকত আজমী তাঁর মা-বাবা। শাবানাও প্রত্যেক রবিবার সেইসময় পৃথ্বীরাজ কাপুরের বাড়িতেই আসতেন। তখন শাবানার বয়স দশ-বার বছর। শশি কাপুর এলেই জানলায় খটখট শব্দ করতেন। লজ্জায় আর সামনে যেতে পারতেন না। শশিকাপুর তাকালেই অটোগ্রাফের খাতা এগিয়ে দিতেন শাবানা। পরে শশিকাপুর জানতে পারলেন যে সেই লাজুক ছোট্ট মেয়েটি বড় হয়ে আর্ট ফিল্মের এক অভিনেত্রী হয়েছেন এবং নিজেকে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য খুবই চেষ্টা করছেন। তখন শশিকাপুর তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলেন।

কিন্তু শাবানা খুব অল্প সময়েই বুঝতে পারেন যে মাত্র একজন সুপার স্টারের সঙ্গে কাজ করলেই চলবে না। তাতে ব্যবসায়িক ছবিতে বিশেষ লাভ হয় না। আর নিজের ভিতরের শিল্পবোধকেও ঠিকমত ফুটিয়ে তোলা যায় না। তাছাড়া মানসিক অশান্তি তো রয়েছেই। তাই 'ফকীরা' 'হীরা আউ পত্থর', 'খুন কি পুকার', 'অঙ্গারা', 'লোক ক্যায়া কহেঙ্গে', 'দুসরী দুলহন' 'অমর আকবর অ্যান্টনী', 'অমরদীপ', 'অশান্তি',– বহু ছবিতে চোখ বুজে সই করে গেছেন। একরকম ভূমিকায় অভিনয় করতে অস্বীকার করে বেছে নিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র। পাশে পাশে তিনি আর্ট ফিল্মকেও সময় করে দেন।

সেইসময় শশিকাপুরেরও ঠিক একই অবস্থা হয়েছিল। 'দীওয়ার' ছবির পরে তিনি একক

'সুসমন' ছবিতে শাবানা আজমী, পল্লবী যোশী ও পঙ্কজ কাপুর

ছবি: ফ্রন্ট

নায়কের পরিবর্তে সহনায়কের ভূমিকাতেও অভিনয় করতে থাকেন। তাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেন তাঁর স্ত্রী জেনিফার কেণ্ডেল। শাবানা শ্যাম বেনেগালের সঙ্গে শশিকাপুরের পরিচয় করিয়ে দেন। 'জুনুন' ছবিটি তৈরির জন্যে তাঁকে পাঠান। আবার সেই শশিকাপুরের সঙ্গেই যখন শাবানার ঠোকাঠুকি লাগে তখন তিনি বলেন শাবানা নিজেকে ইনটেলেকচুয়াল আর্টিস্ট বলে জাহির করে। ওদিকে কর্মাশিয়াল কাজ করতেও তো ছাড়ে না—আর্ট ফিল্মে শাবানার বিপরীতে সবচেয়ে বেশি অভিনয় করেছেন নাসিরুদ্দিন শাহ্। শাবানা সম্পর্কে তাঁর অভিমত—শাবানা আসলে খুব আত্মকেন্দ্রিক,— নিজেকেই শুধু ভালবাসে ও। সবদিক থেকেই শাবানা এখনও অন্তরাষ্ট্রীয় জনপ্রিয়তা আর সাফল্যের শীর্ষে বসে রয়েছেন। সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি,' মৃণাল সেনের 'খণ্ডহর', ঋষিকেশ মুখার্জির 'নমকীন', মহেশ ভাটের 'অর্থ' মোহন কুমারের 'অবতার', ইস্মাইল শ্রফের 'থোড়ী সী বেওফাই' আর বি আর চোপড়ার 'কর্মা'—তে অভিনয়ের পরেই শাবানা আজমী এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এইসব ছবি শুধুই যে সাধারণ ফর্মুলামাফিক ছবির থেকে আলাদা তা কিন্তু নয়। এমন কি নামী-দামী ফিল্ম নির্মাতারাই এই ছবিগুলি তৈরি করেছেন। শাবানার অভিনয় কেরিয়ারে চতুর্থ ধাপ শুরু হয় ১৯৮৬ সালে। যখন তিনি গৌতম ঘোষের 'পার' ছবিতে অবিস্মরণীয় কাজ করেন।

'পেস্টনজী' আর 'সতী' নিয়ে শাবানাকে যথেষ্টই মেহনত করতে হয়েছে। এর কাজ চলাকালীন এক সাক্ষাৎকারে শাবানা বলেন— 'সতী'তে আমাকে এক অনাথ মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছে। মেয়েটি আত্মীয়স্বজনের দয়ামায়ায় আশ্রিত। তার একমাত্র সঙ্গী ছিল একটি গাছ। গাছটিকে মেয়েটি তার মনের সব কথা বলত। সেই গাছটির সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হয়। আসলে তার বিয়ে না হলে খুড়তুতো বোনেরও বিয়ে আটকে যাচ্ছে। তাদের খানদানী বংশের এই নিয়ম। এইভাবেই এক নিরপরাধ, অনাথ মেয়েকে বলি দেওয়া হয়, সে এক সোস্যাল সিস্টেমের ছবি। 'পেস্টনজী'তে আমি এক পারসী মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করি। শুটিং—এর আগে পাড়ার ' পরিবারগুলিতে যাই। তাদের চালচলন, ' ব্যবহার, কথা-বার্তা পর্যবেক্ষণ করার ' বিজয়া মেহেতা একটি পার্টির আ করেছিলেন। তাতে শুধু পারসীরাই আ ছিলেন। যাতে আমি, নাসীর আর অনুপম খে কাছাকাছি থেকে তাদের দেখতে পাই।

বিখ্যাত নির্দেশক জন শ্লেসিঙ্গারের 'মাদাম সোজুৎসকা', নিকোলস কোলৎজে নুই বেঙ্গলি' ও নায়ক অভিতাভ বচ্চনের বিগ অভিনীত ছবি 'সত্যম'—এ অভিনয় করে শা উপলব্ধির নতুন দিকগুলি খুলে যায়। ' সোজুৎসকা'তে তিনি বিশ্বপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী ম্যাকলিসের সঙ্গে অভিনয় করেন। এ একভাবে শ্যুটিং শেষ হলে তবে লণ্ডন ফেরেন। এ সম্পর্কে শাবানা বলেন—এই নির্মাতা—নির্দেশক 'মাণ্ডী' দেখে খুবই প্র হন। 'সতী'—তে আমার শ্যুটিং—এর ব্যস্ততা নিজেই ছবির শ্যুটিং শিডিউল পরের দিকে পি দেন।

লণ্ডনের লেখক ও চিত্রপরিচালক তারিক আলি চ্যানেল–৪–এর জন্যে 'বেনজির ভুট্টো' নামে একটি ছবি তৈরি করেছিলেন। তাতে বেনজিরের ভূমিকায় অভিনয় করেন শাবানা। লণ্ডনে 'মাদাম সোজুৎসকা'র শ্যুটিং চলাকালীনই তারিক আলি বেনজির ভুট্টোর কস্টিউম আর মেকআপে শাবানার ফটো সেশন নিয়ে নেন। শাবানা খুবই আশ্চর্য হন যে তাঁর চেহারা বেনজির ভুট্টোর সঙ্গে যথেষ্ট মাত্রায় মিলে যাচ্ছে।

শাবানার অভিনয় কেরিয়ার শুরু হয় আর্ট ফিল্মে। সঙ্গে তিনি লাভ করেছেন অনেক পুরস্কার আর অন্তর্রাষ্ট্রীয় সম্মান। ১৯৭৬ সালে তিনি তেহ্‌রান ফিল্ম উৎসবের জুরি নির্বাচিত হন। সর্বকনিষ্ঠ জুরি। তারপর চেকোশ্লোভাকিয়ায় জুরি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন। ১৯৮৩তে দিল্লিতে অন্তর্রাষ্ট্রীয় ফিল্ম উৎসবে জুরির জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান হয়। কিন্তু তিনি রাজি হন নি। অবশ্য ১৯৮৫–তে ফিল্ম উৎসবে তিনি জুরির সদস্য পদে নির্বাচিত হন।

১৯৮৮তে গুঞ্জন শোনা যায় যে শাবানা 'পদ্মশ্রী' খেতাব পাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে তার কানে আসে 'পদ্মশ্রী' সম্মান স্মিতা পাতিলই পাচ্ছেন। পরে এই বছর পদ্মশ্রী ঘোষণা হলে অতঃপর অজস্র আলোচনার সম্মুখীন হন তিনি। তারা বলেন যে ১৯৮৭তে শাবানা কিছুই করেন নি। শুধুই বম্বেতে ঝোপড়পট্টীর দখলকারীদের পক্ষে অনশন আর ধর্ণাই দিয়েছেন। শাবানাও চুপ করে বসে থাকেন নি। তিনিও বলেন–আগের বছর আমি কি কি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি তা আমার জানা নেই। হয়ত ওরা সেসব জানেন।

'সতী' ছবিতে শাবানা আজমী

বেশ কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর শাবানা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। অবশ্য এখন তার দিনের শুরু হয় সেইসব বিপত্তিকর লোকেদেরকে নিয়েই। তারা আজকাল নিজেদের বিভিন্নরকম আর্জি নিয়ে তাঁর কাছে আসছেন। সঙ্গে আরও আছেন পণে বিপর্যস্ত যুবতী বা তার মা বাবা। কিংবা স্বামীর দ্বিতীয়া স্ত্রী। আরও রয়েছেন ঝোপড়পট্টীর লোকেরা। যাদের বম্বের মহানগর পালিকা হটিয়ে দিয়েছে। বাড়ি–অলারা তাদের জোরজবরদস্তি তাড়িয়ে সেখানে গগনচুম্বী অট্টালিকার ভিত পুঁততে চেয়েছিলেন। ... বলেন–আমি তাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ বা... সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছি। দরকার ... তাদের কাছে নিজে গিয়েছি। কাজও হয়েছে ... বম্বের ৯০ লাখ লোকের মধ্যে প্রায় ৫০ লাখ ... ঝুপড়িতে বাস করে। সেখানে জল, আলো ... কিছুরই সু-ব্যবস্থা নেই। স্বাস্থ্য আর পরি... দিকে নজর দেওয়া তো দূরের কথা। তাদের ... থেকে জানোয়ারের মত উচ্ছেদ করা হয়। তার... জায়গা থেকে উঠে আর এক জায়গায় ... বানায়। আবার সেখান থেকে তাড়ালে আর... জায়গায় যায়। শুধুই তাড়িয়ে দিলেই কোন স... সমাধান করা যায় না। তারাও দেশেরই নাগ... আর সব রকমের সুযোগ পাবার অধিকারী। ... একমাত্র দোষ যে তারা গরীব আর অস... বম্বেতে হাজার একর জমি খালি পড়ে র... সেখানেই উন্নতধরণের বস্তি তৈরি করে ... থাকবার ব্যবস্থা করা যায়। তার থেকে এই ... ঝোপড়পট্টীর অনেক সমস্যার সমাধান হতে ...

-বম্বে ব্যুরো

বিজয়া মেহতার 'পেস্টনজী'তে পার্শী চরিত্রে

লণ্ডনে 'মাদাম সোজুৎসকা'র শ্যুটিং চলাকালীনই তারিক আ... বেনজির ভুট্টোর কস্টিউম আ... মেকআপে শাবানার ফটো সেশ... নিয়ে নেন।

ছবি : সি এন এস

পুরস্কৃতা শাবানা

টাইসন কি আলির আসন টলাবেন!

টাইসন, ফ্রাঙ্ক ব্রুনোর সঙ্গে

বিশ্ব বকসিং-এর নবতম কিংবদন্তী প্রথম শতকোটিপতি মাইক টাইসন এখন বিশ্বের এক নম্বরে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ককে নিয়ে গোটা দুনিয়া তোলপাড়। মাইক কি মহম্মদ আলির রেকর্ড ভাঙতে পারবেন? পাহাড়প্রতিম যশের নেপথ্যে মাইকের অতীত জীবন আর বহু অজানা তথ্যের আবরণ উন্মোচন করেছেন আমাদের ক্রীড়া সাংবাদিক বিবেক আনন্দ।

গত একবছর ধরে সারা বিশ্ব অসীম আগ্রহে অপেক্ষা করছিল একটি লড়াই-এর জন্য। এটাই নাকি হবে শতাব্দীর সেরা লড়াই। বক্সিং-এর বিশ্বযুদ্ধ। শুধু বক্সিং-প্রেমী নয়, যাদের বক্সিং সম্বন্ধে কোন কালেই একটুও আগ্রহ ছিল না তারাও অপেক্ষা করছিল ২৭ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক সিটির এই লড়াইটির জন্য। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ, এমন কি যেখানে বক্সিং একেবারেই অপরিচিত সেখানেও পত্র পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল জল্পনা-কল্পনার খবর, এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সম্ভাবনাকে ঘিরে।

একজনের বয়েস একুশ, আরেক জনের একত্রিশ। একজন পাঁচ ফুট সাড়ে এগার ইঞ্চি লম্বা আরেকজনের উচ্চতা তার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে তিন ইঞ্চি বেশি। অল্পবয়েসী নাতিদীর্ঘ এই বক্সারের নাম মাইক টাইসন যাকে সবাই ডাকে 'আয়রন মাইক' বলে। আরেকজন মাইকেল স্পিঙ্কস। লড়াই এর অভিজ্ঞতা দু'জনের প্রায় সমান তবে টাইসনের রেকর্ড একটু বেশি ভালো। ৩৪টি লড়াই-এর সবকটিতে জিতেছেন তিনি। এর মধ্যে নকআউট ৩০টি। অন্যদিকে স্পিঙ্কস মোট ৪৮টি পেশাদারি লড়াই জিতেছেন, এর মধ্যে আছে গত ১২ বছরে ৩১টি লড়াইয়ে একটানা জয়। নক আউট, ২১টি লড়াইয়ে।

এই লড়াই থেকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রায় ৪৩ কোটি টাকা পাওয়ার কথা। বিজেতার ২৬ কোটি আর পরাজিতের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১৭ কোটি। খেলার মধ্যে বক্সিং-এই সবচেয়ে বেশি টাকা, কিন্তু এতেও এই পরিমাণ টাকা আগে কেউ কল্পনা করতে পারেনি। টিকিট বিক্রির টাকা আর ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন থেকে আয়োজকরা পেয়েছিলেন প্রায় ১০০ কোটি টাকা। আয়োজক শেলী ফিংকলের দেওয়া হিসেব মত খালি টিকিট বিক্রি থেকেই আয় হয়েছে ১৮ কোটি টাকা। রিং-এর ধারের সীট গুলির জন্য এক একটি টিকিটের দাম ছিল ২২ হাজার টাকা।

শুধু যে এই রেকর্ড পরিমাণ অর্থের জন্য এই লড়াইকে শতাব্দীর সেরা লড়াই বলা হচ্ছিল তা নয়। বক্সিং-এর রিং-এ যখন শক্তির সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই হয় তাকেই বলা হয় সবচেয়ে উচুঁদরের লড়াই। 'আয়রন মাইক'-এর শরীরে আছে পাগলা হাতির মত শক্তি। অন্যদিকে মাইকেল স্পিঙ্কস বিখ্যাত তার ট্যাকটিক্যাল লড়াইয়ের জন্য। বক্সিং গবেষকদের মতে টাইসন যে ভয়ংকর গতিতে এগিয়ে আছে তাকে থামানর ক্ষমতা একজনেরই আছে তিনি হলেন মাইকেল স্পিঙ্কস। বাহুবল দিয়ে নয় টাইসনকে হারাতে হবে বুদ্ধি দিয়ে। এই ধরনের ক্লাসিক লড়াই খুব বেশি দেখা যায় না। ১৯৭৪ সালে

জর্জ ফোরম্যানের সঙ্গে মহম্মদ আলির লড়াই ছিল এমনি এক সাড়া জাগান ঘটনা। এখন যেমন টাইসন অপরাজেয় তখন জর্জফোরম্যানও ছিলেন তাই। মহম্মদ আলি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেতাবের লড়াইয়ে ফিরে এসে তাকে ৮ রাউণ্ডে ধরাশায়ী করেন। এই বিশ্ববিখ্যাত লড়াইয়ের ৪ বছর বাদে মহম্মদ আলি হার মানেন লিওন স্পিঙ্কসের কাছে। ১৯৭৮র ৩০শে অক্টোবর লাস ভেগাসের সেই লড়াইয়ে ১৫ রাউণ্ডে হেরে যাওয়ার পর 'দ্য গ্রেটেস্ট' প্রথম বুঝতে পারেন তাঁর দিন শেষ হয়ে আসছে। সেই লিওন স্পিঙ্কসের ছোট ভাই এই মাইকেল স্পিঙ্কস।

টাইসন আর স্পিঙ্কসের এই সাড়াজাগানো লড়াই দেখতে ভিড় জমে ওঠে নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে। কনভেনশন হলে ২১, ৭৮৫ জন লোক বসার জায়গা। টিকিটের দাম আকাশচুম্বী, কিন্তু সব টিকিট অনেক আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের ব্যস্ত রুটিন বাদ দিয়ে লড়াই দেখতে এসেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেসি জ্যাকসন, সুপারস্টার পপসিঙ্গার ম্যাডোনা আর পল সাইসন, বিখ্যাত লেখক স্টিভেন কিং, অভিনেতা মিল্টন বার্লে, জ্যাকি ম্যাসন, জ্যাক নিকলসন, বক্সিং-এর প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ান মহম্মদ আলি ও আরও অনেক সুপারস্টার। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন বাঘা বাঘা সব জুয়াড়ীরা, কে জিতবে তার উপর বাজি ধরতে। আটলান্টিক সিটির বিখ্যাত 'ট্রপিকানা হোটেল'-গ্রুপ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়েন গ্রিফিথ সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, তাঁর হোটেলের ৫৫০টি ঘরের ৯০ শতাংশ আগে থেকেই নিয়ে রেখেছে জুয়াড়িরা।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা পর্বতের মূষিক-প্রসবের মত হল। যে লড়াইকে বলা হচ্ছিল শতাব্দীর সেরা লড়াই তা হয়ে গেল শতাব্দীর সেরা জোক। অনেক দর কষাকষি হচ্ছিল লড়াই ১২ রাউণ্ডের হবে না ১৫ রাউণ্ডের? শেষ পর্যন্ত জুয়াড়িরা হিসেব কষে ১২তে।

মাইক টাইসনের হাতে লড়াইয়ের আগে ফিতে বাঁধা হয়, তবে স্পিঙ্কসের ম্যানেজার বুচ লুইস তা দেখেন নি। প্রথানুযায়ী বিপক্ষের লোকের সামনে ফিতে বাঁধতে হয়, সেজন্য লুইস বললেন তাদের সামনে নতুন করে ফিতে না বাঁধলে স্পিঙ্কস রিং-এ নামবেন না। কে আগে রিং-এ প্রবেশ করবে সেই নিয়েও বিতর্ক হয়, শেষ পর্যন্ত টস্ করে ঠিক হয় টাইসন আগে যাবেন। সমস্ত তর্ক বিতর্কের হিসেবনিকেশ শেষ করে দিলেন মাইক অবিশ্বাস্য মাত্র ৯১ সেকেণ্ডে। হাজার হাজার টাকা খরচ করে যাঁরা টিকিট কেটেছিলেন তাঁদের অনেকে সিটে বসার আগেই লড়াই শেষ হয়ে গেল। মাইকেল স্পিঙ্কসের 'রাইট জ্যাব' যা দিয়ে গত ১২ বছর ধরে প্রতিপক্ষকে তিনি ঘায়েল করে এসেছেন একবারের জন্যও তা দেখা গেল না। যে চতুরতা স্পিঙ্কসের প্রধান অস্ত্র বলে দাবি করা হচ্ছিল তারও খোঁজ পাওয়া গেল না। লড়াই শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টাইসনের ডান হাতের ভয়ংকর এক ঘুষিতে লুটিয়ে পড়েন স্পিঙ্কস। রেফারি ফ্রাঙ্ক কাপুচিনো দুই গোনার পর আবার উঠে দাঁড়ান স্পিঙ্কস। সঙ্গে সঙ্গে টাইসন স্পিঙ্কসের ডানদিকের চোয়ালে মারলেন তাঁর বিখ্যাত 'লেফট আপার কাট-রাইট হুক' যার আরেক নাম হাইড্রোজেন বোমা। এক পাক খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন স্পিঙ্কস। এক-দুই-তিন করে দশ পর্যন্ত গুনলেন রেফারি কিন্তু এসব আওয়াজ তখন তাঁর কানে ঢুকছে না। ফ্রাঙ্ক কাপুচিনো তাঁর ডান হাত দিয়ে মাইক টাইসনের বাঁ-হাত ধরে আকাশের দিকে তুলে ধরলেন। আগেই টাইসন দাবি করেছিলেন এই গ্রহে আমাকে হারানোর ক্ষমতা কারও নেই। লাইট হেভি ওয়েট বিভাগে পৃথিবীর অবিসংবাদিত বিশ্বচ্যাম্পিয়ান, অলিম্পিকের মিডল ওয়েট বিভাগে সোনা জয়ী আর লাইট হেভি থেকে হেভি ওয়েটে বিশ্বজয়ী হবার রেকর্ডধারী একমাত্র চ্যাম্পিয়নকে মাত্র দেড় মিনিটে নক আউট করে টাইসন প্রমাণ করলেন তিনি এখন অপরাজেয়।

টাইসনের বিয়ে

বক্সিং-এর পেশাদারি জগতে আসার দু-বছরের মধ্যেই টাইসন হয়ে গেলেন সুপার-স্টার। ১৯৮৪ লস এঞ্জেলসের ওলিম্পিকের ট্রায়ালে তাঁকে লড়তে হয়েছিল হেনরি টিলম্যানের সঙ্গে। হেনরি টিলম্যান সেই লড়াই জিতে ওলিম্পিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান আর হেভি ওয়েট বিভাগে সোনা জেতেন। অপেশাদারী জীবনে হতাশ হয়ে শেষপর্যন্ত পেশাদার হন টাইসন। তখন তার বয়স মাত্র ১৮। পেশাদারি জীবনের প্রথম লড়াই জেতেন ১৯৮৫র মার্চ মাসে। হেক্টর মার্সিডিজকে প্রথম রাউণ্ডে ধরাশায়ী করে মাইক টাইসন সেই যে যাত্রা শুরু করেছিলেন তারপর আর তাঁকে ফিরে তাকাতে হয় নি। পেশাদার হওয়ার দেড় বছর বাদে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেতাব জয় করলেন টাইসন। এর আগে, ১৯৮৬র নভেম্বর মাসে ৩৩ বছর বয়সী ট্রেভর বেরফিককে মাত্র সাড়ে পাঁচ মিনিটে নক আউট করে সারা বিশ্বকে চমকে দেন কুড়ি বছরের এই তরুণ।

মাইক টাইসনের কথাবার্তা আর চালচলনে একটা সরলতার ছাপ আছে। স্বল্পভাষী আর একটু লাজুক প্রকৃতির, বড়াই করতে তাকে খুব একটা দেখা যায় না; যা অন্যান্য সব বক্সাররা একটু বেশিই করে থাকেন। উচ্চতা ছয় ফুটেরও কম, শরীরের ওজন ৯৯ কেজি তাই একজন আদর্শ বক্সারের ঠিক যেমন হওয়া উচিত তাঁর চেহারা ঠিক তেমনটি নয়। টাইসন একটু বেশি পেশিবহুল অনেকটা বডি

বিল্ডারদের মত। শরীর হালকা থাকলে বকসিং রিং–এ হঠাৎ করে এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করতে আবার দরকার মত পিছিয়ে আসতে সুবিধে হয় কিন্তু টাইসন তাঁর পেশিগুলিকে ঠিকমত ভাবে ব্যবহার করে পাঞ্চগুলিকে আরও ভয়ংকর করে তোলেন। এটা তাঁর বিশিষ্টতা। তাঁর প্রশিক্ষক প্রয়াত কাসা ডি অ্যামাটো–কে বকসিং এর দ্রোণাচার্য বলা যায়। অনেক সেরা সেরা চ্যাম্পিয়ন তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে এসেছেন। টাইসন তাঁর কাছে থেকেই শিক্ষা পেয়েছিলেন, শরীরের ঠিক কোন জায়গায় ঘুষি মারলে আঘাত সবচেয়ে মোক্ষম হবে। লড়াই শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করেন টাইসন, দু'হাতের ভয়ংকর ঘুষিতে বিপক্ষের ডিফেন্স তছনছ করে দেন। তাঁর ঘুষিতেও অবিশ্বাস্য রকম বেশি জোর। গত জানুয়ারি মাসে প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ান ল্যারি হোমসের সঙ্গে লড়াইয়ে নামার কয়েক ঘন্টা আগে ড্রেসিংরুমে প্র্যাকটিস করার সময় খেলাচ্ছলে এক ঘুষি চালান দেওয়ালে। দেওয়ালের ইঁট ভেঙে তা পাশের রাস্তায় এক পথচারীর মাথায় প্রায় পড়তে যাচ্ছিল। টাইসন তড়িঘড়ি গ্লাভস খুলে পথে নেমে এসে লাজুক মুখে পথচারী ভদ্রলোকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। সমস্ত বড় বড় লড়াইকে চটজলদি শেষ করে দেওয়া তার প্রায় অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে। বকসিং–এর এত গ্ল্যামারের যুগেও টাইসন রিং–এ আসেন অতি সাধারণ পোশাকে। মাথার চুল একেবারেই ছোট করে ছাঁটা, খালি গা, পরনে একটি কালো রঙের প্যান্ট। মুখে খোঁচা দাড়ি, কালো রঙের জুতো, কিন্তু কোনও মোজা নেই। কোমরে কখনও থাকে ওয়ার্ল্ড বকসিং কাউন্সিলের বেল্ট কখনও বা তাও না। দেখলে মনে হয় পাশের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঢুকে পড়েছেন বকসিং–এর রিং–এ। তাঁর এই সহজ সাবলীল ভঙ্গি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর মনের ভীতি আরও বাড়িয়ে তোলে। তাঁর ভাবলেশহীন মুখ দেখে বোঝার উপায় থাকে না মনের কথা। গত ২৭শে জুন মাইকেল স্পিঙ্কসকে প্রথম রাউণ্ডের একেবারে শুরুতেই নক আউট করে ২৬ কোটি টাকার পুরস্কার জিতে নিতান্ত অবহেলায় যখন তাঁর দুই হাত উপরের দিকে তুলে ধরলেন, মনে হল খুব সাধারণ একটা লড়াইয়ে জিতেছেন টাইসন।

এ বছর টাইসন যে কটি সেরা লড়াই লড়েছেন তার মধ্যে রয়েছে জানুয়ারিতে ল্যারি হোমস, মার্চ মাসে টোনি আর জুন মাসে মাইকেল স্পিঙ্কস–এর সঙ্গে লড়াই। সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে ফ্রাঙ্ক ব্রুনোর সঙ্গে লড়াই হওয়ার ছিল, কিন্তু সেই লড়াইয়ের তারিখ ক্রমাগতই পিছোচ্ছে, শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে আগামী ডিসেম্বর মাসে।

বকসিংকে টাইসন বোধহয় সেই আর্মস্ট্রং–যুগে নিয়ে যেতে চান যখন মাসে ৫টি খেতাব রক্ষার লড়াই হত। এত বেশি লড়াইয়ের একটিই উদ্দেশ্য–যত বেশি সম্ভব অর্থ উপার্জন। বকসিং–এর ব্যবসা খুবই লাভজনক বক্সারদের জন্যই নয় প্রোমোটার আর আয়োজকদের জন্যও। এখনই পৃথিবীতে সবচেয়ে ধনী খেলোয়াড়ের আসন পেয়ে গেছেন টাইসন। প্রথম শতকোটিপতি খেলোয়াড়ও হতে চলেছেন তিনি। বকসিং জগতের দিকপাল মহম্মদ আলি, সুগার রে লিওনার্ড সারা জীবনে যত উপার্জন করেছিলেন টাইসন এখনই তা পেরিয়ে গেছেন। অন্যান্য ধনী খেলোয়াড় যেমন টেনিসের মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা, স্টেফি গ্রাফ, ইভান লেণ্ডল, কার রেসিং–এর নিকি লোভা, হর্স রেসিং–এর লেস্টার পিগট্ সবাইকে পিছনে ফেলে দিয়ে টাইসন অর্থ উপার্জনের লড়াইয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন।

আজ এমন অবস্থা, যে সব দেশে বকসিং–এর রেওয়াজ খুব একটা বেশি নেই সেখানেও সবাই আমন্ত্রণ জানাচ্ছে টাইসনকে, লড়াইয়ের জন্য। হাঙ্গেরীর বুদাপেস্ট, ইটালীর মিলান, জাপানের টোকিও, ব্রুনেই, রিও দ্য জেনেরা, হংকং সব জায়গাতেই নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু মুস্কিলটা হচ্ছে টাইসনের সঙ্গে সমান তালে লড়বার মত কাউকেই এখন ধারেকাছে দেখা যাচ্ছে না। এইভাবে চলতে থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই রকি মার্সিয়ানোর একটানা ৪৯টি জয়ের বিশ্বরেকর্ড ভেঙে ফেলবেন টাইসন। কিন্তু অর্থ উপার্জনের এই নেশায় শেষ হয়ে যান অনেক বক্সার। 'দ্য গ্রেটেস্ট' মহম্মদ আলি চারবার অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেও রিং–এ ফিরে এসেছিলেন। এখন

স্পষ্ট করে কথা বলার ক্ষমতা তিনি হারিয়েছেন। স্মৃতিশক্তি অনেক কমে গেছে, সবসময় তাঁর হাত পা কাঁপে থরথর করে। ডাক্তাররা তাঁর অকালমৃত্যুর ভবিষ্যৎবাণীও করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি সুখী ছিলেন না—চার চারটি বিয়ের কোনটিই সফল হয়নি। টাকার পেছনে ছুটে ছুটে মাইক টাইসনেরও কি সেই অবস্থা হবে?

পারিবারিক সূত্র থেকে বলা হয়েছে টাইসন নাকি মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেন মাঝে মাঝেই। অত্যাধিক লড়াইয়ে নামার আর কম বয়সে বেশি সাফল্য পাওয়ার জন্যই নাকি এই অবস্থা।

যে ছেলেটি খাবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলখানায় গেছল, যাকে রাস্তা ঘাটে মারপিট করার জন্য শিকল দিয়ে মাঝে মাঝেই বেঁধে রাখা হত 'চিলড্রেনস হোমে', সে কি সুপারস্টারের এই জীবনে অভ্যস্ত হতে পারছে না? বিয়ের চার মাস বাদেই তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী রবিন গিভেন টাইসনকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এখন খবর উড়ছে বাতাসে। টাইসনের চেয়ে চার বছরের বড় রবিনের গত জুন মাসে গর্ভপাত হওয়ার পর টাইসন নাকি তাকে খুব মারধোর করেন, এই অভিযোগ আনেন তাঁর শ্যালিকা স্টিফেন গিভেন। মাঝে আবার এক গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে ভীষণরকমের চোট পেলেন। তার জের কাটতে কাটতেই জড়িয়ে পড়লেন এক মারামারির ঘটনায়। এর আগে গত ২৯ জুন মাইক সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন তিনি আর লড়াইয়ে নামবেন না। বকসিং রিং থেকে মাত্র ২৯ বছর বয়সে তাঁর অবসর নেওয়ার খবর অবিশ্বাস্য মনে হয়।

মানসিক ভারসাম্যকে ফিরিয়ে আনার জন্যই তার বকসিং জীবনকে বলি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নাকি তিনি। আসলে, অনেকেই বলছেন টাইসন আলির মতই ঘটনা ঘটিয়ে বারবার সংবাদের শিরোনামে থাকতে চাইছেন। অবসর টবসর নেওয়া এই ধরনের কথাও চমক ছাড়া আর কিছু নয়।

অবসর নিলেও এই তিন বছর টাইসন যে রেকর্ড রেখে গেলেন তা তাঁকে বকসিং দুনিয়ায় অমর করে রাখবে। তবে তাঁকে কি গ্রেটেস্ট বলা যাবে? গত ৫০ বছরের বকসিং ইতিহাসের সেরা দশজন—জো লুই, মহম্মদ আলি, রকি মার্সিয়ানা, ল্যারি হোমস, জর্জ ফোরম্যান, সোনি লিস্টন, জো ফ্রেজিয়ার, জার্সি জো ওয়ালকট, ফ্লয়েড প্যাটারসন, ইঙ্গমার জনসন এদের অনেকের চেয়ে তাঁর একটানা ৩৫টি জয়, ৩১টি নক আউট—এর রেকর্ড যথেষ্ট ভালো।

কিন্তু এই হিসেবটাই কি সব? মাইক কি সেরকম শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হয়েছেন কখনও? আজকাল ৩ মিনিটের ১২ বা ১৫টি রাউণ্ডের জয় পরাজয়ের ফয়সালা হয় যাতে সাকুল্যে ৩৬ থেকে ৪৫ মিনিট লড়াই করতে হয়। অথচ রেকর্ড বইতে এমন লড়াইও আছে যখন দুই বকসার ৭ ঘন্টা ১৯ মিনিট ধরে ১১০ রাউণ্ড লড়াই করে গেছেন। টাইসন কি 'দ্য গ্রেটেস্ট'—এর আসন থেকে মহম্মদ আলিকে হঠানোর কথা স্বপ্নেও ভাবেন!

একথা ঠিক, মহম্মদ আলি অনেকবার হেরে গেছেন আর টাইসন একবারও হারেন নি। কিন্তু তিনবার অবসর থেকে ফিরে এসে হেভিওয়েট বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হওয়াও কি কম কথা? আজ বকসিংকে বিশ্বে জনপ্রিয় করার পিছনে আলির দানই সবচেয়ে বেশি। রিং—এর ঘেরাটোপ থেকে বকসিং কে ধরে এনে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন জনপ্রিয়তার মধ্যে দিয়ে মানুষের ঘরে ঘরে। বকসিং তাঁর কাছে নিছক লড়াই ছিল না, ছিল শিল্প। সেরা ফর্মে থাকতে থাকতে অবসর নিয়ে সুনাম আর রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তাঁর কাছে অবসর নেওয়া মানে ছিল চিরকালের মত পরাজয় মেনে নেওয়া। ওলিম্পিকে আমেরিকার হয়ে লড়ে যে অপেশাদার আলি (ক্ল্যাসিয়াস ক্লে) স্বর্ণপদক পেয়ে উজ্জ্বল করেছিলেন দেশের নাম, তিনিই আবার ভিয়েতনামের সংগ্রামী জনতার বিরুদ্ধে বর্বর লড়াইয়ে অংশগ্রহণ না করতে চেয়ে হয়েছিলেন সরকারের বিরাগভাজন। তিনি মাথা নত করেননি কখনই। সব মিলিয়ে আলিকেই বলা যায় 'দ্য গ্রেটেস্ট'। এ জায়গায় পৌছতে টাইসনের এখনও দেরি আছে!

বিশ-বর্ষীয়া সুন্দরী রাজিয়া ভালোবাসত হীরালালকে। কিন্তু হীরালালের মনে ছিল সন্দেহের বিষ। নিজের হাতে মাংস কাটার ভোজালি দিয়ে সে দ্বিখণ্ডিত করলো ঘুমন্ত রাজিয়াকে। রাজিয়া-র দেহটি রইলো হোটেলের ঘরে, আর মাথাটি নিয়ে হীরালাল বাইরে বেরিয়ে এসে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। সেই কাটামুণ্ড গিয়ে পড়লো খোদ রাজভবনের বাগানে...

সন্দেহ ও সমাধান!

তিরিশ বছর আগের ঘটনা। তারিখটা ছিল ১৯৫৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। ঘটনাস্থল বোম্বাই-এর রাজভবন প্রাঙ্গণ। সময়, সকাল ছ'টা। নারায়ণ নামে জনৈক মালী বাগান সাফ করতে করতে ডানদিকের অংশে গিয়ে পৌঁছালো। উঁচু দেওয়ালের ওপাশে বাণগঙ্গার দিকে যাবার রাস্তা চলে গেছে। আপনমনে ঘাসজমির ওপর থেকে শুকনো পাতা পরিষ্কার করতে করতে হঠাৎ চমকে উঠল, তার হাতের ওপর কি যেন এসে পড়ল একটা। ভালো করে তাকিয়ে দেখে সে চীৎকার করে উঠেই অজ্ঞান হয়ে গেল। তার চীৎকার শুনে ছুটে এল অন্যান্য মালীরা। সবাই এসে দেখলো, বীভৎস এক দৃশ্য। মালী নারায়ণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আর তার কাছেই পড়ে রয়েছে একটি যুবতীর কাটামুণ্ড।

হৈ চৈ চীৎকার, চেঁচামেচি। ছুটে এলেন সিকিউরিটি অফিসার। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন পুলিশ কমিশনার-কে। খোদ রাজভবনের সীমানার ভেতর এই কাণ্ড। পুলিশ মহলে আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। গাঁওদেবী থানায় সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হলো, সে খবর চলে গেল পুলিশ কন্ট্রোল রুমে। গাঁওদেবী পুলিশ এলো সবার আগে, তারপর একে একে ফিঙ্গার প্রিন্টস একসপার্ট, পুলিশ ফটোগ্রাফার, অন্যান্য অফিসার সব এলেন।

ছিন্ন মুণ্ডটি দেখে বোঝা যায়, যুবতীর বয়স ১৮ থেকে ২০, রঙ ফর্সা এবং বেশ সুন্দরী। কিন্তু এর ধড়টি কোথায়। সমস্ত রাজভবন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মেয়েটির ধড় খুঁজে পাওয়া গেল না। রাজভবনের বাঁদিকে সীমানার ওপারে সমুদ্র। সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলেও বহু খোঁজা হল। কিন্তু সব নিষ্ফল। সকাল ১১টা বাজে তখন। প্রতিটি থানায় বিস্তৃত খবর পাঠিয়ে দেওয়া হল।

ডাঙ্কন রোডস্থিত আদর্শ গেস্ট হাউসের ম্যানেজার মি: শাহ বেশ চিন্তায় পড়েছেন। পাঁচ নম্বর কেবিনটি গত ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে বাবুলাল তিওয়ারি ভাড়া নিয়েছেন। আজ ১২ ফেব্রুয়ারি, দেখা যাচ্ছে সেই কেবিনে ভদ্রলোক নিজের ত ঝুলিয়ে কোথায় যে গেছেন, এত বেলা হল, এখ ফিরলেন না। সঙ্গে তাঁর সুন্দরী স্ত্রী। এদিকে ঐ গে হাউসে কোনো গেস্ট-এর নিজের নিজের কেবি নিজস্ব তালা লাগানো বারণ। গেস্ট হাউসের ত লাগানো সেখানে বাধ্যতামূলক। অথচ তিওয়ারি নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। ম্যানেজারের মনে সন্দে হল। বেলা একটা নাগাদ তিনি কেবিনে পেছনদিকের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ভেতর দেখার চেষ্টা করলেন। অবাক হয়ে দেখলে চাদর ঢাকা দিয়ে বাবুলালজীর স্ত্রী শুয়ে রয়েছে তার শাড়ির এদিক ওদিক বেরিয়ে আছে। আশ তো, ঘুমন্ত স্ত্রীকে তালাবন্ধ রেখে যাওয়ার কি অ খুব ভাল করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মি: শাহ মনে হল, বিছানায় রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে বিচলিত হয়ে শাহজী চললেন ডোঙ্গরি থানায় খ দিতে।

এস আই শ্রীজাঘব সঙ্গে সঙ্গে ডিটেক

কিন্তু

আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে এবং সম্মিলিতভাবে প্রকৃতির এই বিনাশলীলার সম্মুখীন হচ্ছি, আমাদের মনোবল শীর্ষে রয়েছে।

স্বাধীনতার পর প্রথম বার বিহারের ১৮ জেলা ভূকম্পের কবলে

* ভূকম্পের খবর পাওয়ামাত্র প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাগুলি পরিদর্শন এবং ত্রাণসাহায্যের ব্যবস্থা গ্রহণ।
* ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাগুলিতে মুখ্যমন্ত্রীর ঝটিতি পরিদর্শন এবং ত্রাণকার্যে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ।
* মন্ত্রীমণ্ডলীর তাৎক্ষণিক উপ সমিতি গঠন, দায়িত্বন্যস্ত মন্ত্রীদের দ্বারা নিজ নিজ এলাকায় শিবির স্থাপন ও ত্রাণকার্য পর্যবেক্ষণ।
* আহতদের বিনা খরচে চিকিৎসার ব্যাপক ব্যবস্থা।
* স্থানীয় হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত মাত্রায় ওষুধ-পত্র, এক্স-রে প্লেট সরবরাহ তথা ব্লাড ট্রান্সফিউশানের ব্যবস্থা।
* রাজ্যের বাইরে থেকে এবং রাজ্যের প্রধান কেন্দ্রগুলির চিকিৎসক দল ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় কর্তব্যরত।
* গুরুতর আহতদের হেলিকপ্টারের সাহায্যে বড় হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা।
* ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে না পড়ার জন্য অগ্রিম ব্যবস্থা।
* প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে ১৫,০০০ টাকা ও আহতদের ৫০০ টাকার অনুদান অর্থ বরাদ্দ।
* উদ্বাস্তুদের আশ্রয়ের জন্য অস্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা।
* বিধ্বস্ত বাড়িঘরের জন্য 'হাডকো' এবং ব্যাঙ্কগুলি থেকে কম সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
* ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় পর্যাপ্ত খাদ্য-সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ।
* মুখ্যমন্ত্রীর ভূকম্প-ত্রাণ তহবিল গঠন।
* স্বেচ্ছাসেবী ও বে-সরকারী সংস্থাগুলিকে ত্রাণ সাহায্যে এগিয়ে আসার উৎসাহ দান এবং তাদের প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান।

আমাদের সংকল্প যাতে সাহায্যের হাত প্রত্যেক পীড়িত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যায়। আমাদের কাছে প্রতিটি জীবন-ই অমূল্য। আপনিও আমাদের সঙ্গে পীড়িতদের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য এগিয়ে আসুন, ত্রাণকার্যে অনবরত কর্মরত আমাদের সরকারী সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়ক হোন।
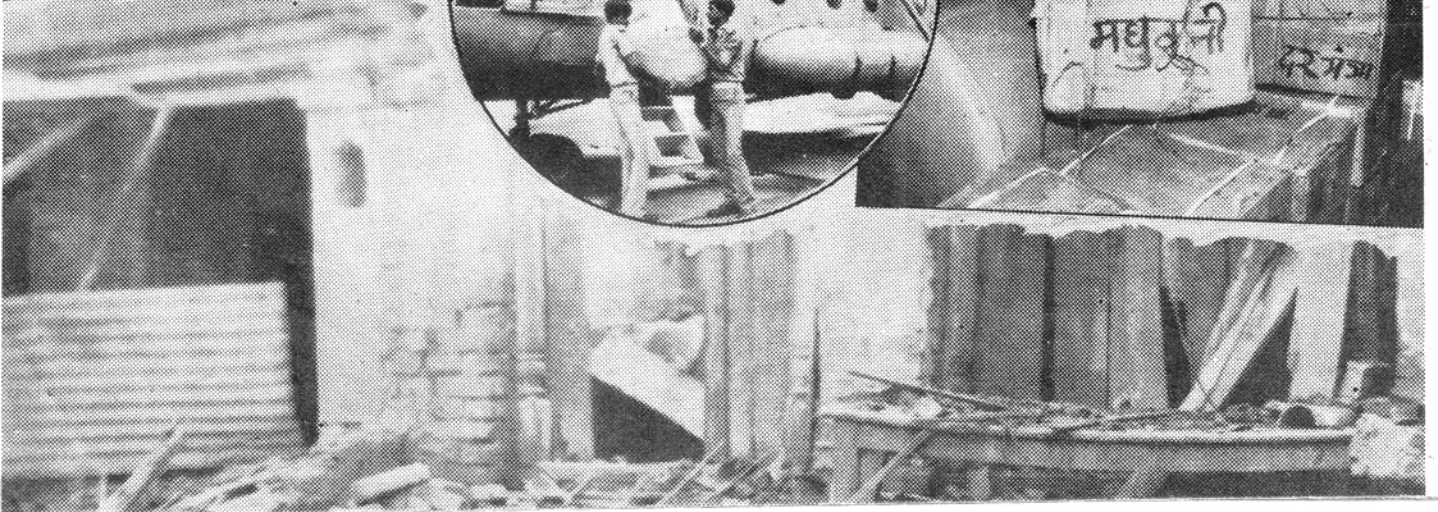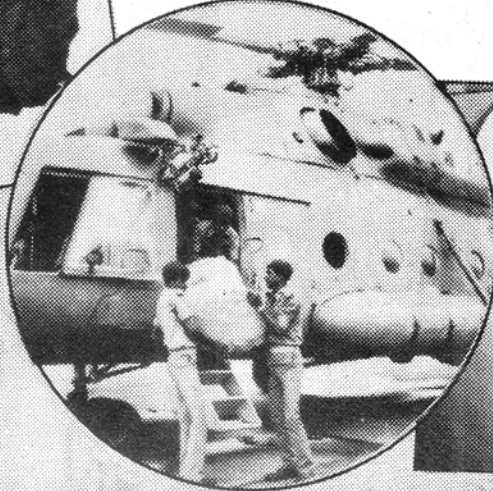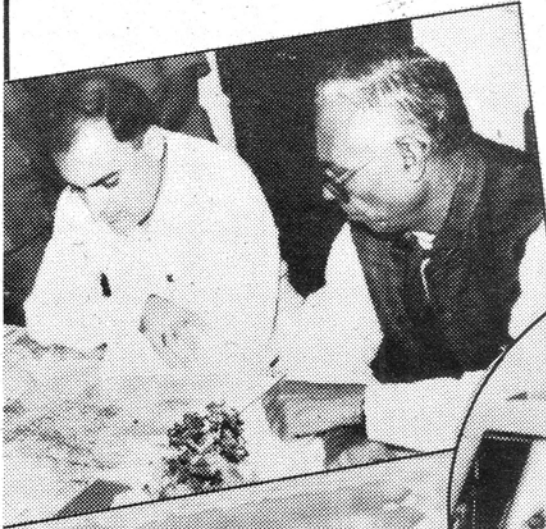
অফিসার শ্রী জয়ন্ত ওয়াগলে-কে এ ঘটনার রিপোর্ট জানালেন। ওয়াগলে খবর পেয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে চললেন গেস্ট হাউসের দিকে। সঙ্গে মি: জাঘব, আরো সব সহকর্মী। ওয়াগলে'র মাথায় ঘুরছিল, একটু আগে ওয়ারলেসে খবর এসেছে, রাজভবনে একটি মেয়ের কাটামুণ্ডু পাওয়া গেছে,–গেস্ট হাউসের এই ঘটনাটার সঙ্গে তার কোন যোগ নেই তো?

গেস্ট হাউসে পৌঁছে ওয়াগলে পাঁচ নম্বর কেবিনের সামনে গেলেন। ভেতরে ঢুকতে হবে, অথচ তালা ভাঙলে চলবে না। মহিলাকে যদি খুনই করা হয়ে থাকে, তাহলে খুনীর কাছে এ তালার চাবি পাওয়া যেতে পারে, প্রমাণ হিসেবে দারুণ কাজে লাগবে। তিনি কব্জা খুলিয়ে দরজা খুলে ফেললেন। দু'জন মাত্র লোক নিয়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন। প্রথম কাজ হচ্ছে, মহিলা বেঁচে আছে কিনা দেখা। তিনি ধীরে ধীরে চাদর সরিয়ে দিলেন। এরপর যে দৃশ্য দেখা গেল, তাতে ওয়াগলের সঙ্গীরা অস্ফুট চীৎকার করে উঠলেন। ওয়াগলেও চমকে উঠেছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুটা আন্দাজ করেছিলেন যে এরকম ঘটতে পারে। মহিলার দেহে মাথাটা ছিল না, সেখানে একটা তোয়ালে দিয়ে মাথার মতো বানিয়ে চাদর ঢাকা দেওয়া ছিল। রক্তে সমস্ত বিছানা মাখামাখি। সঙ্গে সঙ্গে ফিংগার প্রিন্ট একসপার্ট ও ফটোগ্রাফার ডেকে আনা হলো।

ওয়াগলে এবার কেবিনের তল্লাশী শুরু করলেন। মৃতদেহটি যে খাটের ওপর ছিল, তার নিচেই পাওয়া গেল রক্তমাখা একটি চপার। ফুট দেড়েক লম্বা, এগুলো দিয়ে মাংস কাটা হয়ে থাকে। আরেকটা খাট খালি। তার নিচে পাওয়া গেল একটা ট্রাঙ্ক। তাতে ক'জোড়া শাড়ি, ব্লাউজ, নতুন চটি পাওয়া গেল। কয়েকটি শাড়িতে লণ্ড্রীর ছাপ পেয়ে ওয়াগলে খুশি হলেন, তিনি এটাই চাইছিলেন। পুরুষ মানুষের ব্যবহৃত কিছু কাপড়চোপড়ও পাওয়া গেল, তাতেও লণ্ড্রীর চিহ্ন। দু'রকম ছাপই তিনি নোট করে নিলেন। টেবিলে একটি সস্তা চটুল উপন্যাসের প্রচ্ছদ দেখে ওয়াগলে সাগ্রহে সেটি তুলে নিলেন। আসল বইখানা হয়তো খুনীর কাছে, যেটা পাওয়া গেলে আরেকটা অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাবে।

ইতিমধ্যে তৎকালীন ইন্সপেক্টর শ্রীকেশকর, ডি.সি.শ্রীলোবো এসে পড়লেন। লোবো ওয়াগলেকে তদন্তের কাজ চালিয়ে যেতে বললেন। সেখানে বাবুলাল তিওয়ারি ও তাঁর স্ত্রীর নামে এন্ট্রি। ঠিকানা ছিল দাদার অঞ্চলের। স্পষ্টই বোঝা যায়, মিথ্যে ঠিকানা। বোম্বাই-এর কোনো ব্যক্তি বোম্বাইতেই হোটেলে থাকতে যাবে কেন? অন্তত, স্বাভাবিক নয় ব্যাপারটা। তবে পুরো ব্যাপারটাই যখন অস্বাভাবিক, ওয়াগলে একজন পুলিশকে ঐ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেন দেখে আসতে।

এবার চেহারার বর্ণনা। হোটেলের কর্মচারী-দের মুখে যা বর্ণনা পাওয়া গেল, তাতে বাবুলালকে সুদর্শন বলেই মনে হয়। ফর্সা, সুঠাম দেহ, ফিল্ম-হিরোদের মত চালচলন। তাঁর স্ত্রীও দারুণ রূপবতী, ফর্সা, দারুণ ফিগার ছিল মেয়েটির। যাইহোক, জে.জে.হাসপাতালে মুণ্ডহীন দেহটি পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল। তখন রাত দশটা। ওদিকে ঐ হাসপাতালে দুপুরবেলা রাজভবনে প্রাপ্ত মুণ্ডটিও পাঠানো হয়েছে। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে জানালেন, মুণ্ড এবং ধড় একই যুবতীর।

এরপর যে দৃশ্য দেখা গেল, তাতে ওয়াগলের সঙ্গীরা অস্ফুট চীৎকার করে উঠলেন। ওয়াগলেও চমকে উঠেছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুটা আন্দাজ করেছিলেন যে এরকম ঘটতে পারে।

এবার পুলিশ কাজে নেমে পড়লো। ডি.সি.শ্রীলোবো জরুরী মিটিং ডেকে একটি তদন্তকারী দল তৈরি করলেন। ওয়াগলেকে দেওয়া হল সেই দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব। ওয়াগলে একজন কুশলী, বুদ্ধিমান এবং দক্ষ অফিসার। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তার যেটুকু পরিচয় দিয়েছেন, তাতে এ তদন্তের দায়িত্ব যে তাকে দেওয়াই নিরাপদ, সেটুকু লোবো বুঝতে পেরেছিলেন।

ওয়াগলে করলেন কি, প্রথমেই দাদার অঞ্চলে যত লণ্ড্রী আছে, সেগুলোর চিহ্ন পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। প্রত্যেকটি পুলিশকে গেস্ট হাউসে পাওয়া দু'রকম লণ্ড্রীর চিহ্নের নমুনা দিয়ে দেওয়া হল। ওয়াগলে অনুমান করেছিলেন, বাবুলাল যখন দাদার অঞ্চলের ঠিকানা ব্যবহার করেছে, হয়তো একটা যোগাযোগের সূত্র সেখানে আছে।

ওয়াগলে প্রতিটি থানায় খোঁজ নিলেন, কিন্তু কোনো মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার খবর কোথাও নেই। তাহলে কি বাইরে থেকে আনা হয়েছিল মেয়েটিকে? এদিকে ডাক্তারের লিখিত রিপোর্ট পাওয়ার পর গেস্ট হাউসের কর্মচারী ও ম্যানেজারকেও কাটামুণ্ডটি দেখানো হল। তাঁরা প্রত্যেকে ওটি যে বাবুলালের স্ত্রী'র-সে কথা জানালেন।

ওদিকে অসংখ্য লণ্ড্রী পরীক্ষা করে দেখেই চলেছেন ওয়াগলে'র লোকজন। অবশেষে দুটো লণ্ড্রী পাওয়া গেল, যেগুলোর চিহ্ন, ওয়াগলে'র পাওয়া চিহ্নের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। একটা লণ্ড্রী ডাঙ্কন রোডে, আরেকটা সাম্বলি স্ট্রীটে। ওয়াগলের এই অমানুষিক পরিশ্রম সফল হল। দুটো লণ্ড্রীর মালিকই মুসলমান। ওয়াগলে'র সন্দেহ হল, বাবুলাল লোকটা আসলে মুসলমান নয়তো! মেয়েটার শাড়ি, ব্লাউজের রঙ এবং চপ্পলের ডিজাইন যেরকম, সাধারণত সেগুলো মুসলমান মেয়েরাই ব্যবহার করে থাকে।

সাম্বলি স্ট্রীটের লণ্ড্রীটার চিহ্ন ছিল পুরুষের পাওয়া চিহ্ন, আর ডাঙ্কন রোডের লণ্ড্রীটায় যে চিহ্ন দেওয়া হয়, তার সঙ্গে মেয়েটির কাপড়চোপড়ের লণ্ড্রীমার্কা মিলে যায়। ডাঙ্কন রোডের লণ্ড্রীর মালিক পুরনো রসিদ ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ ওয়াগলে-কে বলে উঠলেন, 'স্যার, আমার মনে হচ্ছে এই মেয়েদের কাপড়গুলো শাকরুল্লা নামের একটা লোক দিয়ে যেতেন, তাঁর নামেই রসিদ কাটতাম।'

যাক, একটা ক্ষীণ সূত্র পাওয়া গেল। শকরুল্লা'র চেহারারও একটা মোটামুটি বর্ণনা পাওয়া গেল। ঐ অঞ্চলে ওয়াগলের বেশ কিছু ইনফর্মার ছিল। এর আগেও তাদের সাহায্য তিনি নিয়েছেন। এদের মধ্যে বেশ কিছু সংলগ্ন এলাকার নামকরা গুণ্ডা বদমাশও রয়েছে। সকলকে জড়ো করলেন একজায়গায় তিনি। তারপর তাদেরকে শকরুল্লার চেহারার বর্ণনা দিয়ে নির্দেশ দিলেন, খুঁজে পেতে যেকটা শকরুল্লা পাওয়া যায় সবাইকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেন তারা। ঐ লণ্ড্রীটার আশেপাশে যত বাড়ি আছে, প্রতিটি বাড়িতে যেন খোঁজ নেওয়া হয়। যদি কোনো শকরুল্লা নামের লোককে বাড়িতে না পাওয়া যায়, তাহলে সেই বাড়ির ঠিকানা জেনে নিতে হবে। প্রয়োজনীয় নির্দেশ টির্দেশ দিয়ে ওয়াগলে নিকটবর্তী ফাঁড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ওয়াগলের পরিকল্পনায় কাজ হল। ঘন্টা তিনেকের মধ্যে চারজন শকরুল্লা-কে পাওয়া গেল। তাদের মধ্যে একজনের চেহারা লণ্ড্রীর মালিকের দেওয়া বর্ণনার সঙ্গে মিলেও গেল। লণ্ড্রীর মালিককে ডেকে পাঠানো হল। সে এসে সেই ব্যক্তিকেই সনাক্ত করল। অন্য তিন শকরুল্লাকে ছেড়ে দিয়ে আসল শকরুল্লা-কে নিয়ে ওয়াগলে চলে এলেন থানায়। আসল ঘটনা তখনো কেউ জানে না

সেই স্বাদ সেই শুদ্ধতা
এখন পাওয়া যাচ্ছে
সুবিধাজনক প্লাস্টিক বোতলেও

ইঞ্জিন ব্রাণ্ড

সরষের তেল

একশ শতাংশ শুদ্ধ, পুষ্টিগুণে ভরপুর,
স্বাস্থ্যবর্ধক ইঞ্জিন ব্রাণ্ড শুদ্ধ সরষের তেল।
আপনার তৈরি খাবারদাবার আর
আচারকে আরও বেশি স্বাদু আর পুষ্টিকর
করে। যা কিছুই ভাজুন…যা কিছুই রাঁধুন
আরও বেশি স্বাদ আরও বেশি মজাদার।

প্রস্তুতকারক:
শ্রী হরি ইণ্ডাস্ট্রিজ
(হরি অয়েল মিলস)
ভরতপুর–৩২১০০১

কুশল গৃহিনীদের
ভরসা করার মত এক সঙ্গী

ওরা। শকরুল্লা নামক লোকটি তো খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওয়াগলে বহুকষ্টে তার ভয় দূর করলেন।

তারপর তাকে জিগ্যেস করে জানতে পারলেন, সে তার বোন রাজিয়া-র কাপড়চোপড় লণ্ড্রীতে দিয়ে আসে, নিয়ে আসে। 'তোমার বোনের বয়স কত, শকরুল্লা'? ওয়াগলে প্রশ্ন করলেন। '১৯-২০ হবে, স্যর'।

'সে কোথায় এখন?'

'সে স্যর নয় তারিখে গেছে বাড়ির বাইরে, এখনো ফেরেনি'। ওয়াগলে বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, 'সে কি। বোন কোথায় গেল খোঁজ খবরও করনি'?

'ও তো প্রায়ই এরকম যায়, আবার কয়েকদিন পর ফিরে আসে'। ওয়াগলে আন্দাজ করলেন, এদের ফ্যামিলি বোধহয় ওইটাইপেরই হবে। জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, মনে করে দ্যাখো তো, নয় ফেব্রুয়ারি তারিখে রাজিয়ার পরণে কি ছিল?'

শকরুল্লা একটু ভেবে বলল, 'হলুদ রঙের সিল্কের শাড়ি।' –আর চটি?

'যতদূর মনে পড়ছে লাল সাদা, নতুন চটি ছিল স্যর।' ওয়াগলে গেস্ট হাউস থেকে এরকম শাড়ি ও চটি ট্রাঙ্কের মধ্যে পেয়েছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে শকরুল্লাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন জে.জে. হাসপাতালে। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে শকরুল্লাকে শবাগারে নিয়ে গেলেন। জনৈক কর্মচারীকে যুবতীর মৃতদেহটি শকরুল্লাকে দেখাতে বললেন। কর্মচারীটি যুবতীর মৃতদেহটি শকরুল্লার সামনে খুলে ধরতেই শকরুল্লার গলা চিরে আর্তস্বর বেরিয়ে এল–'রাজিয়া'।

শকরুল্লাদের বাড়ি 'আদর্শ গেস্ট হাউস' নামের হোটেলটি থেকে খুব দূরে নয়। ওয়াগলে ধীরে ধীরে জানতে পারলেন, রাজিয়ার সামনের পাড়ার এক যুবকের সঙ্গে প্রেম ছিল। যুবকটির নাম জানা গেল হীরালাল উপাধ্যায়। ওয়াগলের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, গেস্ট হাউসের পাঁচনম্বর কেবিনে পুরুষের ব্যবহৃত পোশাকে লণ্ড্রীচিহ্নের সঙ্গে সংক্ষেপে এইচ ইউ লেখা ছিল। নিজের তদন্ত ঠিক পথে এগুচ্ছে দেখে ওয়াগলে আরো উৎসাহিত হলেন।

হীরালালের বাসায় গিয়ে কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। জনৈক যুবক তখন সেখানে ছিল, সে নাকি হীরালালের কাছে পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকে। যুবকটি জানাল, হীরালাল নয় তারিখ বেরিয়ে গেছেন, আর ফিরে আসেননি। ওয়াগলে মাথা নাড়লেন। সব ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে। হোটেলটাও ঐদিনই সন্ধেবেলা হীরালাল ও রাজিয়াকে পাঁচনম্বর কেবিন ভাড়া দিয়েছিল। যুবকটি ওয়াগলের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে হীরালাল সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু না জানাতে পারলেও অন্তত একটা মূল্যবান তথ্য তার কাছে পাওয়া গেল, সেটা হচ্ছে, হীরালাল ফিল্মে 'এক্সট্রা'র কাজ করে থাকে। যুবকটির কাছে হীরালালের কামরার ডুপ্লিকেট চাবি ছিল, ওরা দু'জনে একটা ঘরেই শুতো। হীরালালের ট্রাঙ্ক খুলে কিছু পোশাক পাওয়া গেল, তাতে গেস্ট হাউসে পাওয়া পুরুষের পোশাকে যে লণ্ড্রীর ছাপ ছিল, এতেও সেই এক ছাপ। হীরালাল ও রাজিয়ার একসঙ্গে তোলা একটি ফটো এবং হীরালালের নামে ইস্যু করা একটি 'ফিল্ম এক্সট্রা–অ্যাকটরস অ্যাসোসিয়েশান'–এর কার্ড পাওয়া গেল। ওয়াগলে স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, তদন্তের কাজ শেষ হয়ে আসছে। হীরালালের বিরুদ্ধে এখনই যা সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে, তাই যথেষ্ট। হীরালালের বইপত্রের মধ্যে ওয়াগলে প্রার্থিত উপন্যাসটিও পেয়ে গেলেন, যেটির মলাট তিনি হোটেলের কামরায় আবিষ্কার করেছিলেন।

জিনিসপত্র সব হেফাজতে নিয়ে সাক্ষীদের সইসাবুদ সংগ্রহ করে ওয়াগলে ফিরে এলেন থানায়, রাত তখন বারোটা। তিনি ফোনে শ্রীলোবো–কে তদন্তের বিস্তৃত বিবরণ দিলেন। লোবো অত্যন্ত খুশি হয়ে ওয়াগলেকে অভিনন্দন জানালেন। হীরালালের নামে এক্সট্রা-অ্যাকটরস অ্যাসোসিয়েশনের যে কার্ড পাওয়া গিয়েছিল, তাতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সই ছিল শ্রী গ্যাডগিলের। শ্রীযুক্ত গ্যাডগিল একজন নামী আইনজীবী। ওয়াগলে তাঁকে চিনতেন।

পরের দিন দাদার কোর্টে গিয়ে ওয়াগলে শ্রী গ্যাডগিলের সঙ্গে দেখা করে পুরো ঘটনা জানিয়ে তাঁর সাহায্য চাইলেন। গ্যাডগিল রাজী হলেন। বোম্বাই–এর প্রতিটি ফিল্ম স্টুডিও–তে তাঁর চেনা লোকজন রয়েছেন। ওয়াগলের সঙ্গে গাড়ি করে গ্যাডগিল এক এক করে প্রত্যেকটি স্টুডিওতে গিয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। এবং ওয়াগলে'র পরিশ্রম অবশেষে সার্থক হল। দাদার–এর শ্রী সাউন্ড স্টুডিও–তে দুপুর দুটো নাগাদ যে শুটিং শুরু হবে, তাতে হীরালালেরও অংশ নেওয়ার কথা। গ্যাডগিল–এর সঙ্গে পুলিশ মোতায়েন করে ওয়াগলে মিঃ লোবো–কে ফোন করলেন। লোবো ওয়াগলেকে থানায় চলে আসতে বললেন বিশেষ কাজে। ওয়াগলে সহকর্মী পুলিশকর্মীদের দায়িত্ব বুঝিয়ে চলে গেলেন। বেলা দুটো নাগাদ যে যুবকটিকে স্টুডিও–তে ঢুকতে দেখা গেল, ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেল, এই লোকটিই হীরালাল। হীরালালের বাড়িতে তার ছবি পাওয়া গিয়েছিল আগের দিন রাত্রে। তার বাড়ির সামনেও পুলিশ মোতায়েন ছিল। চারদিকে ফাঁদ পেতেই রেখেছিলেন ওয়াগলে।

গ্যাডগিল একটু এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে যুবকটিকে ডাকলেন, হ্যালো-হীরালাল। যুবকটি পেছন ফিরে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে সাদা পোশাকের দুজন বলিষ্ঠ পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। হীরালাল এরপর আর কোনো বাধা দেবার চেষ্টা করল না।

জেরার মুখে পড়ে সে সব স্বীকার করল। রাজিয়াকে সে সত্যি ভালবাসত। কিন্তু ক'মাস যাবৎ তার সন্দেহ হচ্ছিল, রাজিয়া বোধহয় অন্যকাউকে ভালবাসে। একদিন রাজিয়াকে সে জনৈক যুবকের সঙ্গে গল্প করতে দেখে। তাতে তার সন্দেহ দৃঢ় হয়। রাজিয়া কিন্তু হীরালালের অভিযোগ জোরগলায় অস্বীকার করে। কিন্তু হীরালালের মাথা গরম হয়ে যায়। সে রাজিয়াকে খুন করবে বলে পরিকল্পনা করে। এবং নয় তারিখ রাজিয়াকে নিয়ে আদর্শ গেস্ট হাউসের পাঁচনম্বর কামরা ভাড়া নেয়। সরল প্রকৃতির রাজিয়া হীরালালের উদ্দেশ্য একটুও বুঝতে পারেনি। হীরালাল রাজিয়া–কে নিয়ে প্রাণভরে ফূর্তি করে নেয় দুদিন। ১১ ফেব্রুয়ারি দুপুর বেলা হীরালাল চোরবাজারে গিয়ে মাংস কাটার ছুরিটা কিনে আনে গোপনে। ঐ দিন রাত্রে হীরালাল রাজিয়াকে প্রাণভরে উপভোগ করে। রাজিয়াও সত্যি সত্যি ভালবাসত হীরালাল–কে। একসময় মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত একটা নাগাদ হীরালাল নতুন ধারালো ছুরিটা দিয়ে ঘুমন্ত রাজিয়া–র নরম গলাটা ধড় থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মুণ্ডটা নিজের জামা দিয়ে মুড়ে নেয়। তোয়ালে দিয়ে মাথার মত বানিয়ে, রাজিয়াকে চাদর ঢাকা দিয়ে মুণ্ডুটা নিয়ে সে বেরিয়ে আসে। দরজায় নিজের তালা লাগায়। তখন রাত আড়াইটে তিনটে হবে। হীরালালের ইচ্ছে ছিল মুণ্ডুটা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলবে। কিন্তু গিরগাঁও–এর চৌপাটির কাছে পৌঁছে সে টহলদার পুলিশ দেখে ভয়ে বাণগঙ্গার দিকের রাস্তায় পালিয়ে আসে। রাজভবনের রাস্তার কাছে পৌঁছে একটু উপরে ফের পুলিশ দেখে সে ভয় পেয়ে যায়। সে দ্রুত বাঁ দিকে নিচে রাজভবনের বাগানের উঁচু উঁচু গাছ লক্ষ্য করে মুণ্ডুটা ছুঁড়ে দেয়। তখন সকাল হয়ে আসছে। এর পরের ঘটনা আগেই লেখা হয়েছে।

সামান্য সন্দেহের বশে নিজের প্রেমিকাকে এরকম বীভৎসভাবে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার ঘটনায় পুলিশও বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল।

যাইহোক, হীরালালের কাছে হোটেলের পাঁচ নম্বর ঘরের তালার চাবিও পাওয়া গেল। এছাড়া রেজিস্টারে বাবুলাল তিওয়ারির হাতের লেখার সঙ্গে হীরালালের হাতের লেখা মিলিয়ে হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট রিপোর্ট দিলেন, দুটো একই লোকের হস্তাক্ষর। এভাবে অকাট্য সব সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে হীরালালের বিরুদ্ধে কোর্টে খুনের মামলা দাখিল করা হল।

মামলাটি সেসময় খুব হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, হীরালালের স্বপক্ষে পাঁচজন দুঁদে উকিল দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ এখন সেশান জজও হয়ে গেছেন।

শেষপর্যন্ত নিম্ন আদালতে হীরালালের ফাঁসি হয়। হাইকোর্টে আপীল করা হয়েছিল হীরালালের পক্ষ থেকে। হাইকোর্ট ফাঁসির আদেশ বাতিল করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

-শ্রীকান্ত সিনকর

উপহার

এ মহানগরের তিনশ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্য সরকার দুটি নতুন উপহার দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একটি নতুন চিড়িয়াখানা, অপরটি 'থিম পার্ক'। প্রথমটি প্রায় ৯০০ বিঘে জমির উপর ন্যাশনাল পার্কের আদলে সোনারপুরে গড়ে উঠবে। রাজ্য সরকার নাকি বিবেচনা করে দেখেছেন সব দিক দিয়েই সোনারপুর জায়গাটি নতুন চিড়িয়াখানার পক্ষে উৎকৃষ্ট স্থান। তাই সরকার চাইছেন আলিপুর চিড়িয়াখানাকে সোনারপুরে স্থানান্তরিত করতে।

'থিম পার্ক'টি গড়ে উঠবে সল্টলেকের ঝিলমিল—এর চল্লিশ একর জায়গার উপর। এতে থাকবে শিশুদের জানার ইচ্ছেকে বাড়িয়ে তোলার নানা রসদ। যেমন, মহাকাশ বাগান, বিজ্ঞান বাগান, প্রাণী বাগান, ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি, খেলাধূলা প্রভৃতি। কিন্তু এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে হলে প্রথম দফায় প্রয়োজন ছ'কোটি টাকা। নিঃস্ব প্রায় রাজ্য সরকারের পক্ষে অত টাকা খরচ করা সম্ভব নয়। তাই সরকার চাইছেন বেসরকারি শিল্প গোষ্ঠীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজটি করতে। এ নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর তদ্বির তদারকি।

দপ্তর বন্টন

খবরটা শুনলে অনেকেরই হয়ত মনে হবে, শারীরিক অসুস্থতার কারণেই বোধহয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এমন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। আসলে কিন্তু তা নয়। জ্যোতিবাবুর হাতে এ মুহূর্তে আছে অনেকগুলি দপ্তর। নানান কাজের চাপে জ্যোতিবাবু ঠিকমত দপ্তরগুলোর দিকে নজর দিয়ে উঠতে পারেন না। তাই পার্টি লেবেলে বেশ কিছুদিন ধরেই চিন্তা-ভাবনা চলছে, মুখ্যমন্ত্রীর কর্মভার কিছুটা লাঘব করা যায় কিনা? কোন্ কোন্ দপ্তরের কাজ মুখ্যমন্ত্রী ছাড়বেন তা ঠিক না হলেও কথাবার্তা চলছে স্বরাষ্ট্র (পুলিশ), উচ্চ শিক্ষা এবং আবাসন—এ তিনটি দপ্তর ছাড়ার ব্যাপারে।

অপরদিকে ভূমি ও ভূমি রাজস্বমন্ত্রী বিনয় চৌধুরীর অধীনে আছে দু'টি দপ্তর, যার নাম গ্রামোন্নয়ন এবং সমষ্টি উন্নয়ন। কথা চলছে ওই দু'টি দপ্তরকে এক করার। এর ফলে রাজ্য সরকার নাকি আর্থিক দিক্ থেকেও অনেকটা লাভবান হবেন। কেননা কেন্দ্রিয় সরকারের অনুরোধেই ওই সংযুক্তির কাজে রাজি হয়েছেন রাজ্য সরকার।

ট্রামের হাল ফেরাতে

এ মহানগরের ট্রাম কোম্পানিকে নিয়ে রাজ্য পরিবহন দপ্তরের এখন একরকম নাজেহাল অবস্থা। ১৯৬৬-'৬৭ সাল থেকে রাজ্য সরকার কম টাকা এ সংস্থার পিছনে খরচ করেন নি। এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই প্রায় বিরাশি কোটি টাকা শুধু ভরতুকি দিতে হয়েছে। এ ছাড়াও উন্নতি খাতে দিতে হয়েছে পঞ্চাশ কোটি টাকা। অথচ কাজ বা লাভ হয়েছে কতটুকু তা তো সকলেরই জানা।

ট্রাম কর্তৃপক্ষ অবশ্য এ অবস্থার কথা অস্বীকার করেন না। তারা এ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। বলেছেন, ট্রামের শ্রেণীবিন্যাস ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে। সেইসঙ্গে প্রস্তাব দিয়েছেন, পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাওড়া ব্রিজের ট্রাম লাইনকে নতুন করে পাতার জন্য। কেননা শুধুমাত্র ট্রাম আউট-লাইন হওয়ার জন্য প্রায়শঃই ব্রিজের উপর ট্রাফিক জ্যাম হয়ে থাকে।

রাজ্য সরকার বাকি প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করে দেখবেন জানালেও নতুন লাইন পাতার প্রস্তাবটি মেনে নিয়েছেন। পুজোর পরই শুরু হবে লাইন পাতার কাজ। অর্থাৎ কিনা ব্রিজের উপর অবশ্যম্ভাবি ভয়াবহ জ্যাম পর্বের নতুন সূচনা।

গানের আসর

কলকাতায় মাইকেল জ্যাকসন! না, সংবাদটি মোটেই কাল্পনিক নয়। জ্যাকসন অনুরাগীদের স্বপ্ন অবশেষে সত্যি হতে চলেছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই জ্যাকসন আসছেন এ দেশে তিনটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। অনুষ্ঠানগুলি হবে দিল্লি, বোম্বাই ও কলকাতায়।

জানা গেছে, জ্যাকসনের সঙ্গে আসছে পঁচাত্তর জনের বিরাট একটি দল। ওই দলের সঙ্গে আসছে পঞ্চাশ হাজার কিলোগ্রাম ওজনের জিনিসপত্র।

ভারতে অনুষ্ঠিত ওই তিনটি অনুষ্ঠানের সংগৃহীত অর্থ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ তহবিল, মাদক দ্রব্যের প্রচার অভিযান তহবিল এবং আফ্রিকার খরাত্রাণ তহবিলে দান করা হবে।

আমেরিকায় বসবাসকারী অনাবাসী ভারতীয় ইন্দু প্যাটেল, যিনি জ্যাকসনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে বিশেষ পরিচিত, তিনিই উদ্যোগী হয়েছেন ওই তিনটি অনুষ্ঠান করতে।

ড্রাগের বিরুদ্ধে

'ড্রাগের নেশা সর্বনাশা'—এ নামে একটি তথ্যচিত্র তৈরি হতে চলেছে। খুব শীগ্গির এর কাজও শুরু হয়ে যাবে। নেশাখোরদের হাল-হকিকৎ ফেরাতে রাজ্য সরকার এখন বদ্ধ পরিকর। যত্রতত্র ওই তথ্যচিত্র দেখিয়ে যদি সর্বসাধারণকে কিঞ্চিৎ সচেতন করা যায়। শুধু ছবি নয়, রাজ্যের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী চাইছেন, এ মহানগরের রাস্তায়, মোড়ে, পার্কে ও ময়দানে মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে বড় বড় হোর্ডিং দিতে। নানা উপদেশ সম্বলিত পোস্টার দিতে।

শুধু এই নয়, বিশ্বনাথবাবুর ইচ্ছে আছে, এ মহানগরের বিভিন্ন হাসপাতালে পঁচিশটি বেডের ব্যবস্থা করবেন, যা রাখা থাকবে শুধু নেশাড়ুদের জন্য।

'নো স্মোকিং জোন'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ ভাস্কর রায় চৌধুরী সেদিন যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে নামলেন গাড়ি থেকে। কিন্তু গাড়ি থেকে নামা মাত্রই ঐতিহ্যবাহী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ত্রুটিটি সর্বাগ্রে চোখে পড়ল, তা খুবই সামান্য। কয়েকটি পোড়া সিগারেটের টুকরো। উপাচার্য সঙ্গে সঙ্গে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য সংশ্লিষ্টদের বললেন। আর তখনই তাঁর মনে হল, আচ্ছা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'নো স্মোকিং জোন' করলে কেমন হয়? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। কথাটা উনি পরিচিত অনেককেই বললেন। এক সি·পি·আই (এম) নেতা কথাটা শুনেই বললেন, আপনার ইচ্ছেটা খুবই প্রশংসনীয়, তবে ইচ্ছেটা কাজে পরিণত করার আগে অন্তত ছ'মাস আপনি সিগারেট না খেয়ে থাকুন।

চেন স্মোকার উপাচার্য আর কি করে অস্বীকার করেন। ওই সুন্দর ইচ্ছেটা কাজে পরিণত করার প্রথম এবং প্রধান অসুবিধাটা উনি নিজেই।

Regd. NO. AD-212 ALOKPAAT
Lic. NO. U/AD-1 November 1988

RNI NO. RN 42171/86
Rs. 6.00 Per Copy